শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

দ্বাদশ ভাগ



গুরুপ্রিয়া

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

দ্বাদশ ভাগ

শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য জীবনের অন্তর্গত পনের মাসের ঘটনাবলী লইয়া এই ভাগের রচনা। রাঁচি আশ্রমে ৺দুর্গা পূজা, বম্বেতে সংযম ও ভাগবৎ সপ্তাহ, কাশী আশ্রমে নানা অনুষ্ঠান, বৃন্দাবনে মহাপ্রভুর মন্দির প্রতিষ্ঠা, সোলনে শ্রীশ্রীমার জন্মোৎসব, গুরুপূর্ণিমা উৎসব, ব্রহ্মচারীদের নামকরণ, কলিকাতায় ৺দুর্গা পূজা, রাঁচি আশ্রমে কালীমূর্ত্তি স্থাপন ও দিল্লীতে সংযম সপ্তাহ ইত্যাদির বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ, অলৌকিক নানা সূক্ষ্ম দর্শনের কথা, বিস্তারিত আধ্যাত্মিক আলোচনা এবং ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মায়ের ভ্রমণলীলা কাহিনী এই ভাগে স্থান লাভ করিয়াছে।

[অক্টোবর, ১৯৫৪-ডিসেম্বর ১৯৫৫]

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

দ্বাদশ ভাগ

[অক্টোবর, ১৯৫৪—ডিসেম্বর, ১৯৫৫]

শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবী

প্রকাশক : শ্রীশ্রীআনন্দময়ী সংঘ
ভাদাইনী, বারাণসী

প্রথম সংস্করণ
কার্ত্তিক, ১৩৭১

মূল্য—তিন টাকা মাত্র।

মুদ্রক :
বৈদ্যনাথ দত্ত
দি ইউরেকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ
৭৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশকের কথা

শ্রীশ্রীমায়ের অনুগ্রহে শ্রীযুক্তা গুরুপ্রিয়া দেবী লিখিত "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী"র দ্বাদশ ভাগ প্রকাশিত হইল।

গত ১৯৫৪ সন হইতে শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন লেখিকাকে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট হইতে অনেক সময়ই দূরে থাকিতে হইয়াছে। তথাপি ডায়ারীর ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তিনি আমাদের সকলকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রাখিয়াছেন।

অনিবার্য্য কারণ বশতঃ দ্বাদশ ভাগের প্রকাশনে বিশেষ বিলম্ব হইয়াছে। শ্রীশ্রীমায়ের ভক্তবৃন্দের নিকট আমরা সেজন্য ক্ষমাপ্রার্থী। পুস্তকের মুদ্রণ, বাঁধাই প্রভৃতি যথাশক্তি সুন্দর করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

দীপাবলী
বাং ১৩৭১ সন

বিনীত—
প্রকাশক

সূচীপত্র



শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

দ্বাদশ ভাগ

৭ই অক্টোবর, ১৯৫৪

আজ শুভ বিজয়া দশমী। এবার রাঁচি আশ্রমে মার উপস্থিতিতে খুব সুন্দর ভাবে পূজা সম্পন্ন হইল। রাঁচিতে বাঙ্গালীর সংখ্যা খুব কম না। শোনা গেল পূজা এখানে প্রায় ২০।২৫টি হইয়া থাকে। এখানে মার ভক্ত-সংখ্যা বেশী না। কিন্তু তথাপি আশ্রমের পূজায় যেরূপ জনসমাগম হইয়াছে তাহা নাকি অন্য কোথাও হয় নাই। সর্ব্বদাই আশ্রমে ও পূজা মণ্ডপে ভীড় লাগিয়াই আছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় খ্যাতনামা মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্ত্তীর রামায়ণ গান হইতেছে। সে সময়ে-ত বিরাট প্যাণ্ডেলে একেবারে তিলার্দ্ধ স্থান থাকে না।

রাচিতে দুর্গা পূজা।

মহালয়ার দিন হইতেই মার নির্দ্দেশে সকলে মিলিয়া এক লক্ষ জপ পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ৺দুর্গা নাম অথবা আপন আপন ইষ্ট নামের জপই মা বলিয়াছেন। নবমী পূজার দিন জপ সমর্পণ করা হইল। প্রতিপদ হইতে রামায়ণ পাঠও সুরু হইয়াছিল। মা বলিয়াছেন—"শ্রীরামচন্দ্র-ত এই পূজা সুরু করিয়াছিলেন তাই তোমরা এই নয়দিনে সকলে মিলিয়া সম্পূর্ণ রামায়ণটি শেষ করিতে চেষ্টা কর। অনর্থক সময় নষ্ট করা কেন? যে যতটা পার সেই ভাবে লাগিয়া থাকার চেষ্টা কর।" সেই সঙ্গে সঙ্গে দেবী-ভাগবৎ

পাঠও প্রতিপদ হইতে সুরু হইয়া নয়দিনে সম্পূর্ণ হইল। তাহা ছাড়া সপ্তমী পূজার দিন হইতে পূজা মণ্ডপের সম্মুখে নির্দ্দিষ্ট স্থানে অখণ্ড ভাবে জপ সুরু হইয়াছিল। এইরূপ প্রতিবৎসরই মা পূজার সময় করিতে বলেন। আর পূজা আরম্ভের সাথে সাথে প্রতিদিন ব্রাহ্মণের মধ্যে যাঁহারা পাঠ জানেন তাঁহারা চণ্ডী পাঠ সুরু করেন। প্রতি-বারের মত এবারও কুমারী পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে। সধবা ভক্তদের অনেকেই ২।১ জন করিয়া কুমারী পূজায় বসিয়া গিয়াছে। সে-ও এক শোভা। ছোট ছোট কুমারী মেয়েদের মালা-চন্দন ও সুন্দর বস্ত্রে সজ্জিত করিয়া পূজা করা।

মার প্রতিটি ব্যবস্থাই একেবারে পূর্ণ। সেখানে বিন্দুমাত্র খুঁত নাই। রাঁচির লোকেরা এই জাতীয় পূজা বোধ হয় পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। অনেকেই বলাবলি করিতেছে এবার মার উপস্থিতিতে রাঁচির নব জন্ম হইয়া গেল। কথাটি সত্য সন্দেহ নাই।

একটি বিশেষ কথা এই যে প্রথমে স্থানীয় ভক্তদের মধ্যে অনেকেই মনে করিয়াছিলেন যে টাকা পয়সার ব্যবস্থা না করিয়া এই বিরাট কাজে হাত দেওয়া ঠিক না। তাহার উপর আমরা রাঁচিতে পৌছিয়াই আশ্রমে সব নূতন নূতন কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছি। এখানকার পূজার বাজেটত সেখানেই অতিক্রম করিয়া গেল। সকলের আশঙ্কা দেখিয়া আমি তাঁহাদের বুঝাইয়া বলিলাম যে সাধারণতঃ লোকে আয় বুঝিয়া ব্যয় করে কিন্তু আমাদের এখানে ব্যয় বুঝিয়া আয় হইয়া যায়। মার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে কখনও কোনও শুভ কাজে অসুবিধায় পড়ি না। তাঁহারা নূতন লোক। তাঁহাদের আর কি দোষ? পূজার প্যাণ্ডেল করিতেই প্রায়

২৫০০৲ টাকার উপর প্রয়োজন। ভক্তেরা বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে কি ভাবে কাজ সম্পন্ন হইবে। হঠাৎ একজন ব্যবসায়ী ভদ্রলোক আসিয়া প্যাণ্ডেলের উপর লাগাইবার জন্য ৫০০০ নূতন টিন দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন পূজার পর আবার ফেরৎ দিলেই হইবে। ঐরূপ আর একজন ভদ্রলোক প্যাণ্ডেলের সমস্ত বাঁশ দিবেন বলিলেন। এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া স্থানীয় ভক্তবৃন্দ-ত অবাক! ধীরে ধীরে যখন অপ্রত্যাশিত ও অযাচিত ভাবে অর্থ আসিয়া যাইতে লাগিল তখন আর কাহারও মনে সন্দেহ রহিল না যে মার কাজ মা-ই সম্পূর্ণ করাইয়া নিবেন। পূজা সম্পূর্ণ হওয়ার পর দেখা যাইতেছে প্রায় হাজারখানেক টাকা এবং অপর্য্যাপ্ত জিনিষ-পত্র সব বাঁচিয়াও গিয়াছে। সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন যে মায়ের লীলার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবার সকলে পাইয়াছে।

পূজার কয়দিন যাহাতে বিশেষ সুচারুভাবে সমস্ত কাজ সম্পন্ন হয় সেদিকে মার পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টি। কে কি কাজ করিবে, কে কে নৈবেদ্য সাজাইবে, কে কে ভোগ পাকে সহায়তা করিবে, কে কে পাঠ করিবে, কে প্রসাদ বিতরণ করিবে, কে কে পরিবেশন করিবে, কে পুষ্পাঞ্জলীর মন্ত্র পড়াইবে, কে সমস্ত আশ্রম ঝাড়ু দিবে এবং গোবর ছড়া দিবে, কে সময় মত সকলের উঠিবার ঘণ্টা বাজাইবে ইত্যাদি সব কিছুই মা ঠিক করিয়া দিয়াছেন। সমস্ত কাজ খুবই শৃঙ্খলার সহিত হইয়া গেল। কোথাও বিন্দুমাত্র ত্রুটিবিচ্যুতির অবকাশ পর্য্যন্ত নাই।

আজ দশমীর দিন দেবব্রতের বাসায় মার ভোগের ব্যবস্থা হইয়াছে। সকলেই খুব ভালমত ও আনন্দের সহিত প্রসাদ পাইল।

পূজার পূর্ব্বেও কয়দিন মা তাহাদের বাড়ীতেই ভোগ গ্রহণ করিয়াছেন। দুপুরে বিশ্রামও ঐখানেই করিতেন।

আজ বিকালেই নারায়ণ স্বামী ও কমল ব্রহ্মচারীকে দিয়া আশ্রমের সব মেয়েদের কাশীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

৮ই অক্টোবর, ১৯৫৪

আজ বেলা প্রায় সাড়ে তিনটা নাগাদ মা আশ্রম হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। পথে কাশিমবাজারের মহারাজার বাড়ী, বর্দ্ধমানের জমিদার বাড়ী এবং আরও ২।১ স্থান ঘুরিয়া সন্ধ্যা নাগাদ মা রাঁচি রোড ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিলেন। আমাদের সঙ্গে সোলনের রাজা সাহেবও আছেন। তিনি প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও পূজা উপলক্ষে সেই সুদূর সোলন হইতে মাতৃচরণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আমরা রাত্রের গাড়ীতে মাকে লইয়া সকলে কাশী রওনা হইলাম।

কাশী অভিমুখে।

ইতিমধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে ইতিমধ্যে কলিকাতা হইতে শ্রীমতী রাণী মজুমদার মার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। একদিন হঠাৎ আমাকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তোমাদের কাশী আশ্রমে নাকি গোপাল এসেছে? আমাকে ছবি দেখাতে পার।" আমার বাক্সে গোপালের ফটো ছিল। তাহা বাহির করিয়া তাহাকে দেখাইলাম। মুগ্ধ হইয়া

কাশী আশ্রমের গোপাল-জীর সম্বন্ধে নানা অদ্ভূত কথা।

দেখিতে দেখিতে সে বলিল—"কি আশ্চর্য্য ঘটনা!" গোপালের ফটোর কথা সে কি করিয়া জানিল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। পুষ্পের নিকট কথা প্রসঙ্গে শুনিয়াছে বলিল। শুনিয়াই তাহার চার বৎসর পূর্ব্বের স্বপ্নের কথা মনে পড়িয়া গিয়াছে। ব্যাঙ্গালোরেও সে মাকে এই সব কথা পূর্ব্বে বলিয়াছে।

তাহার সেই অদ্ভুত স্বপ্নের কথা তাহার মুখ হইতে আমি শুনিলাম। তাহার পূর্ব্বে তেমন কোনও ধর্ম্মভাব ছিল না। একদিন স্বপ্নে দেখে যেন গঙ্গা বহিয়া যাইতেছে। নিকটেই একটি বড় বাড়ীর ছাদের উপর সে বসিয়া আছে। তাহার হাঁটুর উপর একটি বাল-গোপালের মূর্ত্তি। তাহার হাতের তর্জ্জনীটি ধরিয়া ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতেছে। সেই সঙ্গে যেন অল্প অল্প নাচিতেছেও। গোপাল মূর্ত্তি তাহাকে বলিতেছে—"আমাকে পূজা কর না—পূজা কর না।" সে কিন্তু পূর্ব্বে কখনও পূজাদি কিছুই করে নাই এবং তাহার মনের মধ্যেও কিছু ঐ জাতীয় আসে নাই। রাণী গোপাল মূর্ত্তিকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কে?" গোপাল তখন হাসিয়া বলিল যে নিকটের ঐ মন্দিরের মধ্যে যে সেও সে-ই। রাণী একটু অবিশ্বাসের সুরে তাহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিল যে মন্দিরের তিনিই যে সে তাহার প্রমাণ কি? বালগোপাল হাসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রমাণ চাস?" এই বলিয়া সম্মুখের উঠানের মধ্যে একটি তুলসী মঞ্চ দেখাইয়া তিনি বলিলেন—"ঐটি খুঁড়ে দেখিস্ একটি মোহর পাবি। তবেই তোর বিশ্বাস হবে।"

ইতিমধ্যে রাণী দেখিতে পাইল যে বহু লোক কেহ কেহ স্নান করিতেছে কেহ কেহ বা তিলক আঁকিতেছে। ধীরে ধীরে অনেকেই

আসিয়া তাঁহাকে ঘিড়িয়া দাঁড়াইল। লোকমুখে প্রচার হইয়া গেল যে বালগোপালের আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু লোকজন আসিয়া দাঁড়াইতেই বালগোপাল শিশুর মত তাহার কোলে চক্ষু বুঝিয়া শুইয়া পড়িল। আশে পাশের লোকদের মধ্যে কেহ মালা জপ করিতেছে কেহ বা নাম করিতেছে। বালগোপালের সম্মুখে অনেক ভোগ আনিয়া দিল। একথা বলিল যদি ইনিই বালগোপাল হন তবে পেস্তা বাদামও চিবাইয়া খাইতে পারিবেন। এই কথা শুনিয়া রাণী গোপালের মুখে একটি পেস্তা দিয়া দিল। গোপালও বেশ ঠোঁট নাড়াইয়া নাড়াইয়া পেস্তাটি খাইতে লাগিল। তখন রাণী সকলকে দেখাইয়া বলিল—"এই দেখ।" গোপালকে কোলে তুলিয়া নিয়া রাণী উঠিয়া দাঁড়াইয়া 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' নাম করিতে লাগিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে আর সকলেও ঐ নাম করা আরম্ভ করিল। অতঃপর রাণী গোপালকে কোলে লইয়া মন্দিরের দরজায় গিয়া বলিল—"মালিক কে? মালিককে ডেকে আন।" আশেপাশের অনেকেই গোপালকে ঘরে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু রাণী বলিল—"না, মন্দিরের মালিকের কাছেই আমি নিয়া যাইব।" কে একজন বলিল যে সারাদিন পর এইমাত্র মালিক খাইতে বসিয়াছেন শীঘ্রই আসিবেন। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। রাণী বালগোপালকে কোলে লইয়া বসিয়া রহিল। এমন সময় হঠাৎ তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

এত বৎসর পর আমার নিকট আজ সেই বালগোপালের ছবি দেখিয়া তাহার মনে হইল এই সেই মূর্ত্তি যাহাকে সে স্বপ্নে দেখিয়াছে। মা আশ্রমে ফিরিলে সে মাকেও সব কথা বলিল। আমরা ত কাশী যাইতেছি। তাহাকেও বলিলাম কাশীতে গিয়া গোপালকে দর্শন

করিয়া আসিতে। প্রথমে অনেক বাধাবিঘ্নের কথা মনে আসিলেও সে আমাদের সঙ্গেই কাশী রওনা হইল।

৯ই অক্টোবর, ১৯৫৪

আজ সকালে মোগলসরাই ষ্টেশনে নামিয়া আমরা মোটরে কাশী আসিয়া পৌঁছিলাম। রাণীও আমাদের সঙ্গেই আসিয়াছে। আসিয়া স্নানাদি শেষ করিয়া একবস্ত্রে সে মার সঙ্গে মন্দিরে গোপালকে দর্শন করিতে গেল। গোপালকে দেখিয়া রাণীত একেবারে মুগ্ধ বিস্মিত। এইত সেই রূপ! এত বৎসর পর আবার গোপাল তাহাকে দেখা দিলেন। দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ভিতরে শুধু মা, আমি ও রাণী রহিলাম। মার আদেশে রাণী গোপালকে কোলে তুলিয়া কত ভাবেই না আদর করিতে লাগিল। চোখের জলে তাহার বুক ভাসিয়া যাইতেছে। সে দৃশ্য সত্যই অপূর্ব্ব।

১০ই অক্টোবর, ১৯৫৪

আজ রাণীর আগ্রহে গোপালের বিশেষ পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রসাদের ব্যবস্থাও বিরাট ভাবেই হইয়াছে। সকাল হইতে আশ্রমে সানাই বাজিতেছে। রাণীর আজ কি আনন্দ। এতদিন পর সে তাহার গোপালকে আবার পাইয়াছে।

বিকালে আমরা আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেসে বৃন্দাবন রওনা হইলাম। হরিবাবা পূর্ব্ব হইতেই মাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন লক্ষ্মীপূর্ণিমার সময়ে উপস্থিত থাকিবার জন্য। রাণী আরও তিনদিন গোপালের কাছে থাকিবে বলিয়া সে কাশীতেই থাকিয়া গেল।

১১ই অক্টোবর, ১৯৫৪

সকাল প্রায় আটটায় আমরা হাথরাস জংসনে আসিয়া পৌঁছিলাম। সেখান হইতে শ্রীহরিবাবাজী যে মোটর পাঠাইয়া দিয়াছেন তাহাতে মা বৃন্দাবন চলিয়া গেলেন। অন্যান্য সকলে পৃথক বাস রিজার্ভ করিয়া বেলা প্রায় দেড়টা নাগাদ আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিল। মা আশ্রমে পৌঁছিয়া দেখিলেন হরিবাবার নির্দ্দেশে সমস্ত আশ্রমটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখা হইয়াছে। হরিবাবা স্বয়ং আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। কীর্ত্তন সহকারে মাকে আহ্বান করিয়া নিয়া ঘরে বসাইলেন। দেখিয়া খুবই আনন্দ হইল যে পূর্ব্বের মত এখানে আমাদের আশ্রমেও হরিবাবাই সব ব্যবস্থা করাইতেছেন।

বৃন্দাবনে মা।

সন্ধ্যায় হরিবাবা ও অবধূতজীর সঙ্গে কথা বলিয়া প্রোগ্রাম স্থির হইল যে মা আগামী পরশু পাঞ্জাবের দিকে যাইবেন এবং কালী পূজার পূর্ব্বেই এখানে ফিরিয়া আসিবেন।

১৩ই অক্টোবর, ১৯৫৪

আজ বেলা তিনটার সময় মা বৃন্দাবন হইতে ট্রেণে জলন্ধর রওনা হইলেন। সঙ্গে বুনি, উদাস, পুষ্প, বিল্লো, শোভা, পানু ও দীনবন্ধু। আমি অসুস্থ থাকায় মা আমাকে বৃন্দাবনেই রাখিয়া গেলেন। মার সঙ্গে হরিবাবাও ভক্তদের সঙ্গে লইয়া চলিলেন। অবধূতজীত পূর্ব্বেই ব্যবস্থাদি করার জন্য খান্নাতে চলিয়া গিয়াছেন।

হোসিয়ারপুর ও খান্না অভিমুখে।

১৬ই অক্টোবর, ১৯৫৪

বুনি ও পানুর চিঠিতে জানিলাম মা সেদিন ফ্রন্টিয়ার মেলে রওনা হইয়া দিল্লীতে প্রায় তিন ঘণ্টা দাঁড়াইয়াছিলেন। ষ্টেশনে বহু ভক্ত মার দর্শনের জন্য আসিয়াছিল। দিল্লী হইতে হরিবাবা প্রভৃতি কাশ্মীর মেলে রওনা হইলেন। কিন্তু মার রিজার্ভেশন ফ্রন্টিয়ার মেলে ছিল বলিয়া মা সেই গাড়ীতেই গেলেন। হরিবাবার সঙ্গীয় লোকদের সহিত মা পুষ্প, শোভা ও দীনবন্ধুকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। মার সঙ্গে শুধু বুনি, উদাস, বিল্লো ও পানু। ভোর সাড়ে ছয়টায় ট্রেণে জলন্ধর পৌছিলে দেখা গেল হরিবাবা প্রভৃতি পূর্ব্বেই পৌছিয়া গিয়াছেন। মা ও হরিবাবা সকলকে সাবিত্রীদেবী আশ্রমে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে ঘণ্টা দুই বিশ্রাম ও স্নানাদি করিয়া পুনরায় সকাল নয়টায় সকলে মার সঙ্গে হোসিয়ারপুর রওনা হয়। দুই ঘণ্টার মধ্যে মোটরে মা হোসিয়ারপুর পৌছিয়া গেলেন। সেখানে হরিবাবার গুরুদেবের আশ্রমে ব্যাণ্ড ইত্যাদি বাজাইয়া মাকে বিশেষরূপে অভ্যার্থনা করার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সমস্ত আশ্রমটিই বেশ সুন্দর করিয়া সাজান। আশ্রমের ঠিক সম্মুখে এক ভদ্রলোকের নূতন বাড়ীতে মার ও সঙ্গীয় সকলের থাকার ব্যবস্থা হইয়াছে। পূর্ব্বেও আর একবার মা ঐ বাসায় গিয়া থাকিয়াছিলেন।

এদিকে মা চলিয়া যাওয়ার পর হইতেই আমার কোমরের ব্যথা যেন চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল। হাঁটা-চলাত দূরের কথা, বসা অথবা পাশ ফিরিয়া শোয়াও যেন অসম্ভব হইয়াছে। খুবই কষ্ট। গিনি, বিমলা, মনাদি, সাধন প্রভৃতি এখানে আমার নিকট আছে। সকলেই

প্রাণ দিয়া সেবা, যত্ন করিতেছে। কেবলই মনে হয় কয়জনের ভাগ্যে ইহা মিলে।

২০শে অক্টোবর, ১৯৫৪

মার সংবাদ পাইলাম। মা গত ১৬ই ভোরে মোটরে হোসিয়ারপুর হইতে ২৬ মাইল দূরে পাহাড়ের উপর উনা নামক স্থানে গিয়াছিলেন। অবধূতজীর আগ্রহেই সেখানে যাওয়া। মার সঙ্গে শুধু বুনি, উদাস, বিল্লো ও পানু গিয়াছিল। দীনবন্ধু, শোভা ও পুষ্প হোসিয়ারপুরেই থাকিয়া গেল। রাস্তা শোনা গেল খুবই খারাপ। জায়গাটিও বেশ ঠাণ্ডা। একটি নূতন বাড়ীতে মা ও হরিবাবার থাকার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সৎসঙ্গ ও কীর্ত্তনের ব্যবস্থা স্থানীয় শিব মন্দিরের প্রাঙ্গনে করা হইয়াছিল। বাড়ীটি একেবারে নূতন থাকায় মার খুবই ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি-কাশি ও জ্বর জ্বর ভাব হয়। দুইদিন সেখানে থাকিয়া ১৮ই ভোরে মা আবার হোসিয়ারপুর ফিরিয়া আসিয়াছেন। সেখানে তিনদিন থাকার কথা।

আজই হোসিয়ারপুর হইতে উদাস ও দীনবন্ধু মার নির্দ্দেশ মত আসিয়া উপস্থিত। তাহাদের নিকট হইতে সকল সংবাদ পাওয়া গেল। আমার ব্যথার খুবই বাড়াবাড়ি শুনিয়া আমার সেবার জন্য মা বিল্লো ও শোভাকে পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা মাকে ছাড়িয়া আসার কথা শুনিয়াই খুব কান্নাকাটি করায় মা তাহাদের আসা সম্বন্ধে আর কিছুই বলেন নাই। কাল বিকালেই সৎসঙ্গ

হইতে ফিরিয়া আসিয়া হঠাৎ মার খেয়াল হওয়ায় দশ মিনিটের মধ্যে উদাস ও দীনবন্ধুকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। শুনিলাম মা প্রথমে বুনিকেই পাঠাইবার খেয়াল করিয়াছিলেন। কিন্তু হরিবাবা ও অবধূতজী দুইজনেই মার সেবার ত্রুটি হইবে বলিয়া অনিচ্ছা প্রকাশ করায় আর বুনিকে পাঠান হয় নাই।

আমার ব্যথা এদিকে খুবই বাড়াবাড়ি চলিতেছে। মাও নিকটে নাই। কি যে করা হইবে তাহা ভাবিয়া সকলেই একটু বিচলিত। হরিবাবার ভক্ত আগ্রার মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ ব্যাসের ঔষধ কয়েকদিন খাওয়া হয়। কিন্তু কিছুই ফল পাওয়া যায় নাই। পরে আগ্রারই আবার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাঃ সরকারের ঔষধ খাওয়া হইতেছে।

২৪শে অক্টোবর, ১৯৫৪

আজ সন্ধ্যায় প্রায় সাড়ে ছয়টা নাগাদ মা বৃন্দাবন আশ্রমে আসিয়া পৌছিলেন। বিল্লো ও শোভা আজ সকালেই ট্রেণে আসিয়া পৌছিয়াছে। মার বিস্তারিত সংবাদ পাওয়া গেল। মা ২১শে সকালে প্রায় ৮টা নাগাদ মোটরে জলন্ধর রওনা হইয়া যান। সেখান হইতে রওনা হইবার সময় মা কাশী হইতে কমল ব্রহ্মচারীকে বৃন্দাবন আসার জন্য টেলিগ্রাম করাইয়া গিয়াছেন। জলন্ধরে একদিন থাকিয়া ২২শে সকালে মা হরিবাবা সহ থান্না যান। প্রায় ৬০ মাইল মোটরে যাইয়া বেলা

বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্ত্তন।

দশটা নাগাদ মা ত্রিবেণীপুরীজীর সমাধি মন্দিরে গিয়া পৌছেন। ব্যাণ্ড বাদ্য ইত্যাদি সহকারে মা ও হরিবাবার অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। গত ১৯৫২ সনেও মা খান্নাতে আসিয়া কয়েকদিন ছিলেন। সেবার মার জন্মোৎসব ঐখানেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তখন সমাধি মন্দির সদ্য নির্ম্মিত হইতেছিল। ব্যবস্থা এখন নাকি খুবই সুন্দর হইয়াছে। মা ও সঙ্গীয় সকলের যাহাতে কোনও রূপ অসুবিধা না হয় সেজন্য অবধূতজী স্বয়ং বিশেষ সচেষ্ট থাকিতেন। তাঁহার ব্যবস্থা খুবই নিখুঁত। খান্নাতে গিয়া সকলেরই খুব ভাল লাগিতেছিল। মাও নাকি বলিয়াছেন—"এখানে কয়েকটা দিন থাকিয়া গেলে শরীরটা ভাল হইত। হাওয়া খুবই সুন্দর।"

খান্নাতে মাতৃসকাশে পাকিস্তানের রাজদূতের ভাবাবেশ।

মার খান্না থাকাকালীন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে সেখানে ২৩শে সন্ধ্যায় পাকিস্তানের High Commissioner রাজা গজনফর আলি খাঁন (ইনি পূর্ব্বেও মার কাছে বেশ কয়েকবার আসিয়াছেন) তাঁহার সঙ্গে Deputy High Commissionerকে লইয়া মার দর্শনের জন্য আসেন। Deputy High Commissioner ভদ্রলোক উচ্চশিক্ষিত—মধ্য বয়স্ক। তিনি মার নিকট এই প্রথম বার আসিয়াছিলেন। কিন্তু মার দর্শন করিতেই তাঁহার ভিতর অদ্ভুত সব ভাবের প্রকাশ সুরু হয়। শিশুর মত সকলের সম্মুখে কাঁদিতে কাঁদিতে উচ্চস্বরে কোরাণ আবৃত্তি ও নামাজ পড়িতে সুরু করেন। এইভাবে প্রায় দীর্ঘ তিন ঘণ্টা কাল কাটিয়া যায়। সন্ধ্যার পরই তাঁহাদের জলন্ধরে ফিরিয়া যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ঐ ভদ্রলোকের এইরূপ ভাবাবেশের জন্য তাঁহাদের আর যাওয়া

সম্ভব হয় নাই। পাশের এক বাসায় তাঁহাদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়। ভাবাবেশ কাটিয়া গেলে তিনি রাত্রে বলিয়াছিলেন যে মাকে দেখা মাত্রই তাঁহার ভিতর কি সব যেন আরম্ভ হইয়া গেল কিন্তু তাঁহার কিছুই স্মরণে নাই। শুধু অপূর্ব্ব এক আনন্দের স্রোতে তিনি ডুবিয়া ছিলেন এইটুকুই তাঁহার অনুভব হইতেছিল। মার দর্শন করিবার পর হইতেই সরকারী চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া মার নিকটে আশ্রম বাস করিবার প্রবল ইচ্ছাও তাঁহার মনে জাগে। এতদিন যে মার দর্শন পান নাই তাহা তাঁহার একান্ত দুর্ভাগ্য সে কথা বারবারই বলিতেছিলেন।

আবার পূর্ব্ব কথায় ফিরিয়া আসি। খান্নাতে থাকাকালেই আমার অসুস্থতার বাড়াবাড়ি সংবাদ মার নিকট পৌছে। সেখান হইতেই বুনি বা পানুকে আমার কাছে পাঠাইবার খেয়াল মার হইয়াছিল। কিন্তু নানা দিক ভাবিয়া তাহা আর হয় নাই। ইহারা চলিয়া আসিলে নানা ভাবের অসুবিধাও হয়ত হইত। শুনিলাম মা ওখানেই নাকি রোগের এক মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। মার মুখে শুনিয়া বুনিরও খুব ভয় হইয়াছিল। হরিবাবাও আমার সুস্থতার জন্য তাঁহার আশ্রমে ৫১ চণ্ডীপাঠ ও যজ্ঞ ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন এবং সকলের নিকট আমার কল্যাণের জন্য "রোগানশেষান" মন্ত্র ও অন্য বীজমন্ত্রাদি জপ করার জন্য অনুরোধ জানান।

শুনিলাম আজ ভোর সাতটায় মা হরিবাবা ও অবধূতজী সহ মোটরে দিল্লী রওনা হন। মার সঙ্গে শুধু বুনি, পুষ্প ও পানুই ছিল। পূর্ব্বদিনই রাত্রে হরিবাবার সঙ্গীয় লোকদের সঙ্গে বিল্লো ও শোভাকে মা সোজা বৃন্দাবন পাঠাইয়া দেন। প্রায় ১৬০ মাইল মোটরে আসিয়া

বেলা প্রায় ১টা নাগাদ মা ডাঃ জে. কে. সেনের বাসায় পৌঁছেন। হরিবাবা তাঁহার ভক্ত আদিত্য নারায়ণের বাসায় চলিয়া যান। অবধূতজী মার ওখানেই খাওয়াদাওয়া এবং বিশ্রাম করেন। বৃন্দাবনে আসার জন্য টিহরীর মহারাজা এবং কমলা জয়সওয়ালের গাড়ী পূর্ব্বেই ঠিক করিয়া রাখা ছিল। দিল্লীতে খাওয়াদাওয়া শেষ করিয়া বেলা প্রায় তিনটার সময় মা সকলকে লইয়া বৃন্দাবন রওনা হন। পথে বিশেষ একটু কারণে ঘণ্টাখানেক দেরী হইয়া যায়। তাই মার আশ্রমে পৌঁছিতে পৌঁছিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া যায়।

২৫শে অক্টোবর, ১৯৫৪

গোবর্দ্ধনে প্রতি বৎসরই দেওয়ালী হইতে গোপাষ্টমী পর্য্যন্ত বিশেষ উৎসব হয়। সেই সময় মাকে উপস্থিত থাকার জন্য রাওয়াতজী* বহুবার মার নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছেন। কিন্তু হঠাৎ সংবাদ পাওয়া গেল যে ভারত সরকারের মন্ত্রী রফি আহমেদ কিদওয়াই সাহেবের পরলোক গমনে এবার গোবর্দ্ধনের উৎসব বন্ধ থাকিবে। রাওয়াতজী অতি দুঃখের সহিত ফোন করিয়াছেন যে মাকে এবারও নিতে পারিলেন না।

---

* উত্তর প্রদেশের কংগ্রেস নেতা ও মন্ত্রী শ্রীজগনপ্রসাদ রাওয়াত। মার সঙ্গে ইহার অনেক দিনের পরিচয়।

২৬শে অক্টোবর, ১৯৫৪

বৃন্দাবন আশ্রমে দীপাবলী উৎসব।

আজ দীপাবলী। হরিবাবাজীর ইচ্ছানুসারে আশ্রমেই আজ সন্ধ্যায় সৎসঙ্গের আয়োজন হইয়াছে। আমার রোগমুক্তি উদ্দেশ্যে তিনি বিশেষ করিয়া মার ঘরে দশজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দিয়া প্রায় দুই ঘণ্টা পাঠের ব্যবস্থা করিয়াছেন। হরিবাবাজী নিজেও নীচের হলঘরে প্রায় আড়াই ঘণ্টা কীর্ত্তন করিলেন।

সন্ধ্যার পর আশ্রমটিকে শক্তি, দীনবন্ধু, রাজু প্রভৃতি ছেলেরা মিলিয়া বিশেষ উৎসাহের সহিত খুব সুন্দর করিয়া বাতি দিয়া সাজাইল।

২৮শে অক্টোবর, ১৯৫৪

আজ ভাইফোঁটার দিন। আমি এইরূপ অসুস্থ হইয়া শুইয়া আছি। তাই ভাইফোঁটার কথা আর আমার মনেও আসে নাই। কিন্তু মা দুইদিন পূর্ব্বেই পানুকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন যেন সব ব্যবস্থা ঠিক থাকে। মার সবদিকেই পূর্ণ খেয়াল।

আজ সন্ধ্যার পর আমার ঘরে আসিয়া মা আমাকে বলিলেন— "এবার তুমি খাটের উপর বসে বসেই ফোঁটা দেও।" অন্যান্যদের বলিলেন—"অন্যবার দিদিই তোমাদের ঘুরে ঘুরে ফোঁটা দেয়। এবার তোমরাই দিদির কাছে এস। তোমরা সকলে বল দিদি যেন আবার ঘুরে ঘুরে তোমাদের ফোঁটা দিতে পারে। ব্রহ্মবিন্দু দিলে নিজেরও ব্রহ্মগ্রন্থি খুলবে অপরেরও।" অন্যবারের মত এবারও ফোঁটা ও মিষ্টি

সকলকে দেওয়া হইল। হরিবাবাজীর জন্যও মিষ্টি পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে আমার হাতে 'ব্রহ্মবিন্দু' বা ভাইফোঁটা দেওয়ার প্রথা শাশ্বতানন্দ স্বামীজীর ইচ্ছানুসারে চলিয়া আসিতেছে। ইহার নাম 'ব্রহ্মবিন্দু'—তাই বোনেরাও ইহা পাইয়া থাকে।

পরশু রাত্রে হরিবাবা আমার নিকট আসিয়া বহুক্ষণ বসিয়াছিলেন। আমাকে বিশেষ করিয়া বলিতেছিলেন ভাল হইবার জন্য। তাঁহার কৃপার কথা ভাবিলে সত্যই চোখে জল আসে। তিনি আমার জন্য কতই না করিতেছেন। মার সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে মাকে বলিতেছিলেন—"মা, আপ দিদিকো ডাঁট দিজিয়ে।" মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিস্ তরহসে ডাঁটু, পিতাজী?" হরিবাবা মাকে শুনাইলেন যে একবার তাঁহার অসুখ হইয়াছিল। সেই সময় এক-জন পণ্ডিত আসিয়া শুধু ধমকের জোরেই তাঁহাকে রোগ মুক্ত করিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে একদিন সৎসঙ্গের পর মা আমার ঘরে আসিয়া খুব গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন—"দিদি, এমন করলে আর কি করে বম্বে যাবে? মোটে হাঁটতে পার না, উঠতে পার না, চলতে পার না।" মার কথার ভাবটা যেন আমি ইচ্ছা করিয়াই রোগ করিয়াছি। মাকে বলিলাম—"আমি কি করিব? পারি না যে।" মা বলিলেন —"বেশ তবে থাক। আর যদি যেতে চাও তবে ওঠ—হাঁট।" মার কথা শুনিয়া চুপ করিয়া থাকি। বলিবার ত কিছুই নাই। কিছুক্ষণ পরে মা আবার বলিলেন—"আমার খাওয়ার ব্যবস্থা ত আমি নিজেই করে নিয়েছি। দুধ দিয়ে রুটি আর নূন ছাড়া তরকারী।"

আবার কখনও আমার খাটের উপর বসিয়া বসিয়া বলেন—"বেশ গদিয়ান হয়ে শুয়ে আছ। এক এক বার বসি আর দেখি কি রকম বিছানা। এরকম নরম বিছানায় তোমার বাবাও কখনত শোয়নি। (সকলের হাস্য) একটু লজ্জাও করে না।" ইহা সবই মার লীলা। প্রায় সকলেই জানেন যে মারই বিশেষ নির্দ্দেশে আমার বিছানার নীচে রবারের গদি পাতা হইয়াছে যাহাতে আমার কষ্ট না হয়—মারই নির্দ্দেশে আমাকে একটু আরাম দিবার যত কিছু ব্যবস্থা। আবার মা-ই স্বয়ং আমাকে মধ্যে মধ্যে ঐরূপ বলিয়া থাকেন। উহা সবই যে আমাকে একটু প্রফুল্লিত করার জন্য তাহা সকলেই বোঝে।

আমার রোগের প্রায় এক বৎসর হইয়া আসিল। গত বৎসর বৃন্দাবনেই এই ব্যথার সূত্রপাত। এখন একটু বাড়াবাড়ি। আমি অতি কষ্টে পাশ ফিরিতে পারি—হাঁটা-চলা ত দূরের কথা। এক এক সময় মা আমার কাছে আসিয়া বলেন—"ফুলবিবি একেবারে! সাধু-সন্ন্যাসীদের পর্য্যন্ত তুমি নাচিয়ে তুলেছ।" শুনিয়া আমি হাসি আর ভাবি মার এ অন্য একরূপ!

অমলদার মেয়ে গিনি আমার সঙ্গে আছে। মাকে কাতর ভাবে বলে—"মা, তুমি দিদিকে ভাল করে দেও।" মা সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দেন—"তোর বাবাকেও ত ভাল করা হয়নি। সে কথাটাত বললি না।" মার নিকট সকলেই সমান। মার কাছেত যাহা হইয়া যায়। অনেকেই মনে করে মা দিদিকে নিশ্চয়ই ভাল করিবেন। কিন্তু মা যে আমার জন্য বিশেষ কিছু করিবেন না তাহা স্বতঃসিদ্ধ। মার নিকট যে কোনও আপন-পর নাই—কোনও রূপ পক্ষপাত নাই।

মার নিকট সকলেই সমান।

সেইজন্য আমি কখনও ভুলিয়াও মাকে এই জাতীয় প্রার্থনা জানাই না। মার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে—তাহাই আমার পক্ষে মঙ্গল।

মা ইতিমধ্যে একদিন আমাকে বলিতেছিলেন—"দিদি, তোমার মনে আছে না? বাবাকে দিয়ে তোর কাছে একবার টেলিগ্রাম করান হয়েছিল। ব্যথার একটা মূর্ত্তি দেখা গিয়েছিল।"

তখন আমার মনে পড়ে যে বহু বৎসর পূর্ব্বে মা আমাকে বিন্ধ্যাচলে রাখিয়া অখণ্ডানন্দ স্বামীজীকে লইয়া পুরী কিংবা ভুবনেশ্বরে ছিলেন। একদিন বিন্ধ্যাচলে খাওয়ার পর মুখ ধুইতেছিলাম এমন সময় হঠাৎ আমার বুকে-পিঠে একটা ভয়ানক ব্যথা হয়। কিছুক্ষণ পরেই মার নিকট হইতে অপ্রত্যাশিতভাবে একখানা টেলিগ্রাম আসে। টেলিগ্রাম পাইয়াত আমি অবাক। আমার খবর মা এত শীঘ্র কিভাবে পাইয়া গেলেন। পরে মার সঙ্গে দেখা হইলে মা আমাকে বলিয়াছিলেন যে ঠিক ঐ দিন ঐ সময়ে মা স্থূক্ষে দেখিয়াছিলেন ভয়ঙ্কর একটা ব্যথার মূর্ত্তি আমাকে টানিয়া নিয়া যাইতেছে। ইহা দেখিয়াই মা আমাকে টেলিগ্রাম করিতে বলেন এবং স্বামীজীকে আমার নিকট পাঠাইয়া দেন আমাকে নিয়া যাইবার জন্য।

এতদিন পর মার মুখে আবার সেই ব্যথার মুর্ত্তির কথা শুনিয়া মনে পড়িয়া গেল সেই পুরাতন কথা। মা আবার নিজ হইতেই বলিলেন—"তখন এই ব্যথার মূর্ত্তি দেখা গিয়েছিল আর এখন এইরূপ ব্যথায় তুই কষ্ট পাচ্ছিস্।"

আমার অসুস্থ শরীর লইয়া সর্ব্বদা শুইয়াই থাকিতে হয়। মার কোনও সেবায় লাগি না। আর সকলে মার কত প্রকারে সেবা করিবার সুযোগ পাইতেছে। এইসব কথা ভাবিয়া একদিন খুব মন

খারাপ করিয়া আছি। এমন সময় মা হঠাৎ আমার নিকট আসিয়া নিজ হইতেই বলিতে সুরু করিলেন—"দিদি, তোমার ত মন খারাপ করা শোভা পায় না। ভগবান যখন যে বিধান করেন তাই মঙ্গলের জন্য। এইভাবেই নিতে হয়। এই তাঁর ইচ্ছা। সব অবস্থায় ধৈর্য্য ধরে থাকতে হয়। সবই যে তাঁর করুণা।"

৫ই নভেম্বর, ১৯৫৪

আজ ভোর সাড়ে চারটায় মা দিল্লী রওনা হইয়া গেলেন। যাইবার সময় আমাকে বলিয়া গেলেন—"সাবধান মত থেকো।"

দিল্লী হইয়া মীরাটের পথে।

অসুস্থতার জন্য মার সঙ্গে যাইতে পরিলাম না। আমার শরীর যে এমনটা অপটু হইয়া পড়িবে আমিত নয়-ই, কেহই হয়ত ধারণা করে নাই। কিন্তু বিধির বিধান অলঙ্ঘনীয়। উপায় নাই। যত ব্যথাই হউক মানিয়া নিতেই হইবে।

গতকাল বিকালেই মার যাওয়ার জন্য টিহরীর মহারাজা মোটর পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। মা সেই গাড়ীতেই রওনা হইয়া গেলেন। মার সঙ্গে এবার কমল, উদাস, পুষ্প, শোভা, বিল্লো, দীনবন্ধু প্রভৃতি গেল। দিল্লী হইতে মীরাট যাওয়ার কথা। মীরাটের শকুন্তলা অনেক দিন যাবতই মাকে একবার যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানাইতেছিল। এতদিন পরে যাওয়া স্থির হইল।

মা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেমন আমাদের মানসিক অবস্থা তেমনই আশ্রমের অবস্থা। সবই যেন শূন্য। এত জনসমাগম, এত মোটর, টঙ্গা, রিক্সা ইত্যাদির ভীড় সব কোথায় চলিয়া গেল? এখন সব নীরব—নিস্তব্ধ।

৭ই নভেম্বর, ১৯৫৪

কমলের চিঠি আসিয়াছে। লিখিতেছে মা পরশু সকাল প্রায় আটটা নাগাদ দিল্লী আশ্রমে পৌছিয়াছেন। ব্যবস্থা সবই ঠিক ছিল। গতকাল মা হয়ত মীরাট চলিয়া গিয়াছেন। ভূপেন* মাকে নিতে আসিয়াছিল। মীরাটে একদিন থাকিয়া মার আবার দিল্লীতেই ফিরিয়া আসার কথা। আমার সম্বন্ধে মা লিখাইয়াছেন—"সব সময় শান্ত ভাবে মনে রাখতে হবে ভগবান যখন যা করেন মঙ্গল। পরিস্থিতি যদি সাময়িকভাবে একরূপ না থাকে ভাববার কি? যখন যা হয় তাঁর ইচ্ছায়ই। কাজেই তিনি যখন যা করেন সবই মঙ্গলের জন্য এটা স্থিরভাবে গ্রহণ করা। আকুলি-বিকুলি হয়ে গ্রহণ করা কেন? ওটা আধ্যাত্মিক পথের যাত্রীদের কর্ত্তব্য নয়। তবেই না সৎসঙ্গ সৎভাবে জীবন কাটিয়ে আসার সফলতা। এই সময় নিজে কোথায় ধরবার অনুকূল হয় না কি?"

---

* শ্রীভূপেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি কিছু দিন ব্রহ্মচারী হিসাবে আশ্রমেই ছিলেন। বর্ত্তমানে Assistant Controller of Defence Accounts.

১২ই নভেম্বর, ১৯৫৪

ইতিমধ্যে মার সংবাদ পাইয়াছিলাম যে মা গত ৬ই মীরাটে গিয়া সেখানে এক রাত্রি থাকিয়া পুনরায় ৭ই বিকালে দিল্লী ফিরিয়া আসেন।

কর্ণবাসে মা।

মীরাটে মার জন্য খুবই সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছিল। ৮ই সকালেই মা আবার কর্ণবাস রওনা হন। কর্ণবাস একটি সাধন ভজনের স্থান—নির্জন তপোভূমি। আলীগড় হইতে কিছু দূরে। সেখানকার একজন ব্রহ্মচারী মোটর লইয়া মাকে নিতে আসিয়াছিলেন। মার সঙ্গে কমল, উদাস ও সেবা গিয়াছিল। সেখানেও মাত্র একদিন থাকিয়া মা আবার দিল্লী ফিরিয়া আসেন।

আজ সন্ধ্যার পর মা আকস্মিকভাবে দিল্লী হইতে আসিয়া উপস্থিত। মাকে পাইয়া আমরা ত অবাক। পূর্ব্বে কথা ছিল যে আমরা এখান হইতে আগামী কাল বম্বে রওনা হইব। মাও দিল্লী হইতে ঐ গাড়ীতেই আসিবেন। মা দিল্লী হইতে সঙ্গে মাত্র উদাস, সেবা ও জিতেনকে* লইয়া আসিয়াছেন।

শ্রীহরিবাবাজী এখানে কিছু দিন যাবত অসুস্থ। তিনি আমাদের সঙ্গে বম্বে যাইয়া সংযম সপ্তাহে যোগদান করিতে পারিবেন কিনা কিছুই ঠিক নাই। দিল্লীতে মার নিকট সংবাদ যায় যে হরিবাবাজী মৌন হইয়া গিয়াছেন। পনের দিনের মধ্যে শুধু মা ভিন্ন অন্য কাহারো সঙ্গে কথা বলিবেন না বা সৎসঙ্গেও আসিবেন না। মা এই সংবাদ

* শ্রীযুক্ত জীতেন্দ্র নাথ দত্ত—মার বহু পুরাতন ভক্ত। ইনি বর্ত্তমানে বম্বেতে Tariff Board এর member.

পাইয়াই অসুস্থ শরীর লইয়াও ছুটিয়া আসিয়াছেন। আশ্রমে আসিবার পূর্ব্বেই মা হরিবাবাজীর সঙ্গে দেখা করিয়া আসিলেন। পরে শোনা গিয়াছে যে তিনি মৌন থাকেন নাই। ভক্তদের ইচ্ছায় তাঁহার ঐ সংকল্প পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে।

মার দেখিলাম খুবই সর্দ্দি কাশি চলিতেছে। কাশিতে কাশিতে পেটে একটা ব্যথার সৃষ্টি হইয়াছে। মা যখন মীরাট গিয়াছিলেন তখন হইতেই এই ব্যথার উৎপত্তি। মার শরীর এমনিও ভাল যাইতেছে না। বিশ্রামও একেবারেই নাই। এই শরীর লইয়াই আবার বম্বে যাইতেছেন। বম্বের ভক্তেরা বহুদিন হইতে বম্বেতে একবার সংযম সপ্তাহ অনুষ্ঠানের জন্য মার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছিলেন। এবার তাহা ১৮ই হইতে ২৪শে পর্য্যন্ত হওয়া স্থির হইয়াছে। সোপোরী ভাই* বিশেষ উদ্যোক্তা। ব্যবস্থার জন্য ব্রহ্মচারী কান্তিভাইকে মা পূর্ব্বেই পাঠাইয়া দিয়াছেন।

১৩ই নভেম্বর, ১৯৫৪

বম্বে যাত্রা।

আজ সকালে আমরা মার সঙ্গে মথুরা হইতে ফ্রন্টিয়ার মেলে বম্বে রওনা হইলাম। সঙ্গে প্রায় ২২।২৩ জন। দিল্লী হইতেও কয়েকজন মেয়েরা আসিয়া ঐ গাড়ীতে মার সঙ্গে মিলিত হইল।

---

* মায়ের পুরাতন কাশ্মিরী ভক্ত শ্রী এস্, এন্, সোপোরী—ইনি Cement Marketing Corporation of Indiaর Deputy General Manager.

পথে সোয়াই মাধোপুর স্টেশনে শ্রীদাস গোয়েল এবং আরও বহু লোক মার দর্শনের জন্য আসিলেন। বরোদা স্টেশন ত লোকে লোকারণ্য। স্বামী কৃষ্ণানন্দ অবধূতজী কয়েকদিন পূর্ব্বেই চান্দোদ আশ্রমে আসিয়াছিলেন। আজ বরোদা স্টেশনে আসিয়া মার সঙ্গে একত্রিত হইলেন। আম্বের রাজা-রাণীও এই গাড়ীতেই জলন্ধর হইতে উঠিয়াছেন। তাঁহারাও সংযম সপ্তাহে যোগদান করিতে যাইতেছেন।

১৪ই নভেম্বর, ১৯৫৪

আজ সকাল প্রায় সাড়ে আটটায় আমরা বম্বে সেণ্ট্রাল স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। বম্বের বহু ভক্ত স্ত্রী পুরুষ মাকে অভ্যর্থনা জানাইলেন। টিহরীর মহারাজা-মহারাণীকেও স্টেশনে দেখিলাম। স্টেশন হইতে আমাদের সোজা জুহুতে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানেই শুনিয়াছি সপ্তাহ হইবে।

জুহুতে কি ভাবে সপ্তাহের ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই সোপোরী ভাই এখানকার সন্ন্যাস আশ্রমে সপ্তাহের ব্যবস্থার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু নানা কারণে তাহা হইয়া উঠে নাই। অবশেষে সকলে মিলিয়া সাণ্টাক্রুজে লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দিরে সপ্তাহ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা পাকাপাকি করিয়া ফেলেন। নিমন্ত্রণ পত্রও ছাপা হইয়া যায়। কিন্তু মন্দিরের হলে স্থান সঙ্কুলান হইবে না বলিয়া সকলেরই একটু আশঙ্কা ছিল। আমাদের নিকটও

বম্বেতে সংযম সপ্তাহ

এই মর্ম্মে বৃন্দাবনে চিঠিপত্র যাইতেছিল। হঠাৎ সপ্তাহ সুরু হইবার কয়েকদিন পূর্ব্বে New India Assurance Co. র General Manager শ্রী বি, কে, শাহ অযাচিতভাবে আসিয়া সমস্ত ব্যবস্থা যেন পূর্ণ করিয়া দিলেন। তাঁহার পরিচিত একজন পার্শি ক্রোড়পতি ভদ্রলোক সপুরজী পালানজীর সমুদ্রের একেবারে পাড়ে জুহুর উপরে দুইটি খালি বাড়ী পড়িয়া আছে। কলিকাতায় একবার সামান্য কিছুক্ষণের জন্য মার সঙ্গে শ্রীযুক্ত শাহের দেখা হইয়াছিল। মার বিশেষ কৃপা নাকি তাঁহার উপর বর্ষিত হইয়াছে। তাই তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেবায় অগ্রসর হইয়াছেন। সমুদ্র তটের উপরে সেই বাড়ী দুইটির চুণকাম করা, রং করা, লাইট ও জলের ব্যবস্থা করা, বিশাল প্রাঙ্গন পরিষ্কার করার সমস্ত ভার তিনি স্বয়ং নিয়া সব ঠিক করিয়া দিয়াছেন। প্রাঙ্গনে একটি বড় প্যাণ্ডেলও বানান হইয়াছে। সর্ব্বত্র একেবারে নিখুঁত ব্যবস্থা। রাজা মহারাজা বিশিষ্ট ব্যক্তি, সাধুমহাত্মা এবং অতিথিব্রতী সকলের জন্য পৃথক পৃথক ব্যবস্থা করা হইয়াছে দেখিলাম। মা ত গৃহস্থের বাড়ীতে থাকেন না তাঁহাদের জানা আছে। তাই প্রথম বাড়ীটির ছাদের উপর কাঠ ও কাপড় দিয়া মার জন্য একটি অতি মনোরম ঘর বানান হইয়াছে। দেখিলে মনে হয় যেন সুন্দর থিয়েটারের একখানি ঘর। উপরেই অন্য একটি ছোট ঘর এবং বাথরুমও বানান হইয়াছে। সব দেখিয়া খুবই আনন্দিত হইলাম।

১৬ই নভেম্বর, ১৯৫৪

গতকাল পরমানন্দ স্বামিজী রাজগীর হইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন

রাজগীরে নূতন একটি আশ্রম বানান হইতেছে। স্বামিজী সেখানে তাহার তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। কথা হইয়াছে মা শীতকালে গিয়া সেখানে কয়েক সপ্তাহ থাকিতে পারেন। সেই উদ্দেশ্যেই তাড়াহুড়া করিয়া সেখানে একটি ছোট্ট আশ্রম বানান হইতেছে। পরমানন্দ স্বামিজী আসিবার সময় কাশী হইতে মেয়েদের মধ্যে কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। আগামী পরশু হইতে সপ্তাহ সুরু। ভক্তদের মধ্যে অনেকেই ইতিমধ্যে আসিয়া গিয়াছেন। নিকটস্থ ২।১টি বাড়ীও ভাড়া নেওয়া হইয়াছে। সন্ন্যাসীদের মধ্যে কেহ কেহ সন্ন্যাস আশ্রমেই আছেন।

আজ খুব ভোরে গুজরাট হইতে স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী আসিয়া পৌছিলেন। ইনি বেশ পণ্ডিত ব্যক্তি। মার নিকট কিছু দিন যাবৎ আসা যাওয়া করিতেছেন। বেশ সুন্দর স্বভাব। সোলনের রাজা সাহেবও (যোগীভাই) আজ আসিয়া পৌছিলেন। সংযম সপ্তাহ মহাব্রতের তিনিই প্রধান উদ্যোক্তা। ইতিপূর্ব্বে কাশী, বিন্ধ্যাচল ও কলিকাতায় যে সপ্তাহ পালন করা হইয়াছে তাহাতে তিনি সর্ব্বদাই উপস্থিত ছিলেন।

১৮ই নভেম্বর, ১৯৫৪

আজ ভোরবেলা হইতে চতুর্থ সংযম সপ্তাহ সুরু হইয়াছে। প্রতিবারের মত এবারও ব্রতীদের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর ব্রতীদের আহারের নিয়ম খুবই কঠোর।

তবু গুজরাটীদের মধ্যে বহু স্ত্রী-পুরুষ স্বেচ্ছায় প্রথম শ্রেণীর ব্রত সুরু করিয়াছে। রাজারাণীদের মধ্যেও অনেকেই প্রথম শ্রেণীর ব্রত পালনে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের অনভ্যাস বশতঃ এতটা কঠোর নিয়মে অসুস্থ হইতে পারেন বলিয়া মা তাঁহাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নিয়ম পালন করিতে বলেন।

মা অবশ্য সর্ব্বদাই বলেন যে যতটা পারে সংযম পালন করা। যাহারা পুরা পালন করিতে অক্ষম তাহারা আংশিক ভাবে পালন করিলেও পারে। যাহারা সাত দিন সম্পূর্ণ পালন করিতে অসমর্থ—তাহারা অন্ততঃ একদিনও পালন করিতে পারে। মার কথা—"যতটা সংযমের ভিতর দিয়া যাইতে পারিবে ততই জীবন সুন্দর হইবে—তদ্মুখী হইবে।"

প্রথম শ্রেণীর ব্রতীদের শুধু গঙ্গাজল খাওয়া নিয়ম এবং তাহা ছাড়া তাহাদের রান্নাও গঙ্গাজল দিয়াই হইবার কথা। যোগীভাইর ব্যবস্থা মত হরিদ্বার হইতে রেলে বহু টিন গঙ্গাজল আসিয়া গিয়াছে। কিন্তু তবু প্রথম শ্রেণীর ব্রতীদের সংখ্যা এবার বেশী হওয়ায় রান্না কলের জল দিয়াই করা হইবে।

সপ্তাহের কার্য্যক্রম বহুলাংশে অন্যান্য বারের মতই রাখা হইয়াছে। সূর্য্যোদয় খুব দেরীতে হয় বলিয়া উষা কীর্ত্তন ভোর সাড়ে পাঁচটায় রাখা হইয়াছে। সোয়া ছয়টা হইতে সাতটা পর্য্যন্ত ব্রতীদের আপন আপন নিত্য কৃত্য। সাতটা হইতে পৌনে আটটা পর্য্যন্ত আশ্রমের নিত্য গীতা, চণ্ডী ও উপনিষদ্ পাঠ। তাহার পর আটটা হইতে নয়টা পর্য্যন্ত এক ঘণ্টা ধ্যানজপ-মৌন। এই সময়টি সংযমের একটি বিশেষ অঙ্গ। নয়টা হইতে সাড়ে এগারটা পর্য্যন্ত মহাত্মাদের ভাষণ ও মাতৃসঙ্গের

ব্যবস্থা। মাতৃসঙ্গ মানে সেই সময়ে সকলে মাকে নানা আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রশ্ন করে অথবা অনেক সময়ে মা নিজে ভজন কীর্ত্তনও একটু করিলেন।

পুনরায় সাড়ে তিনটা হইতে সাড়ে চারটা পর্য্যন্ত মৌনের সময়। তাহার পর ছয়টা পর্য্যন্ত মহাত্মাদের ভাষণ। পৌনে সাতটা পর্য্যন্ত ব্রতীদের নিত্য সন্ধ্যা বন্দনাদির সময়। তাহার পর সাড়ে সাতটা পর্য্যন্ত আশ্রমের নিত্য কীর্ত্তন। সাড়ে সাতটা হইতে সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত মহাত্মাদের ভাষণ এবং মাতৃসঙ্গের সময়। শত শত লোক ঠিক এই সময়টির জন্য উন্মুখ হইয়া প্রতীক্ষা করে। জুহু সহর হইতে প্রায় ১২।১৪ মাইল দূরে। তবুও রাত্রি ১১।১২টা পর্য্যন্ত ভীড় লাগিয়াই আছে। বিরাট প্রাঙ্গনে মোটরের সাড়ি। মাকে ছাড়িয়া বাড়ী যাওয়ার তাড়া যেন কাহারো নাই।

১৯শে নভেম্বর, ১৯৫৪।

আজ সকালে বৃন্দাবন হইতে শ্রীশ্রীহরিবাবাজী ও চক্রপাণীজী প্রভৃতি এখানে আসিয়া পৌছিলেন। বৃন্দাবনের যোগেনদাদাই ইহাদের দেখাশুনা করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। চক্রপাণীজী ও সুন্দরলালজীর নিকটস্থ একটি ঘরে থাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। হরিবাবাজীর জন্য সন্ন্যাস আশ্রমে সব ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছিল। কিন্তু সেখানে তাঁহার অনুকূল না হওয়ায় জুহু aerodrome এর ভিতরে একটি খালি বাড়ীতে তাঁহার ও সঙ্গীয় লোকদের থাকার ব্যবস্থা করা হইল।

সন্ন্যাস আশ্রমে থাকা হইল না দেখিয়া সেখানকার কর্তৃপক্ষেরা বোধ হয় একটু মনঃক্ষুণ্ণই হইলেন কিন্তু আমাদের কিছু করিবার উপায় ছিল না। জুহুর Chief Aerodrome Officer সর্দ্দার সন্তোক সিং অতি সজ্জন লোক। তিনিই সব ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

এইবার আমার শরীরের বিষয়ে আসা যাক। বম্বেতে অনেক বড় বড় চিকিৎসক আছেন। তাঁহাদের একবার ভাল করিয়া দেখাইবার জন্য অনেকেই বার বার লিখিতেছেন এবং বলিতেছেন। আমাকে এই অসুস্থ এবং অচল অবস্থায় বৃন্দাবন হইতে লইয়া আসার তাহাও একটি প্রধান কারণ। ইতিমধ্যে কান্তিভাই মুন্‌শী আমেদাবাদ হইতে আসিয়াছেন, তিনি বিশেষ উদ্যোগ করিয়া এখানকার কয়েকজন বড় চিকিৎসকদের দেখাইলেন। Physician, Surgeon, Bone Specialist, Radiologist, Nerve-Specialist কেহই বাদ গেল না। প্রথম কয়েকদিন এখানকার বিশেষ খ্যাতনামা চিকিৎসক জাল প্যাটেলের চিকিৎসা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার নির্দ্দেশমত কয়েকদিন ইঞ্জেক্‌সন ও ঔষধ দিবার পর শরীর আরও খারাপ বোধ হওয়ায় বাধ্য হইয়া তাঁহার চিকিৎসা বন্ধ করিয়া দিতে হইল। কান্তি ভাই অন্য বিশেষজ্ঞের খবর করিতেছেন।

২৪শে নভেম্বর, ১৯৫৪

আজ সংযম সপ্তাহ মহাব্রত বেশ সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত হইল। শ্রীশ্রীমার

উপস্থিতিতে প্রতিটি জিনিশ একেবারে নিখুঁতভাবে পূর্ণ হইয়াছে। সপ্তাহ যে এইরূপ সাফল্যমণ্ডিত হইবে তাহা অনেকেই পূর্ব্বে আশা করিতে পারেন নাই। কর্ম্মীর অভাব—অর্থেরও প্রাচুর্য্য নাই। তবে সোপোরীভাইর অবিচলিত বিশ্বাস এবং নন্দুভাই ও কান্তাবেনের অক্লান্ত পরিশ্রম উৎসবটিকে বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সর্ব্বোপরি মা-ই স্বয়ং চালাইয়া লইয়াছেন তাহাত লেখাই বাহুল্য। ইহা আমরা সর্ব্বদাই দেখিয়া আসিতেছি যে মার নাম লইয়া কাজে নামিয়া পড়িলে মা নিজেই সব কাজ উদ্ধার করিয়া লন।

সন্ন্যাস আশ্রমে ভাগবৎ সপ্তাহ।

বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই কথা হইতেছে যে সংযম সপ্তাহের পরেই এখানে একটি ভাগবৎ সপ্তাহ করিলে কেমন হয়। এই জন্য পূর্ব্ব হইতেই বৃন্দাবনের পণ্ডিত শ্রীনাথ শাস্ত্রীকে আমাদের সঙ্গে লইয়া আসা হইয়াছে। এদিকে কান্তাবেনের পরিচিত কোনও ভক্ত আসিয়া সপ্তাহের জন্য আমাকে ৫০০৲ দিয়া গিয়াছেন। ভাগবৎ সপ্তাহের অনুষ্ঠান সন্ন্যাস আশ্রমে হইবার কথা হইতেছিল। অবশ্য মার সঙ্গে প্রায় দেড় শতের উপর স্ত্রীপুরুষ। সন্ন্যাস আশ্রমে সকলের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হওয়া খুবই মুস্কিল—বিশেষতঃ মেয়েরাই সংখ্যায় বেশী। কিন্তু সন্ন্যাস আশ্রমের কোঠারী ও মহামণ্ডলেশ্বর মহারাজ নিজেরা আসিয়া মার সঙ্গে এই বিষয়ে আলাপ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বিশেষ ইচ্ছা যে ওখানেই ভাগবৎ সপ্তাহ হয়। উহাও যদি সন্ন্যাস আশ্রমে না হয় তবে তাঁহারা সকলেই বিশেষ দুঃখিত হইবেন। তাই মা স্বয়ং ব্যবস্থা করিয়া দিলেন যে সপ্তাহ সন্ন্যাস আশ্রমেই হইবে কিন্তু সকলেই এখানে থাকুক। তাহা হইলে

আর কোনদিক দিয়া অসুবিধা হইবে না। বৃন্দাবনের শ্রীনাথ শাস্ত্রীই সন্ন্যাস আশ্রমে থাকিয়া সপ্তাহ করিবেন ঠিক হইয়াছে।

২৮শে নভেম্বর, ১৯৫৪

গত ২৬শে হইতে সন্ন্যাস আশ্রমে সংযম সপ্তাহ আরম্ভ হইয়াছে। মা সাধারণতঃ বিকালের দিকে ঘণ্টা দুই পাঠে গিয়া বসেন। পাঠ সমাপ্ত হইবার পর সাধু মহাত্মাদের বক্তৃতা হয়। তবে শ্রীশ্রীহরিবাবার কীর্ত্তনাদি যথারীতি আমাদের এখানেই হইতেছে। সপ্তাহ এখানে না হওয়ায় জনসমাগম কিছু কম হইয়াছে সন্দেহ নাই। তবু সন্ধ্যার পর বেশ লোক আসে।

সংযম সপ্তাহের মধ্যে মা বাহিরে কোথাও যান নাই। স্থানীয় বহু ভক্তেরাই মাকে তাঁহাদের বাসায় একবার পদার্পণ করার জন্য বিশেষ প্রার্থনা জানাইয়াছে। ভাগবৎ সপ্তাহের পরই মার অন্যত্র চলিয়া যাওয়ার কথা। তাই সন্ধ্যাবেলা প্রত্যহই মাকে কোনও না কোনও স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। ডাঃ হেমন্ত পাঠক, সরিতা বেন, গোবিন্দ আশ্রম, লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, শ্রীযুক্ত বি. কে. শাহর বাড়ী প্রভৃতি এক একদিন এক একস্থানে মা গেলেন।

৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৫৪

গতকাল ভাগবৎ সপ্তাহ বেশ সুন্দর মত সম্পন্ন হইয়াছে। মা

সকালেও সন্ন্যাস আশ্রমে গিয়াছিলেন। গতকাল আমাদের এখানকার সকলেরই প্রায় সেখানে প্রসাদ গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

আজ রাত্রিতে মা চান্দোদ অভিমুখে রওনা হইলেন। মার সঙ্গে প্রায় ২০।২২ জন যাইতেছে। শ্রীঅবধূতজী এবং যোগীভাই প্রভৃতি মার সঙ্গেই গেলেন। আমি মার নির্দ্দেশে এখানে রহিয়া গেলাম। গতকাল রাত্রে শ্রীযুক্ত বি. কে. শাহ এবং ডাঃ কৃষ্ণমূর্ত্তি আসিয়া মার নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন যে আমার রোগ নির্ণয় সম্বন্ধে ভাল মত পরীক্ষা হওয়া দরকার। পরীক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত বম্বে হইতে চলিয়া যাওয়া তাঁহাদের মত না। এদিকে আমার আজই ভোরে মার আদেশে কাশী চলিয়া যাওয়ার কথা ছিল। রিজার্ভেশনও হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু মার সঙ্গে কথা বলিয়া আমার যাওয়া তাঁহারা বন্ধ করিলেন। এখানে থাকিয়া ডাক্তার দেখাইয়া যাওয়াই স্থির হইল।

চান্দোদ অভিমুখে মা।

মা চলিয়া গেলে এই স্থানটি ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। তাই শ্রীযুক্ত শাহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ব্যবস্থা করিলেন যে তাঁহার সহরের ফ্ল্যাটে আমি গিয়া থাকিলে সব দিক দিয়া সুবিধা হইবে। সকালে গিয়া ব্রহ্মচারী কমল ও রেণু বাড়ীটি দেখিয়া আসিল। শুনিলাম খুবই সুন্দর ব্যবস্থা। মা ষ্টেশনে যাওয়ার পথে আমাকে Breach Candy House-এ নামাইয়া দিয়া গেলেন। আমার সঙ্গে কমল, রেণু, বিশুদ্ধা, মনাদি এবং একজন চাকর থাকিল।

৬ই ডিসেম্বর, ১৯৫৪

আজ পানু ও বুনির চিঠিতে মার সংবাদ পাইলাম। মা গতকাল

ভোরে মিয়াগাঁও ষ্টেশনে গাড়ী বদল করিয়া চান্দোদ পৌছিয়াছেন। সেখান হইতে নৌকা করিয়া ভীমপুরা আশ্রমে পৌছিতে সকাল প্রায় এগারটা বাজিয়া গিয়াছিল। রাজপিপলা হইতে বহু ভক্তেরা পূর্ব্ব হইতেই আসিয়া আশ্রমে একত্রিত হইয়াছেন। বম্বের হৈ-চৈর পর মার হয়ত একটু সেখানে বিশ্রাম হইতে পারে। আশ্রমটি খুবই খোলা-মেলা।

১২ই ডিসেম্বর, ১৯৫৪

সংবাদ পাওয়া গেল ভীমপুরা আশ্রমে ৫দিন থাকিয়া মা গত ১০ই আমেদাবাদ রওনা হইয়া গিয়াছেন। ভীমপুরায় মা নাকি বেশ ভালই ছিলেন। টিকম্‌জীর মোহন্ত বেশ সৎপুরুষ। বৃদ্ধ অবস্থা তবু মার নিকট নাকি দিনে ২।৩ বার করিয়াও আসিতেন। মাকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি করেন। গত একাদশীর দিন তিনি বহু প্রকারের ফলাহার লইয়া আসিয়া নিজের হাতে নাকি মাকে খাওয়াইয়াছেন। ইতিমধ্যে একদিন ভীমপুরায় গঙ্গনাথ আশ্রমে সকলের ভোগের ব্যবস্থা হইয়াছিল। আশ্রমের মোহন্ত স্বামী কৈলাশানন্দজী শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের গুরুভ্রাতা। গঙ্গনাথই তাঁহাদের গুরুস্থান। শ্রীশ্রী-বালানন্দ মহারাজ নর্ম্মদার পাড়ে ইহারই আশে-পাশে দীর্ঘকাল কঠোর সাধন ভজন করিয়া গিয়াছেন। ইহা বিশেষ তপস্থার স্থান। জানিলাম গঙ্গনাথের সাধু মহাত্মাদেরও সকলকে একদিন আশ্রমে খাওয়ান হয়।

ভীমপুরা আশ্রম হইতে ১০ই সকাল ৭টায় মা রওনা হইয়া চান্দোদে টিকম্‌জীর মন্দিরে যান। মাকে এবং অন্যান্য সকলকে দুধ ফল দিয়া মোহন্তজী সৎকার করিলেন। সঙ্গীয় সাধু মহাত্মাদের বস্ত্রও দিলেন। মা ইতিপূর্ব্বেও অনেকবার টিকম্‌জীর মন্দিরে থাকিয়া আসিয়াছেন। চান্দোদ হইতে সকাল দশটার পর রওনা হইয়া এগারটা নাগাদ মা ডাভই পৌঁছেন। সেখানে পুরাতন ভক্ত দাসভাইর বিশেষ আগ্রহে মার ভোগের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সামান্য সময় মা থাকিবেন। তবুও তাঁহারা প্যাণ্ডেল ইত্যাদি সব সাজাইয়াছেন। সকলের খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে মা বেলা দুইটা নাগাদ বরোদা রওনা হন। বরোদা হইতে বিকাল চারটার সময় মা সৌরাষ্ট্র এক্সপ্রেসে আমেদাবাদ রওনা হন। বরোদা ষ্টেশনেও বহু লোক ছিল। সন্ধ্যার পর মা আমেদাবাদ পৌঁছেন। ষ্টেশনে কান্তিভাই মুন্‌শী প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। কান্তিভাই মার একজন অনন্য ভক্ত। মার সুখ সুবিধার দিকে তাঁহার যেরূপ প্রখর দৃষ্টি তাহা সত্যই দেখা যায় না। মার থাকার জন্য এবারও বিশেষ সুন্দর করিয়া asbestos দিয়া একটি ঘর বানাইয়াছেন। সঙ্গে বাথরুম পায়খানা খাওয়ার ঘর সমস্ত ব্যবস্থা নিখুঁতভাবে করা হইয়াছে। মার বিশ্রামের যাহাতে কোনও রকম ব্যাঘাত না হয় সেদিকে সকলেরই বিশেষ দৃষ্টি আছে।

১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৫৪

সংবাদ পাইলাম গতকাল হইতে কান্তিভাইর বাসায় শ্রীমদ্ভাগবত

সপ্তাহ আরম্ভ হইয়াছে। সুরত হইতে একজন গুজরাটী প্রফেসরকে পাঠ করিবার জন্য আনান হইয়াছে। তিনি নাকি খুবই সুন্দর পাঠ করেন। পাঠ ১৯শে সমাপ্ত হইবে। তাহার পরই মার কাশীর দিকে যাইবার কথা।

আমেদাবাদে ভাগবৎ সপ্তাহ।

১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৫৪

পানুর চিঠিতে মার বিস্তারিত খবর পাওয়া গেল। সপ্তাহ ওখানে মার উপস্থিতিতে ভাল মতই চলিতেছে। ইতিমধ্যে মাকে একদিন আমেদাবাদের সন্ন্যাস আশ্রমে নিয়া গিয়াছিলেন। সেখানকার মণ্ডলেশ্বর একজন বাঙ্গালী সন্ন্যাসী। মাকে তিনি বিশেষরূপে আদর অভ্যর্থনা করেন।

কান্তিভাইর ছোট মেয়ে উর্মিলার নূতন বিবাহ হইয়াছে। তাহার শ্বশুরও একদিন মাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া তাঁহাদের বাসায় লইয়া গিয়াছিলেন। সেখানে নানা প্রকার ফল মিষ্টি দিয়া মার ভোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

ইতিমধ্যে একদিন মাকে যোগাশ্রমেও নিয়া যাওয়া হইয়াছিল। একজন গুজরাটী মহাত্মা সেখানকার আশ্রম পরিচালনা করিতেছেন। তিনি প্রায় ১৮ বৎসর ধরিয়া সেখানে যোগ সাধনা করিতেছেন। একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে যোগাশ্রম যে বাড়ীতে অবস্থিত সেই বাড়ীটি যে গৃহস্থের বাড়ী এবং এখনও উপরের তলায় গৃহস্থ কেহ থাকেন তাহা পূর্ব্বে কাহারো জানা ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে

বাড়ীর গেটে পা দেওয়া মাত্রই মার কেন জানি ঐ বিষয়ে খেয়াল আসিল এবং মুকুন্দ ভাইকে জিজ্ঞাসা করেন। মুকুন্দ ভাইরও প্রকৃত ব্যাপার জানা ছিল না। তাই তিনি না বলিয়া দিলেন। পরে প্রকৃত ব্যাপার যখন তিনি জানিতে পারিলেন তখন তিনি দুঃখে ও অনুতাপে একেবারে বালকের মত কাঁদিতে থাকেন। মা যে কখনও গৃহস্থের বাড়ীতে যান না তাহা তিনি ভাল করিয়াই জানেন। মা-ই তখন মুকুন্দ ভাইকে শান্ত করিয়া বলেন—"যাহা হওয়ার তাহাই হইয়াছে। ভাইজীর মুখে একদিন বাহির হইয়াছিল যে যেখানে সাধন ভজন এবং কীর্ত্তনাদি হয় তাহা গৃহস্থের বাড়ী হইলেও সেখানেও কি মা যাইতে পারেন না? সুতরাং এইরূপে তাহার সেই কথা আজ পূর্ণ হইয়াছে।"

যোগাশ্রম হইতে মাকে পুরুষোত্তম শেঠের বাড়ী লইয়া গিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বেও মা একবার সেখানে গিয়াছিলেন। পুরুষোত্তম শেঠের স্ত্রীর হাত হইতে আরতি করিবার সময় ভোগের থালা মাটিতে পড়িয়া যায়। ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় তিনি বিচলিত হন। মা হাসি-আনন্দে তাঁহাদের দুঃখ মুছাইয়া দিয়া আসিয়াছেন।

সেইদিনই মাকে "আনন্দ বালমন্দিরে"ও লইয়া যাওয়া হয়। একজন গুজরাটী ভদ্রলোক স্ত্রী ও বোনের সঙ্গে মিলিয়া ছোট শিশুদের এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূর্ব্বে মার নিকট এই ভদ্রলোকের একখানা চিঠি আসিয়াছিল যে স্বপ্নে তিনি ঐ জাতীয় একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের আদেশ পান। মার অনুমতি চাহিয়া তিনি চিঠি দিয়াছিলেন। সৎকাজ বলিয়া মাও সানন্দে অনুমোদন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের তিনজনের মনেই উঠিয়াছিল

যে মার নামের সঙ্গে যুক্ত রাখিয়া প্রতিষ্ঠানের নাম রাখা হয়। তাই প্রতিষ্ঠানের নাম হইয়াছে—"আনন্দ বাল-মন্দির।" শুনিলাম ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা মাকে স্তব পাঠ করিয়া অভ্যর্থনা করে। মাও তাহাদের লইয়া আনন্দে গান করেন এবং নিজ হাতে প্রত্যেককে ফল মিষ্টি দেন। ঐ শিশু প্রতিষ্ঠানটি দেখিয়া সকলেই নাকি বিশেষ আনন্দিত হইয়াছে।

ইতিমধ্যে আর একদিন মাকে চিনুভাই মেহতার বাড়ী লইয়া যাওয়া হয়। মার আরতি ও ভোগের ব্যবস্থা খুবই সুন্দর মত করা হইয়াছিল। মা এবং সঙ্গীয় সাধুব্রহ্মচারী সকলকে কাপড় দেন।

পরদিন সকালে মাকে প্রথমে মহেশ্বরী মিলে লইয়া যাওয়া হয়। অল্প কিছুদিন হয় এই মিলটির পরিচালনার ভার কান্তিভাই নিয়াছেন। শুনিলাম মিলের মধ্যে মহেশ্বরীর অষ্টাদশভূজা সিংহবাহিনী অতি সুন্দর একটি মূর্ত্তি আছে। মিলের ভিতরে মাকে অভ্যর্থনা জানাইয়া মাকে সব ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া কান্তিভাই দেখাইয়াছেন।

মহেশ্বরী মিল হইতে আমেদাবাদের লাল মিলের কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ প্রার্থনায় মাকে তাঁহাদের বাসায় লইয়া যাওয়া হয়। সেখানেও মা এবং সঙ্গীয় সকলের বিশেষ সৎকার করা হইয়াছিল।

২২শে ডিসেম্বর, ১৯৫৪

আমেদাবাদের পত্রে জানিলাম যে গত ১৯শে কান্তিভাইর ভাগবৎ-সপ্তাহ বেশ আড়ম্বরের সহিত সমাপ্ত হইয়াছে। কাশীতে ২৬শে হইতে

শ্রীগোপাল ঠাকুর মহাশয়ের গীতাজয়ন্তী সুরু হইবার কথা। আমেদাবাদে মার যাহাতে আরও কিছুদিন থাকা হয় কান্তিভাই প্রভৃতি তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। আমেদাবাদেই গীতা জয়ন্তী করার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু নানা কারণ বশতঃ তাহা সম্ভব হইল না।

২০শে বিকালে মা কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া মুকুন্দভাইর* বাসায় যান। তাঁহার বাসায় মার জন্য পৃথক থাকার ব্যবস্থা আছে। এক রাত্রি মাত্র মার থাকা হইবে। কিন্তু তিনি বিরাট ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সকলের আন্তরিকতা এবং সেবা ভাব সত্যই অপূর্ব্ব। সন্ধ্যার পর মার সম্মুখে মেয়েরা গরবা নাচ দেখায়। মাও সকলকে লইয়া বহুক্ষণ কীর্ত্তন করেন। ঐরূপ প্রাণ মাতান কীর্ত্তন মার মুখে অনেক দিন শোনা যায় নাই লিখিয়াছে।

গতকাল সকালেই আমেদাবাদ হইতে দিদিমা, নারায়ণ স্বামী, বুনি প্রভৃতি ১৫।১৬ জনকে দিল্লী হইয়া কাশী পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সামান্য ৬।৭ জনকে লইয়া মার গতকাল রাত্রে ভোপাল রওনা হওয়ার কথা ছিল।

---

* শ্রীশ্রীমায়ের অতি পুরাতন ভক্ত শ্রীমুকুন্দ মাধব ঠাকোর—Ahmedabad Law College এর অবসরপ্রাপ্ত Principal—ইনি একজন স্বনামধন্য advocateও।

২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৫৪

গত ৪ঠা ডিসেম্বর মা আমাকে বম্বেতে রাখিয়া গিয়াছিলেন। প্রায় ১৮।১৯ দিনে আমার চিকিৎসা সম্বন্ধে নানারূপ গবেষণা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত আমাকে প্ল্যাষ্টারে রাখাই

আমার অসুস্থতা। ডাক্তাররা বিধান দিয়াছেন। প্রকৃত রোগ সম্বন্ধে যাহাতে কাহারো সন্দেহের অবকাশ না থাকে সেই জন্য শ্রীযুক্ত বি, কে, শাহ আমাকে বিশেষ আগ্রহ করিয়া বম্বেতে রাখিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় সজ্জন ও অমায়িক ভদ্রলোক সত্যই সচরাচর দেখা যায় না। অথচ আমাদের সঙ্গে পরিচয় মাত্র কয়েকদিনের। তাঁহারা সকলে আমাকে এতটা আপন করিয়া লইয়াছেন যে ভাবিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাঁহার সহরের বাসা অত্যাধুনিক বিলাতি ঢংএ সাজান গুছান। সম্পূর্ণ বাড়াটিই প্রায় আমাদের থাকার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন। আমাদের যাহাতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা না হয় সে জন্য তিনি ও তাঁহার স্ত্রী সর্ব্বদাই তৎপর থাকেন। চিকিৎসার সমস্ত ব্যবস্থা বম্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সার্জ্জন ও ডাক্তারদের দেখাইবার বন্দোবস্তও তিনিই করিতেছেন। শ্রীযুক্ত শাহ বম্বের একজন বিশিষ্ট প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। আমার জন্য যাহা করিতেছেন তাহার সত্যই তুলনা হয় না। ভাবিতেও চক্ষে জল আসে যে মার কি অসীম কৃপাতেই না এইরূপ সব ভাইবোন পাইয়াছি। আমার অবস্থা সম্বন্ধে সমস্ত কথা মাকে জানাইবার জন্য তিনি নিজে ইতিমধ্যে একদিন কমল ও ডাঃ কৃষ্ণমূর্ত্তি্কে লইয়া আমেদাবাদ ঘুরিয়া আসিয়াছেন। মাও কাশী যাইতেছেন আমারও কাশী যাওয়ার কথা তাই তিনি মার নিকট

প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন যে মা যাহাতে আমার নিকট কাশীতে বেশী সময় থাকেন। মা নাকি হাসিয়া বলিয়াছেন—"পিতাজী, এই শরীরের কোনও ঠিক নাই। কোথাও বসিয়া গেলে একেবারে বসিয়াই গেল। তুমি কি চাও এই শরীর কাশীতেই থাকে—বম্বে না আসে?"

গত ২১শে আমাকে প্ল্যাষ্টার পড়ান হইয়াছে। শুইয়া থাকার জন্য একটি বিশেষ ট্রলিরও ব্যবস্থা হইয়াছে। শুনিতেছি এই ভাবেই ট্রলির উপরে করিয়া আমাকে আসা যাওয়া করিতে দেওয়া হইবে। ইহা সব মারই কৃপায় সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু দুঃখ হয় এইজন্য যে আমি এইরূপ প্ল্যাষ্টারে দীর্ঘদিন শুইয়া থাকিব এবং মার সেবা হইতে বঞ্চিত হইব তাহা কখনও স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই।

মা আমেদাবাদ হইতে চিঠি লেখাইয়াছিলেন—"দিদির ত শুয়ে শুয়ে অনেকদিন হয়ে গেল। হৈ-হৈ টং-টং এ গলা অনেকদিন শোনা যাচ্ছে না। এখন একটু ভাল হবার চেষ্টা কর।" অবাক হইয়া ভাবি আমি কি নিজের ইচ্ছায় শুইয়া আছি। মার সামান্য একটু খেয়াল হইলেই ত যে কোনও সময়ে উঠিয়া বসিতে পারি। বুনির চিঠিতে জানিয়াছি মা নাকি একদিন শুইয়া শুইয়া রাত্রে বলিতেছিলেন—"দিদি যদি হঠাৎ ভাল হয়ে হাঁটতে পারে তবে কেমন হয়?" যাঁহার ইচ্ছায় সমস্ত কিছু সম্ভব—যাঁহার ভূত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যত সমস্ত কিছু জানা আছে তাঁহার মুখে এই জাতীয় কথা শুনিয়া সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার লীলা কে বুঝিবে?

বম্বেতে এই ১৮।১৯ দিন সকলের নিকট হইতে যে সাহায্য, সহানুভূতি, ভালবাসা ও সেবা পাইয়াছি তাহা কখনও ভুলিবার নয়।

বৃদ্ধ মহাত্মা শ্রীহরিবাবাজী কতদূর হইতে আসিয়া ৩।৪ দিন আমাকে দেখিয়া গিয়াছেন। দীর্ঘসময় যাবৎ আমার হাতখানি ধরিয়া বসিয়া থাকিতেন। তাঁহার অহৈতুকী কৃপার তুলনা হয় না। টিহরীর মহারাজা-মহারাণীও ২।৩ দিন আমাকে দেখিয়া গিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত শাহ আমার জন্য পূর্ব্ব হইতেই রিজার্ভেশন করিয়া রাখিয়াছিলেন। ট্রলি সহ যাইতে আমার যদি অসুবিধা হয় সেইজন্য পুরা ৬-বার্থের কম্পার্টমেণ্টই রিজার্ভ করাইয়াছেন। কতদিকে তাঁহার খেয়াল!

গতকাল সকালে বম্বে হইতে রওনা হইয়া সন্ধ্যায় ইটারসি স্টেশনে আসিয়া মার সঙ্গে মিলিত হইলাম। আমার সঙ্গে কমল, রেণু, বিশুদ্ধা ও মনাদি। মা কত আদর সহকারে ভোপাল হইতে আমার জন্য ফুলের মালা ইত্যাদি আনিয়াছিলেন।

মার সংবাদ সব জানা গেল। মা গত ২১শে রাত্রে আমেদাবাদ হইতে ভোপাল রওনা হন। বরোদা পর্য্যন্ত মার সঙ্গে কান্তিভাই, মুকুন্দভাই, চিনুভাই প্রভৃতি অনেকেই আসিয়াছিলেন। বরোদা স্টেশনে Waiting roomএ মা প্রায় দুই ঘণ্টা সকলের সঙ্গে খুব হাসি গল্প করিয়াছেন। সেই দিন কথা বলিতে বলিতে মার নাকি কেবলই হাসির ফোয়ারা ছুটিতেছিল। শুনিলাম তাহার পূর্ব্ব দিন রাত্রে কোনও একটি ব্যাপার লইয়া মার শুইতে শুইতে প্রায় সকাল হইয়া যায়। সেই প্রসঙ্গ মনে হওয়াতে মার কেবলই হাসি আসিতেছিল। Waiting roomএ বসিয়াও মা নাকি হাসিতে হাসিতে বলিতেছিলেন—"এই শরীরটা কত পদ খায়! চচ্চরী, টক, মিষ্টি, ঝাল—নিজেই রান্না করা আবার নিজেই খাওয়া! দেশী-বিলাতী পদও আছে। কখনও আবার একটু

এমন গুরুপাকও হয়ে পড়ে যে জল দিয়ে মুখ না ধুলে আর পরিষ্কার হয় না!!" এইরূপ রহস্যপূর্ণ ভাষায় মা অনেক কথা বলিতেছিলেন। প্রকৃত ব্যাপার কি তাহা বোধ হয় কেহই বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু তবু মার হাসির সঙ্গে যোগ দিয়া সকলেই বিশেষ আনন্দ পাইয়াছেন। এইভাবে সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া রাত্রি প্রায় দুইটার সময় মা ফ্রন্টিয়ার মেলে রওনা হইয়া সকালে রাতলাম স্টেশনে পৌঁছেন। সেখান হইতে সকাল প্রায় ৬টায় রওনা হইয়া প্রায় বেলা ৪টা নাগাদ মা ভোপাল পৌঁছেন।

ভোপালে একদিন

ভোপাল রাজ্যের Inspector General of Police শ্রীশ্যামসুন্দর নাথ আগা সাহেব* প্রায় দুই বৎসর যাবৎ মার নিকট বিশেষ প্রার্থনা জানাইতেছিলেন। এত দিনে মার যাওয়ার সংযোগ ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহাও মাত্র একদিনের জন্য। শুনিলাম ভোপাল রাজ্য বেশ সুন্দর সাজান গুছান। সহরের মধ্যে দীর্ঘ ৭ মাইল ব্যাপী ঝিলের দৃশ্য সত্যই অপূর্ব্ব। আগাসাহেবের বাড়ীর প্রাঙ্গনে তাঁবুতে মার থাকার ব্যবস্থা হইয়াছিল। বাড়ীটিও নাকি খুবই সুন্দর। শুনিলাম পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জাফরুল্লা খাঁ সাহেব এই বাড়ীতেই ছিলেন। মার সঙ্গীয় সকলে আগা সাহেবের বাড়ীতেই ছিলেন। সহরের সমস্ত বড় বড় লোকদের তিনি নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। রাজ্যের সকল প্রধান

---

* শ্রীযুক্ত আগা সাহেব ও তাঁহার স্ত্রী মায়ের অতি পুরাতন ভক্ত। তিনি বর্ত্তমানে Inspector General R. P. F. এবং Director of Security, Indian Railways.

প্রধান রাজপদাধিকারীদের মায়ের দর্শনের জন্য এইরূপ একত্র সমাবেশ সাধারণতঃ দেখা যায় না। মনে হইতেছিল যে মাকে বোধ হয় State-guest রূপে সকলে অভ্যর্থনা জানাইতেছেন। সর্ব্বত্র পুলিশের ছড়াছড়ি—সরকারী গাড়ী সারি দিয়া দাঁড়াইয়া—অভ্যর্থনার ব্যবস্থা রাজোচিত।

শুনিলাম আজ সকাল প্রায় ৯টায় আগা সাহেব মাকে প্রথমে ভোপালের Dy. S. P শ্রীতেজ বাহাদুরের বাসায় লইয়া যান। তাঁহার নব পরিণীতা স্ত্রী কাশীর বহু পরিচিত শ্রীমতী তকৃরুর কন্যা। মার আরতি করিতে করিতে দুধের সমস্ত গ্লাস হাত হইতে উল্টাইয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় সকলেই আতঙ্কিত হইয়াছিলেন। মা সকলকে শান্ত করিয়া বলিয়াছিলেন—"দুধ পড়া মঙ্গল।"

সেখান হইতে Chief Commissioner শ্রীযুক্ত ভগবান সহায়ের বাসায় মাকে লইয়া যাওয়া হয়। তিনি ও তাঁহার স্ত্রী মার পূর্ব্ব পরিচিত। মার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি, বিশিষ্ট। তিনি আজই তাঁহার কার্য্যভার নবনিযুক্ত Chief Commissioner এর হাতে অর্পণ করিয়া নেপালে ভারতের রাজদূত হইয়া যাত্রা করিতেছেন। নূতন Chief Commissioner শ্রীযুক্ত ভার্গবও আসিয়া মার দর্শন করিলেন এবং তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণের প্রথম দিনই মার দর্শন পাইয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেছিলেন।

Chief Commissioner এর বাসা হইতে মাকে প্রধান মন্ত্রীর বাসায় লইয়া যাওয়া হয়। তিনি স্বয়ং, তাঁহার স্ত্রী ও বৃদ্ধ পিতা মার অভ্যর্থনা বিশেষ আদরের সঙ্গে করেন। শুনিলাম ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে তিনিই সর্ব্ব কনিষ্ঠ প্রধান মন্ত্রী এবং বিশেষ পণ্ডিত

ব্যক্তি। মার ভোগ আরতির ব্যবস্থাও খুবই সুন্দর ভাবে করা হইয়াছিল।

সেখান হইতে মা Chief Secretary শ্রীযুক্ত মহাবীর দাশের বাড়ীতে যান। তাঁহার বৃদ্ধ পিতা বহু বৎসর ধরিয়াই মার দর্শনের জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন। তাঁহার বাসায় রূপার ছাতা ইত্যাদি দিয়া মার অতি সুন্দর ভাবে অভ্যর্থনা করা হয়।

সর্ব্বশেষে মাকে ভোপালের নবাবের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রীর বাসায় লইয়া যাওয়া হয়। বৃদ্ধ ভদ্রলোক পূর্ব্বদিন রাত্রেই মার দর্শনের জন্য আগা সাহেবের বাসায় গিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী চলৎশক্তিহীনা—তাঁহার যাহাতে মার দর্শন হয় সেইজন্যই মাকে তাঁহাদের বাসায় নিয়া যাওয়া হয়। খুবই ভক্তিমতী—সর্ব্বদাই হাতে মালা আছে। মা তাঁহাকে দেখিয়াই বলিয়াছেন—"এইরূপ সব সময় দেখা যায় না। জপ নিয়াই আছেন।"

সেখান হইতে আগা সাহেবের বাসায় ফিরিয়া খাওয়াদাওয়ার পর বেলা প্রায় তিনটা নাগাদ মা ইটার্সি রওনা হন। স্টেশনে বহু উচ্চ-পদস্থ রাজকর্ম্মচারীরা মাকে বিদায় দিবার জন্য উপস্থিত ছিলেন। ইটার্সিতে আসিয়া মা আমাদের গাড়ীতে উঠিলেন তাহা পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে।

শুনিলাম এবার আমেদাবাদে মা আমার জন্যই প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল গান করিয়াছেন এবং তাহা সব রেকর্ড করা হইয়াছে। বিশেষ ধরাধরি না করিলে মা সাধারণত রেকর্ড উঠান পছন্দ করেন না। কিন্তু এবার বলিয়াছেন—"এই শরীর ত এই সব করে না। তবে দিদি আনন্দে থাকবে সেই জন্যই করা হচ্ছে।" মার কি অপার করুণা।

শুইয়া শুইয়া মার কথা ও গান শুনিয়া আমি একটু খুসী হইব তাহাই মার খেয়াল।

কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন।

আজ সকাল প্রায় এগারটার পর মার সঙ্গে কাশী আসিয়া পৌছিলাম। এলাহাবাদ স্টেশনে বহু ভক্ত মার দর্শনের জন্য আসিয়াছিল। বেনারস স্টেশনে ডাঃ গোপাল দাশগুপ্ত মহাশয় নিজে উপস্থিত ছিলেন। আমাকে সযত্নে স্ট্রেচারে করিয়া নামাইয়া ambulanceএ করিয়া আশ্রমে আনা হইল। কন্যাপীঠের নীচে গঙ্গার পাড়ের মার ঘরটিতে আমার থাকার ব্যবস্থা হইল। মা অন্য বাড়ীতে চলিয়া গেলেন।

আমার যাহাতে কোনও রূপ কষ্ট না হয় মা নিজে দাঁড়াইয়া সব ব্যবস্থা করাইতেছেন। বম্বে হইতে আমার জন্য শ্রীযুক্ত শাহ একটি উত্তম ট্রলি বানাইয়া দিয়াছেন। ট্রেনের মধ্যেও তাহার উপরেই ছিলাম। আমার খাওয়া দাওয়া সেবা-যত্নেরও মা নিজেই সব ব্যবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে করিয়া দিতেছেন। আমার মন যাহাতে সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে সেদিকে মার বিশেষ দৃষ্টি। মার নিকট হইতে লেখা প্রতিটি চিঠিতেই মার সান্ত্বনা বাণী থাকে। আমেদাবাদ হইতে একটি চিঠিতে মা লেখাইয়াছিলেন "শোকের বিচার থাকে না। রোগেও মন দুর্ব্বল করিয়া দেয়। বিচার থাকে না ইহা সত্য। দিদি সারাজীবন যেরূপ বেপরোয়া, উপস্থিত অসুস্থ অবস্থাতেও বেপরোয়া ভাবটা চাই না কি? হ্যাঁ, অসহনীয় বেদনা কষ্ট ইহাত ঠিকই। কিছু সময় শুইয়া থাকিতে হইবে তাহাতে কি হইয়াছে?"

আমেদাবাদ হইতে একদিন ফোন করাইয়াও মা আমাকে বলিয়াছিলেন

"তুমি জীবন ভরইত সংসারের কোনও সুবিধা চাওনি। উপস্থিত শরীরটা একটু বেকায়দায় আছে। যথাসাধ্য মনটাকে সরাইয়া রাখিতে চেষ্টা কর। সারা জীবনটা যে বীরত্ব ভাবের দিকটা। উপস্থিত এই সময়েও প্রয়োজন—"কিছু পরোয়া করি না।" মনে করা এইভাবে রাখিয়া তিনি সুবিধা অসুবিধার উপরে নিতেছেন। সবদিকটা হাসিমুখে লইতে হয়। তিনি যেভাবে রাখেন ব্যাস্ আনন্দে থাকা।"

আদর্শ যে ইহা তাহাত জানিই। কিন্তু তবু মন যে মানিতে চায় না। মার যে কোনও সেবায় আসিতেছি না—মার শরীরের কোনও রূপ কষ্ট অসুবিধা দেখিয়াও নীরবে পাথর হইয়া শুইয়া থাকিতে হইবে—অন্য কোনও উপায় নাই ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা মনে বেশী বাজে। আমার মনে যাহাতে এইরূপ চিন্তা না আসে সেইজন্য মা পূর্ব্ব হইতেই আমাকে বলিয়াছেন—"পাথরের মত শুয়ে থাকতে হবে দীর্ঘদিন এই কথাটা না ভেবে হাঁটা চলা পূর্ব্বের মত কর্ম্মব্যবহার করতে হবে এইটি মনে রাখবে না কেন ?"

২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৫৪

আজ দুপুরে এলাহাবাদ হইতে শ্রীযুক্ত গোপাল ঠাকুর মহাশয় সকলকে লইয়া আসিয়া পৌছিলেন। আগামী কাল হইতে গীতা জয়ন্তী সুরু হইবে। অন্যান্যবার অপেক্ষা এইবার গীতা জয়ন্তী উপলক্ষে একটু লোক সমাগম বেশীই মনে হইতেছে। সাধারণতঃ বড় দিনের বন্ধের সময় গীতা জয়ন্তী উৎসব করা হইয়া ওঠে না। এবার সেই সংযোগ

ঘটিয়াছে। ছুটিও আছে—মাও এখানে আছেন—গীতা জয়ন্তী উৎসবও হইতেছে তাই অনেকেই এবার নানা স্থান হইতে আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছেন।

২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৫৪

কাশী আশ্রমে গীতা জয়ন্তী

আজ সকাল হইতে গীতা জয়ন্তী সুরু হইয়াছে। সকালে ৮টা হইতে প্রায় আড়াই ঘণ্টা গীতা পাঠ ও পূজা হইল এবং বিকালে শ্রীযুক্ত গোপাল ঠাকুর মহাশয় ঘণ্টাখানেক গীতার উপর ভাষণ দিলেন। তাঁহার শারীরিক বিশেষ অসুস্থতা লইয়াও তিনি কিরূপে যে উৎসবের কাজ চালাইয়া যাইতেছেন তাহা সত্যই প্রশংসনীয়।

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৫৪

গতকাল খুব সুন্দরভাবে গীতা জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রতি বৎসরের ন্যায় হবন ইত্যাদিও যথারীতি শেষ হইল। আজ দুপুরে শ্রীযুক্ত গোপাল দাদা এলাহাবাদ ফিরিয়া গেলেন।

১লা জানুয়ারী, ১৯৫৫

শ্রীযুক্ত মনমোহন দাদা আজ কলিকাতা হইতে এখানে আসিয়া

পৌঁছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন হয় কলিকাতায় হাসপাতালে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। Thrombosis gangrene হওয়ায় সমস্ত ডান পাটা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। কিন্তু ঘা কিছুতেই শুকাইতেছে না। হাসপাতালে খুব বেশী দিন থাকা মনের দিক দিয়াও ভাল না। ডাক্তারের পরামর্শ মত কাশীতে লইয়া আসা হইল। সঙ্গে আমাদের অনুরোধে কলিকাতা হইতে ডাঃ সুধীন মজুমদারও আসিয়াছেন। মনাদাকে স্টেশন হইতে সোজা আমার ঘরে লইয়া আসা হইল। নূতন আশ্রমের একটি ঘরে তাঁহার থাকার ব্যবস্থা হইয়াছে। মা নিজে উপস্থিত থাকিয়া সেখানে সব সাজাইয়া গুছাইয়া আসিয়াছেন। এমনকি মশারী টানাইবার ব্যবস্থাও নিখুঁতভাবে করাইয়াছেন।

৩রা জানুয়ারী, ১৯৫৫

আজ সকালে মা মোটরে বিন্ধ্যাচল রওনা হইয়া গেলেন। সঙ্গে ভবানী, তাহার স্বামী রণজিৎ, উদাস ও পরমানন্দ স্বামী। স্বামীজী গতকালই রাজগীর হইতে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। আজ ওখানে মির্জ্জাপুরের কলেক্টর মার পুরাতন ভক্ত নরসিং ভোগের জন্য কিছু টাকা দিয়াছে। ব্যবস্থাদি করার জন্য গতকাল রাত্রেই পানুর সঙ্গে হেমিদি প্রভৃতিকে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মা খাওয়াদাওয়ার পরই রওনা হইয়া কাশীতে বেলা সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আসিয়া পৌঁছিলেন। আশ্রমে আসার পথে স্থানীয় সিদ্ধিমাতার আশ্রমেও মা

কিছু সময় বসিয়া আসিলেন। সেখানে আজ কন্যাপীঠের মেয়েদের নিয়া গিয়া কীর্ত্তনাদির একটু ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

৫ই জানুয়ারী, ১৯৫৫

আজ দুপুরে মা Upper India Express-এ পাটনা হইয়া রাজগীর রওনা হইলেন। সেখানে ব্যবস্থাদি করার জন্য গত পরশুই ব্রহ্মচারী কান্তিভাই, শিবানন্দ প্রভৃতিকে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। গতকাল কেশবানন্দ দাস্থুকে লইয়া মার মোটরে চলিয়া গিয়াছে। মার সঙ্গে আজ দিদিমা, মৌনীমা, বিমলা প্রভৃতি প্রায় ১৭।১৮ জন গেলেন। আমি এখানেই রহিলাম।

৭ই জানুয়ারী, ১৯৫৫

পাটনা হইতে উষার পত্রে জানিলাম যে মা গত পরশু রাত্রিটা পাটনায় অধ্যাপক শম্ভুবাবুর বাসায় থাকিয়া কাল সকালে মোটরে রাজগীর রওনা হইয়া গিয়াছেন। মার মোটর পাটনাতে গিয়া মার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

রাজগীরে মা

রাজগীর হইতেও গিনির পত্র আসিয়াছে। মা সেখানে সকাল প্রায় দশটা নাগাদ গিয়া পৌঁছিয়াছেন। খাওয়া দাওয়ার পর মা চুপচাপ বিশ্রাম করিয়াছেন। বিকালে পাঠে একটু সময় বসেন। সন্ধ্যার পর অনেকে আসিয়া মার সঙ্গে দেখা করেন।

১০ই জানুয়ারী, ১৯৫৫

রাজগীর হইতে নারায়ণ স্বামীজীর পত্রে জানিলাম যে মার শরীরটা ভাল যাইতেছে না। দুই দিন ধরিয়া শুধু জল খাইয়াই আছেন। রাত্রে সামান্য দুধ, রুটি ও তরকারী খান। নানা স্থান হইতে অনেকে মার নিকট আসিয়াছেন। আশ্রমে স্থানাভাব। তাই অনেকে ধর্ম্মশালাতে আছেন। মার ১৭ই রাজগীর হইতে পাটনা আসিয়া সেইদিনই সন্ধ্যায় কাশীতে পৌছিবার কথা। মা নাকি ইতিমধ্যে ৩।৪ দিন গিয়া কুণ্ডে স্নান করিয়াছেন। মাকে লইয়া এক সঙ্গে স্নান করার সুযোগে সকলেই খুব আনন্দিত।

১৫ই জানুয়ারী, ১৯৫৫

গত রাত্রে বম্বে হইতে শ্রীযুক্ত বি, কে, শাহ ও তাঁহার স্ত্রী লীলাবেন আসিয়া পৌছিয়াছেন। মার নিকট ২।৩ দিন থাকিয়া কলিকাতা যাওয়ার কথা। আগামী কাল তাঁহাদের বিন্ধ্যাচল আশ্রম দেখিয়া আসার ব্যবস্থা হইয়াছে। সেখানেই খাওয়াদাওয়া করিবেন।

১৭ই জানুয়ারী, ১৯৫৫

কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন

আজ সন্ধ্যাবেলা মা রাজগীর হইতে আসিয়া পৌছিলেন। দেখিলাম মার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু ভাল। শরীরে ব্যথা ইত্যাদি কম। বিশ্রামও যথাসম্ভব হইয়াছে।

১৯শে জানুয়ারী, ১৯৫৫

গত কাল দুপুরে মা পরমানন্দ স্বামীজী, পানু ও পটলকে লইয়া কয়েক ঘণ্টার জন্য বিন্ধ্যাচল ঘুরিয়া আসিলেন। কাশীতে ফিরিয়া আশ্রমের পথে বিজয় কৃষ্ণ মঠে ৺কিরণচাঁদ দরবেশজীর স্ত্রীকে দেখিয়া আসিলেন।

আশ্রমে শত চণ্ডী পাঠ

আজ সকাল হইতে আশ্রমে শত চণ্ডী অনুষ্ঠান সুরু হইল। আমার রোগ মুক্তির জন্য শ্রীশ্রীহরিবাবা এই অনুষ্ঠান করাইতেছেন। বার জন মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঠিক করা হইয়াছে। বার দিনে সমগ্র চণ্ডী ১০৮ বার সম্পুটিত পাঠ সম্পূর্ণ করিবেন। আমাদের আশ্রমে আর এইরূপ অনুষ্ঠান পূর্ব্বে হয় নাই। মা বলিয়াছেন—"এই ফাঁকে হয়ে গেল।" শত চণ্ডীর সঙ্গে সঙ্গে মার নির্দ্দেশ মত গোপালজীর মন্দিরের ভিতরে অন্নপূর্ণার দিকে মুখ করিয়া সম্পূর্ণ চণ্ডীপাঠেরও ব্যবস্থা হইয়াছে।

২৭শে জানুয়ারী, ১৯৫৫

শত চণ্ডীপাঠ উপলক্ষ্যে হরিদ্বার হইতে সোলনের রাজাসাহেব আসিয়াছেন। গত ২৪শে শ্রীশ্রীহরিবাবাও সঙ্গীয় কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া বম্বে হইতে এখানে আসিয়াছেন। তাঁহার অসুস্থ শরীর লইয়াও এই উপলক্ষ্যে এত দূরে আসিয়াছেন ইহা তাঁহার অসীম কৃপা। তিনি যে আমার রোগ মুক্তির জন্য কত ভাবে কত কিছু করিতেছেন তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। বম্বেতেও তিনি প্রায়ই আসিয়া দীর্ঘ সময় আমার

শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন। সকলের সম্মুখে তিনি আমাকে কখনও ভগ্নি কখনও মা কখনও বা ইষ্ট রূপে সম্বোধন করিয়া থাকেন। এ সব তাঁহার লীলা ভিন্ন কিছুই নয়। আমি ত সঙ্কোচে যেন শয্যার সঙ্গে মিশিয়া যাই। কাশীতে পৌঁছিয়াই তিনি আমার জন্য মহামৃত্যুঞ্জয় জপের আয়োজন করিবার কথাও বলিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশ মত বাটুদাকে আমেদাবাদ হইতে আসিবার জন্য তার করিয়া দেওয়া হইল।

আজ বেলা ১২টা নাগাদ মা মোটরে এলাহাবাদ রওনা হইলেন। বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই কথা হইয়াছে এবার এলাহাবাদে মার উপস্থিতিতে সরস্বতী পূজা হইবে। তাই শ্রীযুক্ত হরিবাবাজীকে এখানে রাখিয়াই মা রওনা হইয়া গেলেন। সন্ধ্যার পর পানু এলাহাবাদ হইতে ফোন করিয়া সংবাদ দিল যে মা বেলা প্রায় আড়াইটার সময় ওখানে গিয়া পৌঁছিয়াছেন। থর্ণহিল রোডে প্রসিদ্ধ অ্যাডভোকেট শ্রীগোপালস্বরূপ পাঠকজীর বাড়ীতেই পূজার আয়োজন এবং মার থাকার ব্যবস্থা হইয়াছে।

২৮শে জানুয়ারী, ১৯৫৫

এলাহাবাদে সরস্বতী পূজা।

আজ সন্ধ্যার পরও পানুর টেলিফোনে সংবাদ পাইলাম যে সরস্বতী পূজা আজ বেশ ধূমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পাঠকের বাড়ীর সকলের সৌজন্য ও আতিথেয়তায় সকলেই মুগ্ধ। মা আজ সকালে শ্রীগোপাল ঠাকুর মহাশয়ের আশ্রমেও একটু সময়ের

জন্য গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিবার সময় কাশীপুরের রাণী-সাহেবার বাসাতেও মাকে একটু সময়ের জন্য নিয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যাবেলা মা জ্যোতির্মঠের শঙ্করাচার্য্যের আশ্রমে গিয়াছিলেন। বর্ত্তমান শঙ্করাচার্য্য স্বামী শান্তানন্দজী মার বহু পূর্ব্ব হইতেই পরিচিত। সেখানে মা একটু সময় থাকিয়া আবার শ্রীযুক্ত পাঠকের বাড়ী ফিরিয়া আসেন। সেখানে অনেকক্ষণ ভজন কীর্ত্তন এবং মায়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয়। শুনিলাম ডাঃ পান্নালালজীর বাড়ী খুবই নিকটে। তিনি তাই সর্ব্বদাই আসা যাওয়া করেন। মা ইতিমধ্যে একবার অল্প সময়ের জন্য তাঁহার বাড়ীতেও গিয়া তাঁহার ঠাকুর ঘরে বসিয়া আসিয়াছেন।

২৯শে জানুয়ারী, ১৯৫৫

মা প্রায় বেলা দশটা নাগাদ এলাহাবাদ হইতে আসিয়া পৌঁছিলেন। শুনিলাম আসিবার সময় ঝুঁসিতে প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারীজীর আশ্রমে কিছু সময়ের জন্য হইয়া আসিয়াছেন। তিনি মাকে থাকিবার জন্য বিশেষ করিয়া আগ্রহ প্রকাশ করা সত্ত্বেও মার পক্ষে থাকা সম্ভব হয় নাই, মার সঙ্গীয় সকলে ট্রেণে রওনা হইয়া আসিলেন।

৩০শে জানুয়ারী, ১৯৫৫

আজ শত চণ্ডী অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে সমাপ্ত হইল। সম্পুট পাঠ

গতকালই সম্পূর্ণ হইয়াছে। আজ হোম ও আহুতি হইয়া গেল। হোমের জন্য বিশেষ প্রকারের অশ্বত্থ পাতার আকারের একটি হোমকুণ্ড বানান হইয়াছে। কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই যোগার যন্ত্র চলিতেছিল। স্থানীয় ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ নিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণও বার জন আশ্রমে ভোজন করিলেন।

ইতিমধ্যে শ্রীহরিবাবাজী এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আশ্রমের ব্রহ্মচারী ও মেয়েদের মধ্যে দিনের বেলা মাত্র দুই পদ এবং ভাতরুটি ও রাত্রে শুধু দুধ ও সব্জীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই সংযমও আজ সমাপ্ত হইল।

আজ সকালে হরিবাবাজী মহারাজ আমার বিছানার পাশে আসিয়া বলিতে লাগিলেন যে আমি যদি তিন দিনের মধ্যে রোগমুক্ত না হই তবে তিনি সকলের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া একলা নির্জ্জনে গিয়া কোথাও থাকিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় মহাত্মার মুখে এই জাতীয় কথা শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। মা ও আমি বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলাম তিনি যাহাতে তাঁহার কথা ফিরাইয়া নেন। আমার অসুস্থতার জন্য তিনি ভক্তবৃন্দকে পরিত্যাগ করিয়া একান্তবাসে চলিয়া যাইবেন ইহা কল্পনারও অতীত। শত চণ্ডী অনুষ্ঠান শ্রীহরিবাবাজীর নির্দ্দেশ মতই হইয়াছে। অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হইবার পরেও আমি যদি সুস্থ হইয়া না উঠি তবে জনসাধারণের এই জাতীয় ধার্ম্মিক অনুষ্ঠানে এবং সাধুমহাত্মার উপর ভক্তি বিশ্বাস নষ্ট হইবার আশঙ্কা। ইহাই তাঁহার মত। আবার বলেন যে আমার স্বাস্থ্য কামনায় সকলের অন্নজল ত্যাগ করিয়া সত্যাগ্রহ সুরু করা উচিত। মহাত্মার যে কি অহৈতুকী কৃপা তাহা বর্ণনা করা যায় না।

৩১শে জানুয়ারী, ১৯৫৫

শ্রীহরিবাবাজীর নির্দ্দেশে আজ হইতে আমার কল্যাণের জন্য মহামৃত্যুঞ্জয় জপ এবং মহারুদ্রাভিষেক সুরু হইল। বিশু জপ আরম্ভ করিল। বাটুদা নিজে আরও দশজন মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণের সহিত বেদমন্ত্র দ্বারা শিবের অভিষেক সুরু করিলেন। অনুষ্ঠানটি খুবই সুন্দর এবং গম্ভীর ভাবযুক্ত। আমাদের আশ্রমে পূর্ব্বে কখনও এইরূপ অনুষ্ঠানও হয় নাই। শ্রীহরিবাবাজী অনুষ্ঠানের জন্য স্বেচ্ছায় প্রায় ৮০০৲ দিয়া দিলেন। তাঁহার ন্যায় বিরক্ত সন্ন্যাসীর নিকট হইতে কোনও অর্থ আশ্রমে গ্রহণ করা যে কিরূপ সঙ্কোচের ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু গ্রহণ না করিয়া কোনও উপায় নাই।

আমার রোগমুক্তির জন্য মহামৃত্যুঞ্জয় জপ ও মহারুদ্রাভিষেক।

আজ অন্নপূর্ণা মন্দিরের সম্মুখে উদয়াস্ত নামকীর্ত্তনও হইল। এলাহাবাদ হইতে বিন্দু প্রভৃতি কয়েকজন আসিয়াছে। তাহারা এবং আশ্রমের ছেলে-মেয়েরা সকলে মিলিয়া বেশ সুন্দরভাবে মহা নাম কীর্ত্তন করিল।

২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫

গত কাল রাত্রি প্রায় ১২টায় শ্রীহরিবাবাজী মোগলসরাই হইয়া বৃন্দাবন রওনা হইয়া গেলেন। তিনি এই আট দিনে আমার জন্য কত

কিছু না করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার কি অসীম কৃপা তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়।

শত চণ্ডী পাঠের সময়ের একটি ঘটনা লিখিতে ভুল হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় দিন পাঠ সমাপ্ত হইবে এবং আরতি সুরু হইবে এই সময় মা সূক্ষ্মে কিছু দেখিলেন। প্রথমে আমাদের অতি সংক্ষেপে কিছু বলিয়াছিলেন তাহাতে পরিষ্কার বুঝা যায় নাই। পরে ২।৩ দিনের কথায় এবং শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে অনেকটা জানা গিয়াছে। ব্যাপারটি সংক্ষেপে এই যে ১৭।১৮ বৎসরের একটি যুবতী স্ত্রী (মার ওখানেই প্রকাশ) অতুলনীয় রূপ এবং শরীর এত কোমল যে তুলাও বোধ হয় তাহার কাছে কিছু না। তিনি মাকে ধরিয়া আছেন। মা জানিয়া শুনিয়াই যেন জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে গো।" মা নিজেই আবার হাসিয়া বলিলেন—"জানাই ত। তুমি দেবী।"

শত চণ্ডী পাঠের সময় মার সূক্ষ্ম দর্শন।

কিছুক্ষণ পরে আবার ঐখানেই মার কোলে একটি শিশু মূর্ত্তির প্রকাশ। শুভ্র বর্ণ তাহার। দেবী তখন মার দেহের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছেন। শিশুটির থল্‌থলে ভাব—শরীর নড়ে না কিন্তু চোখ মুখ নাড়াইয়া টং টং করিয়া কথা বলিতেছে। ঐখানেই বাণী হইল— "কত দিনের শিশু!" শিশুটি বলিয়া উঠিল—"পঞ্চাশ দিনের।" মা বলিলেন—"দেখ দেখ, কেমন টং টং করে কথা বলছে।"

পরক্ষণেই আবার ঐ শিশুটি হইতেই অন্য একটি শিশুর প্রকাশ। এইটি একটু বড়—শ্যামল বর্ণ। বেশ হাটিয়া বেড়াইতেছে। একটু পরেই বড় শিশুটি ছোট শিশুর মধ্যে মিশিয়া গেল এবং ছোট শিশুটি

মার মধ্যে মিশিয়া গেল। মার কথার ভাবে বুঝা গেল যে সবই মার শরীর হইতেই প্রকাশ—মায় শরীরেই বিলীন।

শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয়ের পুনঃ পুনঃ প্রশ্নে প্রকাশ পাইল যে প্রথম মূর্ত্তিটি দেবী—দ্বিতীয়টি শিব—তৃতীয়টি কৃষ্ণ। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন—"প্রথমে শিব শক্তি—তাহার পর গোপাল প্রকাশ।" কবিরাজ মহাশয়ের সহিত কথাবার্ত্তা হইবার চারদিন পূর্ব্বে একদিন কথা প্রসঙ্গে মা আমাকে বলিতেছিলেন—"দিদি, সেদিন যে চঞ্চল শিশুটি প্রকাশ পাইল সেটি কে? গোপাল না-ত?" এই বলিয়া মা একটু হাসিলেন। বুঝিলাম তিনিই গোপাল। মা হাসিয়া বলিলেন—"শত চণ্ডী পাঠ হইল—মহারুদ্রাভিষেক হইল—এবার গোপালেরও পূজা করিতে হইবে। গোপালের পূজা কেন হইবে না? এবার গোপালের পূজার ব্যবস্থা কর।"

কবিরাজ মহাশয়ের সহিত কথা বলিতে বলিতেও মা বলিয়াছেন—"দেখ বাবা, কেমন প্রকাশটা। আগে চণ্ডী পাঠ, তাহার পর মহারুদ্রাভিষেক—তাহার পর গোপালের পূজার কথা। প্রকাশটিও সেই-রূপই ঠিক। আগে চণ্ডীর প্রকাশ, পরে শিবের, তাঁহার পর গোপালের। যখন দেখা হয়েছে তখন রুদ্রাভিষেক বা গোপালের পূজার কথাও ছিল না। চণ্ডীপাঠের পরই হরিবাবা নিজ হইতে মহারুদ্রাভিষেকের কথা উঠাইলেন। তাহার পর একদিন কথা বলিতে বলিতে গোপালের পূজার কথাও উঠিয়া গেল। দেখ বাবা কি সুন্দর!"

মা হাসিয়া হাসিয়া এইসব কথা বলিতেছিলেন। কবিরাজ মহাশয় মাকে প্রশ্ন করিলেন—"মা, ৫০ দিনটা কি?" মা একটু চুপ করিয়া বলিলেন—"এখন ঠিক বলার খেয়াল হচ্ছে না।"

শ্রীহরিবাবাজী রওনা হইবার সময় আমার সহিত দেখা করিতে আসিলে আমি বলিলাম—"মহারাজজী, আমি বোধ হয় এবার হোলির সময় বৃন্দাবনে যাইতে পারিব না।" হরিবাবা সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন—"দিদির মনের জোর আজকাল কমিয়া গিয়াছে।" আমি প্রত্যুত্তরে বলিলাম—"বেশত মহারাজজী যদি আমাকে উঠাইয়া দেন। আমি যেন হোলির সময় যাইতে পারি।"

আমার জন্য সকলেরই এত চিন্তা এত ভালবাসা। ডাঃ দাসগুপ্তের রাত্রে নিদ্রা হয় না কিভাবে আমার কষ্টের লাঘব হইবে। সব সময়ই আমার মনে হয় যে তাঁহার করুণাতেই এই সব বিধান। তাঁহার চরণে ব্যবস্থার অভাব নাই। তিনিই রোগ দেন। তিনিই আবার সেবার ব্যবস্থা করেন।

শ্রীশ্রীশঙ্কর ভারতীজী আজকাল ভারতের একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও মহাত্মা ব্যক্তি। তিনি কিছুদিন যাবৎ কাশীতেই আছেন। একদিন শ্রীহরিবাবাজী ও যোগীভাই তাঁহার দর্শনে গিয়াছিলেন। আমার জন্য শ্রীহরিবাবাজীর নির্দ্দেশে যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ হইতেছে সেই সব সম্বন্ধে শঙ্কর ভারতীজীর সহিত কথা হইতেছিল। তিনি বলিয়াছেন যে ক্রিয়াতে কাজ হইবেই। তবে অনেক সময় যাহা তীব্রভাবে আসিবার কথা তাহা হয়ত দীর্ঘদিন ভুগিয়া কাটিয়া যায়। শঙ্কর ভারতীজীর কথা শুনিয়া সকলেরই মনে আশার সঞ্চার হইল।

যোগীভাই আরও একটি গল্প বলিয়াছেন। শুনিলাম সত্য ঘটনা। একবার বৃন্দাবনে একজন বড় ত্যাগী মহাত্মা খুব অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। সঙ্গে কেহই নাই—একেবারে নিঃসঙ্গ। একদিন তিনি দেখিলেন যে একটি ছেলে আসিয়া প্রাণ দিয়া তাঁহার সেবা করিতেছে।

তিনি প্রথমে ভাবিলেন—"এই ছেলেটি কে?" পরে যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে ঐ বালকটি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহার চোখে জল আসিল। "কেহ নাই যার তুমি আছ তার।" সেই মহাত্মা তখন বলিলেন—"ঠাকুর তুমি আমার সেবা করিতেছ। আমি ভাল হই। তুমিও মুক্ত হও।" ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন—"তোমার কেহ নাই তাই আমি আছি।"

এই গল্পে আমাদের প্রায় সকলের চোখেই জল আসিল। তিনিই রোগ দেন। আবার তিনিই ভোগ শেষ করান।

৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫

আশ্রমে মহারুদ্রাভিষেক ও মহামৃত্যুঞ্জয় জপ যথাবিহিত চলিতেছে। আজ পূর্ণিমার দিন গোপালজীর পূজার ব্যবস্থাও বিশেষ সমারোহের সঙ্গে করা হইয়াছে। কোথাও কিছু ত্রুটি নাই।

১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫

আজ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইল। সবৎসা গাভী দান, ব্রাহ্মণ বিদায় সব আমার হাত দিয়া করান হইল। আমাকে স্ট্রেচারে করিয়া ঘর হইতে বাহিরে আনা হইয়াছিল।

১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫

আজ ভোর ৬টায় মা মোটরে বিন্ধ্যাচল রওনা হইলেন সঙ্গে

যোগীভাই, কেশবানন্দ, পান্নু, বিমলা ও উদাস গেল। পথে কবিরাজ মহাশয়কে তাঁহার বাসা হইতে উঠাইয়া নিয়া গেলেন। বহুদিন হইতেই কথা চলিতেছিল যে কবিরাজ মহাশয়কে নিয়া মা বিন্ধ্যাচল গিয়া কয়েকদিন থাকিবেন। বিন্ধ্যাচল আশ্রমের মধ্যে তরু কুটিরের উপরে কবিরাজ মহাশয়ের জন্য যে নূতন ঘর বানান হইয়াছে তাহাতে ইতিপূর্ব্বে তিনি আর থাকেন নাই। এইবারই প্রথম যাইতেছেন। কবিরাজ মহাশয় যাহাতে কখনও কখনও একান্ত বাসের জন্য সেখানে গিয়া থাকিতে পারেন এই জন্যই ঐ ঘরটি মার নির্দ্দেশে বানান হইয়াছে।

বিন্ধ্যাচলে চার দিন।

১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫

গতকাল পান্নুর নিকট হইতে ফোনে সংবাদ পাইয়াছি যে মার খুবই ঠাণ্ডা লাগিয়াছে। শরীর ভাল না। গতকাল রাত্রে মির্জ্জাপুরের সেপ্টন কোম্পানীর মালিক শ্রীযুক্ত মহেশ্বরী আশ্রমে ভাণ্ডারা দিয়াছেন। তাঁহাদের পরিচিত প্রায় ৫০।৬০ জন আশ্রমে প্রসাদ পাইয়াছেন। রান্নাবান্নার সমস্ত ব্যবস্থা তাঁহাদের নিজেদের লোকেরাই আসিয়া করিয়াছে। আশ্রমের পক্ষ হইতে কিছুই করিতে হয় নাই।

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫

আজ সকাল প্রায় এগারটা নাগাদ মা বিন্ধ্যাচল হইতে মোটরে ফিরিয়া আসিলেন। অন্যান্য সকলেও দুপুরে ট্রেণে আসিয়া পৌছিল।

১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫

আজ সকালে দেরাদুন এক্সপ্রেসে যোগীভাই হরিদ্বার রওনা হইয়া গেলেন। দুপুরে বম্বে হইতে শ্রীযুক্ত বি, কে, শাহ আসিয়া পৌছিলেন। তাঁহার সঙ্গে বম্বের ডাক্তার শেঠ এবং দিল্লীর একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ বলরাম আসিয়াছেন। আমার চিকিৎসার জন্য তিনি কতদূর হইতে কত অজস্র টাকা ব্যয় করিয়া এই সব করাইতেছেন। তিনি যাহা করিতেছেন তাহার তুলনা হয় না। মার চরণে আসিয়া তাঁহার মত একজন ভাই পাইয়া নিজকে ধন্য মনে হয়। তাঁহার আদর্শে তাঁহার কোম্পানীরও প্রতিটি লোক যেন আদর্শবান। সেবা করিবার জন্য প্রত্যেকেই একেবারে সর্ব্বদা প্রস্তুত।

১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫

গতকাল রাত্রে দিল্লী মেলে শ্রীযুক্ত শাহ এবং ডাক্তার বলরাম রওনা হইয়া গেলেন। আজ সকালে ডাক্তার শেঠও বম্বে ফিরিয়া গিয়াছেন।

চিকিৎসকেরা আমাকে ভাল মত পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই খুব দ্রুত উন্নতি দেখা গিয়াছে। নূতন চিকিৎসার তাঁহারা ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। তাঁহাদের বিশেষ ইচ্ছা যে গরমের সময় কয়েক মাস ঠাণ্ডা কোনও স্থানে আমি গিয়া থাকি। যোগীভাইও বিশেষ করিয়া আগ্রহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যাহাতে

মা ও আমি এবার সোলনে গিয়া কয়েকমাস থাকি। সোলনে মা প্রায় দুই বৎসরের উপর যান নাই। সোলনের জল-বায়ু আমার পক্ষে অনুকূল হইবে অনেকেরই এই মত। ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির হইল যে গরমের সময় সোলন যাওয়াই ভাল হইবে। শ্রীহরিবাবাজী পুনঃ পুনঃ বৃন্দাবন যাইবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। বৃন্দাবনে এবার নূতন মন্দিরে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের অষ্টধাতু নির্ম্মিত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হইবে। সেইজন্য ডাক্তারদের সঙ্গে কথা হইয়াছে যে আমি এখান হইতে দিল্লী যাইয়া সেখান হইতে বৃন্দাবনে কয়েক দিনের জন্য গিয়া সোজা সোলন চলিয়া যাইব। আমার এই শরীর লইয়া যে এবার বৃন্দাবন যাওয়া সম্ভব হইবে তাহা ভাবিতেই পারি না। শ্রীহরিবাবাজীর ঐকান্তিক ইচ্ছা ও আগ্রহেই বোধ হয় ইহা সম্ভব হইবে।

২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫

কাশী আশ্রমে শিবরাত্রি উৎসব।

গত কাল আশ্রমে খুব ধুমধামের সহিত শিবরাত্রি উৎসব হইয়া গেল বিশেষভাবে সব পূজাঅর্চ্চনার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। চণ্ডী-মণ্ডপের মধ্যে ও সম্মুখে মেয়েদের পূজার স্থান এবং অন্নপূর্ণা মন্দিরের সম্মুখে পুরুষদের বসিবার স্থান করা হইয়াছিল। মা সারা রাত্রি একবার উপরে একবার নীচে গিয়া কখনও ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়াছেন কখনও বা কীর্ত্তনে যোগ দিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন

করিয়াছেন। এলাহাবাদ হইতে ডাঃ পান্নালালজী এবং তাঁহার জামাতাদ্বয় শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সহায়* ও গোবিন্দ নারায়ণজী† প্রভৃতি আরও অনেকে আসিয়াছেন। তাঁহারা জীবনে কখনও এইভাবে শিবরাত্রির ব্রত ও পূজা করেন নাই। এবার মার উপস্থিতিতে তাঁহারাও সানন্দে সমস্ত রাত্রি পূজায় যোগদান করিলেন। নানা স্থান হইতে বহু ভক্ত নরনারী আসিয়া একত্রিত হইয়াছেন। তাঁহারাও প্রায় সকলেই উপবাসী থাকিয়া প্রহরে প্রহরে পূজা করিয়াছেন। এতগুলি লোকের সমবেত পূজা—সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। সমস্ত রাত্রি যেন আনন্দের স্রোত বহিতেছিল।

ভোর প্রায় ৬টায় মা আসিয়া একটু বিশ্রাম করিতে গেলেন।

২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫

আজ সকালে মা মোটরে কুসুম ও পানুকে লইয়া ঝুঁসী রওনা হইয়া গেলেন। সঙ্গে সরযুবালা নামে একজন বিধবা ভদ্রমহিলাও গেলেন। তিনি সাহেবগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী। তাঁহার

---

* শ্রীরামেশ্বর সহায়—উত্তর প্রদেশের অবসরপ্রাপ্ত Chief Conservator of Forests—বর্ত্তমানে Railway Board এর সদস্য।

† শ্রীগোবিন্দ নারায়ণ, I. C. S.—State Trading Corporation-এর Managing Director—পূর্ব্বে ইনি উত্তর প্রদেশের Chief Secretary ছিলেন।

বিশেষ আগ্রহ যে ঐ কাজ ছাড়িয়া দিয়া আশ্রমবাস করেন।

বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা।

মার আজই রাত্রে এলাহাবাদ হইতে বৃন্দাবন রওনা হইবার কথা। গতকাল রাত্রেই এখান হইতে বিভু, কেশবানন্দ প্রভৃতি ৯।১০ জনকে বৃন্দাবন পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আজ রাত্রে দিদিমা প্রভৃতি ৪।৫ জনের মোগলসরাই হইতে সোজা বৃন্দাবন রওনা হইবার কথা। মা এলাহাবাদে সেই গাড়ীতেই উঠিবেন।

মা সকালে রওনা হইবার একটু পরেই পানুর টেলিফোন আসিল যে বেনারস হইতে প্রায় ২৪ মাইল দূরে মার গাড়ী খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। অনেক কষ্টে তাহা ঠিক করা হইলে মা রওনা হইয়াছেন। রাত্রে পুনরায় পানুর ফোনে সংবাদ পাইলাম যে মা ঝুঁসীতে প্রভুদত্ত মহারাজের আশ্রমে প্রায় দশটা নাগাদ গিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। মার পৌঁছিতে অনেক দেরী হইয়া গিয়াছিল। তাই সে সময়ে মাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আশ্রমে বিশেষ কেহই ছিল না। প্রভুদত্তজীও বাহিরে কোথায় চলিয়া গিয়াছিলেন। মার থাকার বন্দোবস্ত যদিও সবই ঠিক করা ছিল। কিছু পরেই প্রভুদত্তজী আসিয়া মার সঙ্গে দেখা করেন। সকালে মা কিছুই খান নাই। বেলা দুইটার পর মা সঙ্গের খাবার সামান্য একটু মুখে দেন। কিছু পরেই প্রভুদত্তজীও মাকে ফলাহারী ভোগের জন্য ডাকিয়া নেন। বিরাটভাবে ভোগের আয়োজন করা হইয়াছিল। বিকালে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ সৎসঙ্গে গিয়া মা বসেন। সন্ধ্যার পর প্রভুদত্তজী একজন ১৪৬ বৎসরের বৃদ্ধ মহাত্মাকে মার দর্শনের জন্য আনাইয়াছিলেন। তিনি নাকি খুবই বিখ্যাত একজন যোগী। সর্ব্বদা একটি উঁচু মাচার উপরই বসিয়া থাকেন। মা তাঁহাকে

বৃন্দাবনে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার সময় যাইবার জন্য বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন।

সন্ধ্যার পর মা মোটরে এলাহাবাদ চলিয়া আসেন। সেখানে অল্প সময়ের জন্য হইলেও খুবই সুন্দর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বহু লোক আসিয়া মার দর্শনের জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত গোপাল ঠাকুর মহাশয়ও অসুস্থ শরীর লইয়া মার কাছে আসিয়া কিছুক্ষণ বসিয়াছেন।

২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫

বৃন্দাবন হইতে চিঠি পাইলাম মা গত পরশু বিকালে গিয়া বৃন্দাবন আশ্রমে পৌছিয়াছেন। মথুরা স্টেশনে স্বামী পরমানন্দজী মার জন্য মোটর লইয়া উপস্থিত ছিলেন। পথে শুনিলাম কানপুর, এটোয়া এবং আগ্রা স্টেশনে বহু লোক মার দর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন।

মা বৃন্দাবন আশ্রমে যাইতেছেন এই উপলক্ষ্যে হরিবাবাজী কত-দিন পূর্ব্ব হইতেই সমস্ত আশ্রম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সাজান গুছানর ব্যবস্থা করিতেছিলেন। আশ্রমের বিশাল প্রাঙ্গন গোবর দিয়া লেপান হইয়াছে। শীঘ্রই মহাপ্রভুর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা। হরিবাবাজীর তাই বিশেষ আগ্রহ যে সমস্ত আশ্রম দিব্যভূমিতে পরিণত হউক। মহাপ্রভুর মন্দির বানান শুনিলাম পুরা দমে চলিতেছে। রায়বাহাদুর নারায়ণ দাসজী বিড়লা মন্দিরের একজন ইঞ্জিনিয়ার রাখিয়া দিয়াছেন। স্বামীজীও অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন।

মার শরীরটা জানিলাম ভাল যাইতেছে না। খুব সর্দ্দি কাসি হইয়াছে। মার সেবার জন্য বিশেষ কেহ নাই। তাই সব সময় একটা বিশেষ চিন্তা হয়।

২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫

বৃন্দাবনের পত্রে জানিলাম যে মার চোখ দিয়া এখনও বেশ জল পড়িতেছে। তাহা লইয়াই দিনে ৪।৫ বার মা হরিবাবার সৎসঙ্গে যাতায়াত করিতেছেন। এবার নাকি ওখানে সৎসঙ্গের ব্যবস্থা একটু বিশেষভাবেই হইয়াছে। মা সকাল সাড়ে আটটায় যান বেলা ১২টা নাগাদ ফিরিয়া আসেন। আবার ৩টায় যান সন্ধ্যা ৬টার পর ফিরেন। পুনরায় ৭টায় গিয়া রাত্রি প্রায় ১০টা নাগাদ ফিরিয়া আসেন। রাত্রিতে বিশ্রাম করিতে করিতে প্রায় ১২টা বাজিয়া যায়।

গতকাল রাত্রে মার নির্দ্দেশ মত বুনি, প্রফুল্ল ও দাসু বৃন্দাবন রওনা হইয়া গিয়াছে।

৩রা মার্চ্চ, ১৯৫৫

আজ সকালে আমি দিল্লী আসিয়া পৌঁছিলাম। আমার সঙ্গে কমল, রেণু, পুষ্প, বিশুদ্ধা, চারু ও উদাস চলিল। তাহা ছাড়া বৃন্দাবনে উৎসব উপলক্ষে সন্ধ্যাদেবী, নিত্যানন্দবাবু এবং ব্রহ্মচারী কান্তিভাই ও আমার সঙ্গে আসিয়াছেন। তাঁহারা দিল্লী স্টেশন হইতেই

সোজা বৃন্দাবন চলিয়া গেলেন। স্টেশনে আমাকে নিবার জন্য New India Assurance Co. হইতে শ্রীযুক্ত আগরওয়াল, ডাঃ বলরাম এবং আরও অনেকে অ্যাম্বুলেন্স সহ উপস্থিত ছিলেন। পান্নুকেও মা বৃন্দাবন হইতে পূর্ব্বেই এখানকার সব ব্যবস্থার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। এখানে আমার একটি নূতন Plaster case বানাইবার কথা। কয়েকদিন থাকিবার কথা তাই আমাকে এবার রায়বাহাদুর নারায়ণ দাসের বাড়ীতে রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আশ্রম বহু দূরে—সেখান হইতে আমার যাতায়াত করা প্রায় অসম্ভব। Ambulanceএ করিয়া বাসায় পৌছিতে পৌছিতে প্রায় সাড়ে আটটা বাজিয়া গেল। New Indiaর লোকজনই অত্যন্ত যত্ন সহকারে জিনিষপত্র সহ সকলকে পৌছাইয়া দিয়া গেল। তাহাদের ৩।৪ খানা মোটর স্টেশনে উপস্থিত ছিল।

সকাল দশটা নাগাদ আবার Ambulance আসিয়া হাজির। ডাঃ বলরাম এখানে Irwin Hospitalএ আমার নূতন Plaster বানাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু হাসপাতালে গিয়া সেখানকার ব্যবস্থা দেখিয়া মনটা খারাপ হইয়া গেল। এই হাসপাতালটি দিল্লীর অন্যতম একটি সরকারী হাসপাতাল। কিন্তু তাহার এই দুরবস্থা! Plaster করার জন্য স্ত্রীলোকের কোনও পৃথক ব্যবস্থাই নাই। তাহা ছাড়া যে সকল নার্স আছে তাহাদের ব্যবহারও বিশেষ প্রীতিকর নয়। ডাঃ বলরামও এই সব দেখিয়া বেশ লজ্জিতই হইলেন যে ইহা অপেক্ষা কোনও ভাল ব্যবস্থা আর করা সম্ভব হয় নাই। যাহা হউক প্ল্যাষ্টার হইয়া গেল। কথা হইয়াছে শুকাইয়া গেলে ডাঃ বলরাম উহা নিয়া নিজে বৃন্দাবনে যাইবেন।

৪ঠা মার্চ্চ, ১৯৫৫

আজ আমার আসিবার সংবাদ পাইয়া টিহরীর রাজমাতা, তাঁহার মেয়ে শীলা এবং জামাতা লম্বাগ্রামের রাজা ধ্রুবদেব চাঁদ দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। টিহরীর মহারাজা এবং মহারাণী গতকাল সন্ধ্যাবেলাও আসিয়াছিলেন—আজও আসিয়াছেন। New Indiaর শ্রীযুক্ত আগরওয়ালজী এবং নারায়ণ দাসজীরা সকলে সর্ব্বদা বিশেষভাবে খোঁজ খবর করিতেছেন।

৫ই মার্চ্চ, ১৯৫৫

আজ সকাল সাড়ে দশটায় তুফান এক্সপ্রেসে আমি মথুরা অভিমুখে রওনা হইলাম। পূর্ব্ব হইতেই শ্রীযুক্ত বি, কে, শাহর নির্দ্দেশ মত আমার জন্য একটি full compartment reserved করা ছিল। মা-ই তাঁহার মত একজন বিচক্ষণ ভাই জুটাইয়া দিয়াছেন। নতুবা এই সময়ে কাশী হইতে আসা এবং এইভাবে সমস্ত ব্যবস্থা হওয়া কল্পনারও অতীত ছিল।

বেলা প্রায় ১॥০ টায় মথুরা স্টেশনে গাড়ী পৌছিলে দেখিলাম ব্রহ্মচারী সাধন এবং New Indiaর লোকজন এখানেও ambulance সহ উপস্থিত। আশ্রমে পৌছিয়া দেখা গেল সর্ব্বত্রই মহাপ্রভুর আগমনের আয়োজন। মন্দিরের ঠিক সম্মুখে বিরাট প্যাণ্ডেল টাঙ্গান হইয়াছে। তাহাতে আজ হইতে হরিবাবাজীর সৎসঙ্গ আরম্ভ হইয়াছে। আমি পৌছিবার কিছু সময় পরেই কলিকাতা হইতে গৌর-নিতাইর

মূর্ত্তি আসিয়া পৌঁছিল। শিল্পী নিতাই পালও সপরিবারে সঙ্গে আসিয়াছেন। মন্দিরের কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। বিশেষ তাড়াহুড়া করিয়া কাজ চলিতেছে। নানা স্থান হইতে এখনই বহু ভক্তের সমাগম হইয়াছে।

৬ই মার্চ্চ, ১৯৫৫

আজ সকালে নিতাইবাবুর তত্ত্বাবধানে মূর্ত্তি খোলা হইল। সকলেই দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। মূর্ত্তি দুইটি সত্যই অপূর্ব্ব সুন্দর। মাথার চুল এবং মুখের ভাব কিছুটা মার সহিত সাদৃশ্য রাখিয়া করা হইয়াছে তাহা ভাল করিয়া দেখিলেই ধরা পড়ে। মূর্ত্তি দুইটি অষ্টধাতুর নির্ম্মিত। ওজন এক একটির ৪॥০ মনের উপর। দাম দুইটির প্রায় ৪২০০৲ পড়িয়াছে।

মূর্ত্তির একটি বিষয় লইয়া সামান্য একটু মতভেদ দেখা গেল। নিতাইবাবু মহাপ্রভুর চোখে জল দেখাইয়াছেন। অনেকেই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে এইরূপ থাকা বাঞ্ছনীয় কি না? অবশেষে শ্রীহরিবাবাজীর নির্দ্দেশে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একজন প্রধান ব্যক্তি শ্রীছোটেলালা মহারাজের নিকট এই বিষয় জিজ্ঞাসা করা হইল। তিনি মত দিলেন যে মহাপ্রভুর চোখে জল থাকা কখনই ঠিক না।

মূর্ত্তি দুইটি আপাততঃ রামকুঞ্জে রাখা হইল। বৃন্দাবনেরই একজন গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের পণ্ডিতকে আচার্য্য করা হইবে স্থির হইয়াছে। কুসুম ব্রহ্মচারী যজমানের পদ গ্রহণ করিবে।

৮ই মার্চ্চ, ১৯৫৫

আজ খুব ভোরে আশ্রমের ছেলেরা ঊষা কীর্ত্তন সহ শ্রীহরিবাবাজীর আশ্রম প্রদক্ষিণ করিয়া আসিল। তাহার পর ৯টার সময় গৌর-নিতাইর মূর্ত্তি এক এক করিয়া শঙ্খ-ঘণ্টা কীর্ত্তন সহ মন্দিরে লইয়া আসা হইল। মাকে মূর্ত্তির অগ্রে রাখা হইয়াছিল। শ্রীহরিবাবাজীকেও অল্প সময়ের জন্য আনান হইয়াছিল। সকাল হইতেই উদয়াস্ত নাম কীর্ত্তন সুরু হইয়াছে। প্রতিষ্ঠার কার্য্য সমাধা হইলে আহুতি ও হোম অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিল। মা ও কিছু সময় সেখানে বসিয়াছিলেন।

৯ই মার্চ্চ, ১৯৫৫

আজ হোলির উৎসব। মা আসিয়া নীচে আমার ঘরে একটু সময় বসিয়াছেন। এমন সময় দিল্লীর কানু এক পিচ্‌কারী রং লইয়া উপস্থিত। মা তাহাকে নিষেধ করিয়া এক বালতী রং আনিতে বলিলেন। ঘরের মধ্যেই মা সকলকে রং দিতে সুরু করিলেন। তাহার পর বাহির হইয়া মন্দিরের দিকে চলিলেন। পিছনে ভক্তবৃন্দ সকলেই আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে চলিল। মাও রং-এ যেন একেবারে লাল হইয়া গিয়াছেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! রাজা মহারাজারাও মূল্যবান জামাকাপড়ের মমতা ত্যাগ করিয়া মার সঙ্গে সঙ্গে রং লইয়া ঘুরিতেছেন। মায়ের সে এক অতি সুন্দর রূপ!

কথা প্রসঙ্গে আলোচনা হইল যে বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই শ্রীহরি-বাবাজীর সঙ্গীয় মনোহর মার নিকট বার বার অনুরোধ জানাইতে-

ছিল আশ্রমে মহাপ্রভুর মূর্ত্তি স্থাপন করার জন্য। কিন্তু মার ত নিজের এসব কিছু খেয়াল করিয়া করা হয় না। তবে যোগাযোগে মন্দির প্রতিষ্ঠা হইয়াই গেল। টাকাও সংগ্রহ হইয়া গিয়াছে। প্রতিষ্ঠার সমস্ত অনুষ্ঠানও নিখুঁতভাবে সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইল। মাত বিশেষভাবে কাহাকেও কিছু বলেন না। মার কথা—"যাহার ইচ্ছা সেবায় যোগদান করিতে পারে।" কাজে দেখা যায় কিছুই ঠেকিয়া থাকে না। মন্দিরের ব্যবস্থা দেরাদুনের পণ্ডিত পরশুরামজী এবং মূর্ত্তি ও প্রতিষ্ঠার সমস্ত খরচ বহন করিলেন ডাঃ পান্নালালজী। এমনকি মন্দিরের পূজার বাসনপত্রেরও রূপার সেট্ বানান হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে একজন ভদ্রমহিলা স্বপ্নে দেখিয়া ঐ জন্য ৫০০৲ টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন। সব সময়ই মা বলেন যে তাঁহার কাজ তিনিই করাইয়া নেন। চিন্তা করা অর্থহীন। মার মুখে প্রায়ই শুনা যাইতেছে—"মহাপ্রভু বিশেষ কৃপা করিয়া আসিয়াছেন। তিনিই সব করাইয়া নিতেছেন।"

বৃন্দাবন আশ্রমে মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা।

মহাপ্রভুর মন্দিরত সম্পূর্ণই হইয়া গেল। এখন শিব-মন্দিরের কাজও অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছে। মার খেয়াল হইলে তাহাও সময়মত সম্পূর্ণ হইবে সন্দেহ নাই।

১০ই মার্চ্চ, ১৯৫৫

আজ মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে আশ্রমে সাধু-সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণবদের ভাণ্ডারা। কাল হইতেই যোগার-যন্ত্র চলিতেছে। সংখ্যায়

খুবই বেশী হওয়ায় এবং স্থানীয় সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণবদের মধ্যে দলাদলির মনোভাবে একটু বিশৃঙ্খলা ও পরিতাপের সৃষ্টি হইয়াছিল। যাহাই হউক শেষ পর্য্যন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া সকলকেই শান্ত ও তৃপ্ত করা হইল। একজন লোকও যদি আশ্রম হইতে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া ফিরিয়া যায় তাহা নিতান্ত অশোভন হয়।

১৫ই মার্চ্চ, ১৯৫৫

অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং বিশ্রামের অভাবে মার শরীরটা বেশ খারাপ চলিতেছে। তাহা ছাড়া চোখের যন্ত্রণা এবং ক্রমাগত জল পড়াত আছেই। বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন। ডাক্তাররা আসিয়া বলিয়া গেলেন যে কিছুদিন চোখটিকে আলো ও ধূলা হইতে বাঁচাইয়া রাখা বিশেষ প্রয়োজন। মারও কিছুদিন হইতেই একটু একলা থাকার খেয়াল হইতেছিল। গত পরশু হইতে মা সম্পূর্ণ বিশ্রাম সুরু করিয়াছেন। ঘরের সব দরজা-জানলা বন্ধ করিয়া মা একলা বিছানায় পড়িয়া থাকেন। বিশেষ প্রয়োজনে কি মা ডাকিলে মাঝে মাঝে কেহ ঘরের মধ্যে যায়। এইভাবে মা হয়ত বেলা ২টা কি ৩টা পর্য্যন্ত অনেকদিন শুইয়াই রহিলেন। হাত-মুখ ধুইবারও নাম নাই—খাইবারও লক্ষণ দেখা যায় না। এইভাবে হয়ত সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাটাইয়া দিলেন। সারা দিনে শুধু একটু জল কিংবা কয়েকটি ফলের টুকরা খাইলেন। সন্ধ্যার পরে আমার সঙ্গে দেখা করিয়া হরিবাবাজীর কীর্ত্তনে যান। রাত্রে ফিরিয়া আসিয়া একটু কিছু মুখে দেন।

সারাদিনে মার সঙ্গে দেখাও হয় না। আমিও সর্ব্বদা শুইয়াই আছি। আমার পক্ষেত কিছু করিবারও উপায় নাই।

সাধুদের ভাণ্ডারার দিন বিশেষ বিশেষ মহাত্মাদের ভাল মত ভোজন করান সম্ভব হয় নাই। মার নির্দ্দেশ মত আজ তাই স্বামী অখণ্ডানন্দজী, পণ্ডিত সুন্দরলাল, ঋষি কুমার এবং আনন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি কয়েকজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া একটু ভালমত খাওয়ান হইল। এই উপলক্ষ্যে মাও আজ সকালেই নীচে নামিয়া আসিলেন। সকলে এই সুযোগে মার একটু দর্শনও পাইল।

মহাপ্রভু সম্বন্ধে মার সূক্ষ্ম দর্শন।

গতকাল মা কথায় কথায় বলিতেছিলেন যে মা সূক্ষ্মে দেখিয়াছেন অনেক অনেক লোক মহাপ্রভুর কাছে আসিয়া উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা জানাইতেছে। হরিবাবার আশ্রমের আনন্দ ব্রহ্মচারীর পূর্ব্ব পুরুষদের মধ্যে কাহারো সঙ্গে দুইটি স্ত্রীলোকের যোগাযোগ ছিল। তাহারাও ঐ সঙ্গে মিলিয়া কাতরভাবে উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করিতেছে।

শ্রীহরিবাবাজীও শুনাইলেন যে কাশী হইতে একজন সাধু আসিয়াছেন তিনি সেখানে থাকাকালেই দর্শন পাইয়াছিলেন যে স্বয়ং মহাপ্রভু এখানে আশ্রমে আসিয়াছেন। তিনি নিজেই ২।৩ দিন পরে আসিয়া দর্শন করিয়া গেলেন। আরও কয়েকজনের মুখে শুনা গেল যে তাঁহারাও সাক্ষাৎ মহাপ্রভুরই দর্শন পাইয়াছেন। মা নিজেও সর্ব্বদাই সকলকে বলিতেছেন—"দেখ দেখ, কি সুন্দর মূর্ত্তি হইয়াছে। মহাপ্রভু কৃপা করিয়া আসিয়াছেন।" মূর্ত্তি দুইটি সত্যই বৃন্দাবনের বিশেষ দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে স্থান পাইয়াছে। বহু তীর্থযাত্রীর দল দূর দূর হইতে

এই মূর্ত্তি দর্শনের জন্য আসিতেছেন। অষ্টধাতুর এইরূপ বড় মূর্ত্তি সচরাচর কোথাও দেখা যায় না। সকলেই একবাক্যে শিল্পীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতেছে। মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের মূর্ত্তি দেখিয়া আমারও প্রবল ইচ্ছা হইয়াছে যে মার ২।১টি statue করাইয়া রাখা হয়। নিতাই পালের সহিতও এই সম্পর্কে আলাপ করিয়াছি।

১৭ই মার্চ্চ, ১৯৫৫

মার চোখটি কোনও প্রকারেই ভাল হইতেছে না। আলো লাগা মাত্র জল পড়িতে আরম্ভ করে। কত লোকে কত রকম ঔষধ আনিয়া দিতেছে। কিন্তু যে সব ঔষধে নিশ্চিত সারিয়া যাইবার আশা তাহা প্রয়োগ করিয়া মার রোগ আরও বাড়িয়া যায়। আমরা জানি যে মার নিজের খেয়াল না হইলে চিকিৎসক বা ঔষধে কিছুই হইবার না।

আজ সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত বি, কে, শাহ দিল্লী হইতে মোটরে আসিয়া পৌছিলেন। সঙ্গে ডাক্তার বলরামও আসিয়াছেন। New Indiaর আরও কয়েকজন সঙ্গে আসিয়াছেন।

গতবার তিনি যখন কাশীতে আসিয়াছিলেন একটি Tape Recorder আমার নিকট রাখিয়া যান। এবার শিবরাত্রির দিন কিছু recording হইয়াছিল। তাহার পর আর সুযোগ হয় নাই। মেশিনটি চলিয়া যাইবে তাই এবার কোনও রকমে মার একটু কথা বা গান record করা যায় কিনা সেই চেষ্টা করা হইতেছে। কিন্তু

মারত এসব বিষয়ে কোনও খেয়ালই নাই। বিশেষ প্রার্থনা করিলেও কিছু হইবে না। মার এক একটি কথা অমূল্য। তাহা এইভাবে যদি record করিয়া রাখা হয় তবে ভবিষ্যতের অমূল্য সম্পদ হইবে।

২৬শে মার্চ্চ, ১৯৫৫

আজ সকালে তিনখানা মোটরে করিয়া দিল্লী হইতে এক বিরাট পার্টি আসিয়া হাজির। টিহরীর রাজমাতা এবং সেই সঙ্গে শ্রীমতী রাজেন নেহরু, নেপালের রাজদূতের স্ত্রী, চারখারীর রাজমাতা এবং আরও অনেকে মার দর্শনের জন্য আসিয়াছেন। ইহারা সকলেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে মার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। শ্রীমতী নেহরুর কাছে শুনিলাম যে রাজমাতার সঙ্গে এবার চীনদেশে তাঁহার পরিচয় হইয়াছে। তিনি পূর্ব্বে কখনও মার দর্শন করেন নাই। খুবই মিশুক প্রকৃতির। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সকলের সঙ্গে খুব ভাব করিয়া ফেলিলেন। যেন কতদিনের পরিচয়।

মাতৃ সকাশে রাণী সরলা দেবী, চারখারীর রাজমাতা ও শ্রীমতী রাজেন নেহরু।

নেপালের রাজদূত ৵রাজা বিজয় সামশেরের স্ত্রী রাণী সরলা দেবীকে দেখিলাম খুবই দুঃখী। স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে সমস্ত চেহারার মধ্যে যেন বেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। হঠাৎ কিছুদিন পূর্ব্বে দিল্লীতে তাঁহার স্বামী স্নান করিতে গিয়া Electrically heated

bath tubএ shock লাগিয়া সঙ্গে সঙ্গে মারা যান। সংবাদ পত্রে এই সংবাদ পূর্ব্বেই সকলে পাইয়াছে। শোনা গেল ভারতে বৈদেশিক সব রাজদূতের মধ্যে তিনিই কনিষ্ঠতম এবং জনপ্রিয় ছিলেন। মাকে দেখিয়া খুবই শান্তি পাইয়াছেন। মার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া একান্তে কথা বলিয়া প্রাণের জ্বালা জুড়াইবার চেষ্টা করিলেন।

মহারাণী লীলা রাজ্যলক্ষ্মী তিনিও বিশেষ দুঃখী। তাঁহার স্বামী চারখারীর মহারাজাও হঠাৎ কিছুদিন পূর্ব্বে দিল্লীতে হোটেলের মধ্যে মারা যান। তিনি নেপালের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মহারাজা মোহন সামশেরের কন্যা। এখন স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে পিতার সহিত ব্যাঙ্গালোরেই আছেন। রাণী সরলাও উপস্থিত সেখানেই আছেন। তাঁহাদের সঙ্গে আরও অনেকে আসিয়াছেন। তাঁহারাও মার দর্শন করিয়া এবং মার কথা শুনিয়া বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছেন। আজ বিকালেই দিল্লী ফিরিয়া যাইবার কথা ছিল। কিন্তু তাঁহাদের মাকে এত ভাল লাগিয়াছে যে তাঁহারা মাকে ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছুক না। একমাত্র টিহরীর রাজমাতা ভিন্ন অন্য কাহারো বিছানাপত্র কিছুই নাই। আশ্রম হইতে সকলের কোনও ভাবে শুইবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল। রাত্রে তাঁহারা মার নিকট আশ্রমেই থাকিয়া গেলেন।

৩১শে মার্চ্চ, ১৯৫৫

আজ সন্ধ্যাবেলায় একটি আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। মহাপ্রভুর মন্দিরের সম্মুখে শ্রীশ্রীহরিবাবার কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

মা নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সমস্ত ব্যবস্থা দেখাইয়া দিতেছেন। সঙ্গে আরও অনেকে আছেন। মা মন্দিরের উপরে আছেন। আমাকেও সেইখানে গিয়া স্ট্রেচারের উপরে শোয়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। হরিবাবাজী আসিয়া আশ্রমে পৌঁছিয়াছেন দেখিয়া খুব তাড়াহুড়া করিয়া নীচে নামিতে গিয়া বেতালে ডান পা পড়িয়া পায়ের পাতাটি সম্পূর্ণ মচকাইয়া গেল। সমস্ত শরীরের বোঝা পায়ের উপর আসিয়া পড়ায় মা একেবারে বসিয়া পড়িলেন। হঠাৎ খেয়াল হইল যে হরিবাবাজী আসিয়া পড়িয়াছেন। তাড়াতাড়ি দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু দাঁড়াইতে পারিলেন না মন্দিরের সিড়ির উপরই বসিয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে বহু লোক ছুটিয়া আসিল। কেহ বলিল পা ডলিয়া দিতে—কেহ বলিল চুণ হলুদ লাগাইতে—কেহ বলিল আরও কিছু করিতে। কিন্তু মা নিজে খেয়াল করিয়া বলিলেন একটি থালা ও ঠাণ্ডা জল আনিতে। মা সেই থালার উপর পা-টি চাপিয়া ধরিয়া জলের ধারা দিতে লাগিলেন। বরফ আসিলে তাহা জলের মধ্যে মিশাইয়া দেওয়া হইল।

মহাপ্রভুর মন্দিরের সম্মুখে মার পায়ে আঘাত প্রাপ্তি।

অসহ্য ব্যথা কিন্তু মার মুখের ভাব দেখিয়া কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। চুপ করিয়া বসিয়া হরিবাবাজীর কীর্ত্তন শুনিতেছেন। পরমানন্দ স্বামী ব্যস্ত হইয়া আসিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ডাক্তার আনাইবার জন্য। মা তখন নিষেধ করিলেন। সেইভাবে জলের ধারাই দেওয়া হইতে লাগিল। কিছু পরে মা বলিলেন মথুরার সিভিল সার্জ্জন ডাঃ মল্লিককে আনাইবার জন্য। তিনি বহুদিন ধরিয়া মার সঙ্গে পরিচিত। পানু সঙ্গে সঙ্গে মোটর লইয়া মথুরায় চলিয়া গেল।

মা এদিকে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল পায়ে জল ঢালিয়া সেই একই

ভাবে পা-টি রাখিয়া মন্দিরের সিড়ির উপরই বসিয়া রহিলেন। কীর্ত্তন শেষ করিয়া হরিবাবা চলিয়া গেলেন। তিনি এবং সঙ্গীয় কেহই বুঝিতে পারিলেন না যে মার আঘাত কত গুরুতর হইয়াছে। বাহির হইতে দেখিয়া তাঁহারা অনুমান করিলেন যে হয়ত সামান্য চোট লাগিয়াছে মাত্র।

রাত্রি দশটার পরে পানু সিভিল সার্জ্জনকে লইয়া আসিল। তিনি আসিয়া বলিলেন X'-ray করা আবশ্যক। তবে উপস্থিত তিনি একটি তারের Splint দিয়া ভাল করিয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিলেন এবং আধ ঘণ্টা পর পর একটি lotion দিয়া স্থানটি ভিজাইয়া রাখিতে বলিলেন। Bandage করিবার পরে মাকে চেয়ারে বসাইয়া সকলে মিলিয়া ধরিয়া উঠান হইল। মা উপরের ঘরে যাইতে রাজী না হওয়ায় হরিবাবার কুটিয়ায় নীচের ঘরে মাকে নিয়া শোয়াইয়া দেওয়া হইল। ঐখানে মা একান্তে থাকিবেন বলিয়া মার খেয়াল।

মাকে এই অবস্থায় কেহ কখনও দেখিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ওদিকে মা কুটিয়ায় সর্ব্বদা কোনও মেয়েদেরও সঙ্গে থাকিতে দিবেন না। মা বলিলেন—"কোনও ভাবে ছেলেদের দিয়াই হয়ে যাবে।" আমার দুর্ভাগ্য—আমিও বিশেষ শয্যাগত। মার কোনই সেবায় লাগিতে পারিতেছি না। এমন কি মাকে গিয়া দেখিবার ক্ষমতাও নাই। রাত্রে মার কুটিয়ার বারান্দায় স্বামীজী, পানু ও কুসুম ব্রহ্মচারী রহিল। মেয়েদের আর কাহাকেও মা থাকিতে দিলেন না।

১লা এপ্রিল, ১৯৫৫

সকালে উঠিয়া শুনিলাম রাত্রে মার ব্যথা খুবই বেশী ছিল।

সিভিল সার্জ্জনকে সংবাদ দিলে তিনি নিজেই আজ চলিয়া আসিলেন। কিছুক্ষণ পর মাকে স্ট্রেচারে বসাইয়া মোটরে করিয়া স্থানীয় একটি হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইল। হাসপাতালেও মাকে ঐ ভাবেই নামান হইল। হাসপাতালের মালিক নিজে হাত জোড় করিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। মাকে বলিলেন—"এতদিনে আমার হাসপাতাল ধন্য হইল। আজ মায়ের চরণধূলা পড়িল।" একেত মা নিজে গিয়াছেন—তাহা ছাড়া সিভিল সার্জ্জন সম্মুখে দাঁড়াইয়া সব কিছুর ব্যবস্থা করিতেছেন সুতরাং হাসপাতালের সার্জ্জন নার্স প্রভৃতি সকলেই তটস্থ। হাসপাতালের মধ্যেও মার দর্শনের জন্য ভীড় লাগিয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে ডাক্তার-সার্জ্জন, নার্স-পরিচারক, রোগী প্রভৃতি সকলেই আছে। মা যে স্বয়ং একজন রোগী সাজিয়া আজ হাসপাতালে আসিয়াছেন তাহা যেন বিশ্বাসই হইতেছিল না। হাসপাতালের Superintendent ও Civil Surgeon দুইজনেই মার পায়ের X'-ray বিশেষ যত্ন করিয়া নিলেন। প্রথম দুইটি plate খুব ভাল উঠিল না সেইজন্য আরও দুইটি নেওয়া হইল। ভাল করিয়া Screeningও করা হইল। আঘাত মার পায়ে লাগিয়াছে। যদি report ভুল হয় তবে তাঁহাদের নিতান্ত লজ্জিত হইতে হইবে সেইজন্য হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ সাবধান হইতে চান। কিন্তু ৪খানা plate নিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না যে মার পায়ে সত্যই fracture হইয়াছে কিনা। অগত্যা তিনি সকল plates নিজের চেম্বারে লইয়া গেলেন। মাকে হাসপাতাল হইতে আবার মোটরে করিয়া ফেরৎ আনা হইল।

সারাদিন-রাত মা বিছানায় শুইয়া রহিলেন। ব্যথা যথেষ্ট আছে এখনও।

২রা এপ্রিল, ১৯৫৫

আজ সকালে যোগেনবাবু সিভিল সার্জ্জনের নিকট হইতে সংবাদ লইয়া আসিলেন যে তাঁহার অনুমান পায়ের একটি স্থানে কিছু crack হইয়াছে। সেইজন্য আগামী কাল সকালে আসিয়া তিনি plaster করিয়া দিতে চান। কিন্তু মার পা এইভাবে plaster করিয়া রাখিতে কেহই সম্মত হইল না। দিল্লী বেশী দূরে না। সেখানে বহু বড় বড় Surgeon ও Radiologist আছেন। স্থানীয় Civil Surgeonএর উপর অবিশ্বাসের ভাব কাহারো নাই। তবুও মানুষ মাত্রেরই ভুল হওয়া স্বাভাবিক। তাই সকলের মনের সন্তুষ্টির জন্য অন্যান্য বড় বড় Specialist দেখানই যুক্তিযুক্ত মনে হইল। মায়ের শ্রীচরণে আঘাত লাগিয়াছে যদি বিশেষ ভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা না করা হয় তবে অন্য দশজনেই বা কি বলিবে? মায়ের জন্য বম্বে-কলিকাতা যে কোনও স্থান হইতে এরোপ্লেনে করিয়াও সার্জ্জন আনান মোটেও কষ্টসাধ্য না। বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত বি, কে, শাহ আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তির জন্যই না কত কি করিয়াছেন। মার পায়ে এইরূপ আঘাত লাগিয়াছে জানিলে তিনি না জানি কত ব্যস্ত হইবেন।

এসব সম্বন্ধে মার অনুমতি নেওয়ার কোনও প্রয়োজন নাই। মার নিকট সব অবস্থাই সমান। মারত কোনও কষ্ট বোধ নাই। তথাপি আমাদের দিকে ও সিভিল সার্জ্জনের মনের দিকে তাকাইয়া মা বলিলেন—"তোমরা ইচ্ছা হইলে পরে প্লেট অন্যকে দেখাইতে পার। এখন সিভিল সার্জ্জন যাহা করিতেছে তাহাই করিতে দাও। যাহা হইয়া

যায় তাহাই ঠিক।" মার ইচ্ছাই যে পূর্ণ হইবে তাহা সর্ব্বাপেক্ষা বড় সত্য। তাই মায়ের কথার প্রতিবাদ না করিয়া সিভিল সার্জ্জনের উপরেই সব ভার ছাড়িয়া দেওয়া হইল। অপর দিকে 'আগামী-কাল সকালেই সমস্ত প্লেট সহ পানু দিল্লী যাইয়া সেখানে প্রসিদ্ধ Radiologist ডাঃ বেদপ্রকাশকে দেখাইবে স্থির করিলাম।

৩রা এপ্রিল, ১৯৫৫

শ্রীমান পানু আজ ভোরে প্লেট সহ দিল্লী রওনা হইয়া যাইবার পরই ডাঃ মল্লিক প্ল্যাস্টারের সমস্ত সরঞ্জাম সহ আসিয়া উপস্থিত। তবে শেষ পর্য্যন্ত তিনি স্থির করিলেন elastic plaster লাগান। আমরা সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলাম। ডাক্তার মল্লিক পায়ের বর্ত্তমান ব্যাণ্ডেজটি খুলিয়া খুব শক্ত করিয়া elastic plaster বাঁধিতে লাগিলেন। ডাক্তারদের নিয়মানুসারে তিনি বারবার মার মুখের দিকে তাকাইতেছিলেন যে বিশেষ কষ্ট হইতেছে কিনা। কিন্তু মা হাসিয়া বলিলেন—"বাবা, এ শরীরটার মুখ দেখে তুমি কিছুই বুঝতে পারবে না।" সত্য সত্যই তিনি ঠিক মত বুঝিতে না পারিয়া plasterটি খুব বেশী শক্ত করিয়া বাঁধিয়া চলিয়া গেলেন। ফল অতি শীঘ্রই বিপরীত হইয়া দাঁড়াইল। পায়ের সমস্ত আঙ্গুলগুলি ফুলিয়া ব্যথা অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। সন্ধ্যাবেলা ডাঃ মল্লিক আসিয়া নিজেই লজ্জিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের হাতেই বাঁধ কাটিয়া ফেলিলেন। ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া পায়ে একটু iodex মালিশ করিয়া পুনরায় ভাল করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন।

৪ঠা এপ্রিল, ১৯৫৫

গত রাত্রেই শ্রীমান পানু দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। ডাঃ বলরামের (যিনি আমার দেখাশুনা করিতেছেন) সঙ্গে পরামর্শ করিয়া plates ডাঃ সন্তোষ সেনকে* দেখান হয়। সন্তোষবাবু উহা দেখিয়াই বলিলেন যে সামান্য fracture হইয়াছে সত্য তবে plaster যেন কোনক্রমেই না করা হয়। তাঁহার মতে Belladona paint দিয়া হাল্কা bandage করিয়া রাখিলে ৭।৮ দিনের মধ্যে কমিয়া যাইবার আশা। যদি না কমে তবে মাকে একবার দিল্লী লইয়া যাইতে বলিয়াছেন।

সন্তোষবাবুর মত জানিবার পর পানু ডাঃ বলরাম সহ দিল্লীর অন্য দুইজন প্রসিদ্ধ radiologist দের সঙ্গেও পরামর্শ করে। ডাঃ সন্তোষ সেনের মতের উপরে সাধারণতঃ কেহ কোনও রকম মতামত প্রকাশ করা সমীচীন মনে করেন না। তবুও তাঁহারা plates ভাল মত দেখিয়া এই সিদ্ধান্তেই আসিয়াছেন যে কোনও fracture হয় নাই। যাহাই হউক দেখা গেল যে সকল ডাক্তারেরই মত যে plaster করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই।

এদিকে ডাঃ মল্লিক নিজেই কাল সন্ধ্যায় elastic plasterও খুলিয়া ফেলিয়াছেন। সুতরাং দিল্লীর ডাক্তারদের সহিত তাঁহার মত বিরোধের কোনও অবকাশ রহিল না।

আজ সন্ধ্যাবেলা ডাঃ মল্লিক যখন bandage করিতে আসিলেন

---

* দিল্লীর পুরাতন ভক্ত ডাঃ জে, কে, সেনের পুত্র বিশেষ খ্যাতনামা সার্জ্জন ডাঃ সন্তোষ কুমার সেন।

তখন মা নিজেই তাঁহাকে বেশ ভাল করিয়া সমস্ত ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিলেন। তিনি ডাঃ সন্তোষ সেনের নির্দ্দেশ মতই পায়ে Belladona paint লাগাইয়া শুধু bandage বাঁধিয়া দিলেন।

৭ই এপ্রিল, ১৯৫৫

প্রায় এক সপ্তাহ হইয়া গেল কিন্তু মার পায়ের অবস্থা এখনও মোটেও স্বাভাবিক না। সন্তোষবাবু বলিয়াছিলেন ৭।৮ দিনের মধ্যে ব্যথা ফুলা না কমিলে মাকে একবার দিল্লী লইয়া যাইতে। কিন্তু মার এখনই যাওয়ার কোনও খেয়াল দেখা যায় না। বিশেষতঃ আগামী কাল পর্য্যন্ত শ্রীহরিবাবাজী এখানে আছেন।

দিল্লী হইতে পঙ্কজদাদা ইতিমধ্যে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত মার বর্ত্তমান অবস্থা জানাইয়া সন্তোষবাবুর নিকট একটি রিপোর্ট পাঠান হইল। তিনি দিল্লী হইতে জানাইয়াছেন যে Belladona paint লাগান এবং নিয়মিত fomentation যেন করা হয়।

এদিকে মার এই পায়ে আঘাতের কথা ধীরে ধীরে নানা দিকে ছড়াইয়া পড়ায় চিঠি ও তারের ছড়াছড়ি পড়িয়া গেল। সকলেই মার জন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়াছেন। বম্বেতে শ্রীযুক্ত বি, কে, শাহ মার এই সংবাদ পাওয়া মাত্রই দিল্লীতে ডাঃ বলরামের নিকট ট্রাঙ্ককল করেন যে তিনি যেন প্রয়োজন হইলে দিল্লীর শ্রেষ্ঠ সার্জ্জন প্রভৃতিকে বৃন্দাবন নিয়া যাইতে কোনও বাধা না করেন। ডাঃ বলরামজী এই ফোন পাইয়াই মোটরে বৃন্দাবনে আসিয়া মাকে দেখিয়া

গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বি, কে, শাহকেও আশ্বাস দিয়া টেলিগ্রাম করিয়া দিয়াছেন যে বিশেষ চিন্তার কিছু নাই।

ইতিমধ্যে একদিন কথাপ্রসঙ্গে মা বলিতেছিলেন—"এই শরীরের উপর এই যে আঘাত ইহা মহাপ্রভুরই বিশেষ কৃপা।" ইহাই ভিতর যে বিশেষ কোনও রহস্য আছে তাহা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটি যে আমরা কবে জানিতে পারিব তাহা বলা কঠিন। মা আবার কাহারো পত্রের উত্তরে লেখাইয়াছেন—"এই আঘাত মহাপ্রভুরই বিশেষ ক্রিয়া। মহাপ্রভুর উপস্থিতির ইহা সাক্ষাৎ প্রমাণ।" কিন্তু ভিতরের কথাটি মা প্রকাশ করেন নাই।

"এই আঘাত মহাপ্রভুরই বিশেষ কৃপা।"

মহাপ্রভুর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। প্রতিষ্ঠার কথা যখন প্রথম কাশীতে হয় তখন শ্রীহরিবাবাজী বলিয়াছিলেন যে স্থাপনার সমস্ত ব্যবস্থা তিনিই করিয়া দিবেন। তাই এখানে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে প্রতিটি খুঁটিনাটি জিনিষও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াই করা হইয়াছে।

অনেক মন্দিরে সচল ও অচল বিগ্রহও থাকে। তাহা ছাড়া আবার যন্ত্রও থাকে। যন্ত্রের উপরই নিত্য পূজা এবং যন্ত্রেরই বিধিমত শয়ন ইত্যাদি হয়। যখন মহাপ্রভুর মূর্ত্তি স্থাপনার কথা হইয়াছিল তখনই এই কথা হয় যে মন্দিরে ভোগমূর্ত্তি না রাখিয়া যন্ত্রই রাখা হইবে। যেদিন প্রতিষ্ঠার কথা সেদিন মা যখন মন্দিরের সম্মুখে গেলেন তখনই মার হঠাৎ খেয়াল হইল যে কি যেন হয় নাই। কিন্তু তাহা মা তখন মুখে প্রকাশ করিলেন না। প্রতিষ্ঠাও হইয়া গেল।

ইহার ২।৩ দিন পরে মা যোগেনদাকে* জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা প্রতিষ্ঠাত হয়ে গেল। কিন্তু যন্ত্র কৈ ?" যোগেনদা বলিলেন যে তাহাত হয় নাই। এই বিষয়ে আচার্য্য ও শাস্ত্রীর সহিতও কথা হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য যে যন্ত্র সম্বন্ধে তাঁহারাও কিছুই বলেন নাই।

রাধারমণজী মন্দিরের শ্রীছোটেলালজীকে হরিবাবাজী বিশেষ মান্য করেন। সুতরাং মা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বিধিপূর্ব্বক যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে নির্দ্দেশ দিলেন।

ঐ সময় মার শরীরটা ভাল যাইতেছিল না। চোখ দিয়া সর্ব্বদা জল পড়িত এবং সেইজন্য বাহিরে খুবই কম আসিতেন। মা একদিন মনোহরকে বলিয়াছিলেন শ্রীহরিবাবাকে অনুরোধ করিবার জন্য তিনি যেন আসিয়া মার সঙ্গে একটু বিশেষ কথা বলেন। কিন্তু পরে হরিবাবার লোকদের মধ্যে কেহ আসিয়া খবর দিল যে তাঁহার শরীরটাও ভাল না তাই তিনি আসিতে পারিবেন না। তখন মা বলিলেন—"যাহা হইবার তাহাই হইবে। পিতাজী যখন এই কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন তখন আর আসিবার দরকার নাই।" পরে মা আবার বলিয়াছেন—"এই শরীরটার খেয়াল হইল এইরূপই হইবার। মহাপ্রভু তোমার ব্যবস্থা তুমি নিজেই করিয়া নেও।"

আরও একটি ঘটনা এই যে মূর্ত্তি স্থাপনার সময়ই মা আচার্য্যকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে ঠাকুরের উত্থান হইতে শয়ন পর্য্যন্ত সমস্ত বিধি

* বৃন্দাবনের বর্দ্ধমানকুঞ্জের ম্যানেজার শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, কাব্যতীর্থ। ইনি মায়ের একজন পুরাতন ভক্ত এবং আশ্রমের বিশেষ সহায়ক।

পূজারীকে যেন লিখিয়া দেন। ব্রহ্মচারী কুসুম পূজা করিবে তখন স্থির ছিল। পরে হরিবাবার আশ্রমের মনোহর পূজা করিতে আরম্ভ করে। স্থাপনার পর একদিন মা নিজেরই খেয়ালে কুসুমকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে বিগ্রহের শয়ন কোনও মন্ত্র পাঠ করিয়া দেওয়া হয় না। তাহাকে মন্ত্র কেহই বলিয়া দেয় নাই।

সাধারণতঃ দেখা যায় মূর্ত্তিকে শয়ন দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের মূর্ত্তি বিশেষ ভারী বলিয়া তাহা সম্ভবপর না। দ্বিতীয়তঃ—যন্ত্র শয়নও হয়। কিন্তু এখানে যন্ত্রও প্রতিষ্ঠা হয় নাই। তৃতীয়তঃ—মন্ত্র শয়নও হইয়া থাকে। কিন্তু কুসুম সে মন্ত্রও জানে না।

মা ইহা শুনিয়া বেশ একটু গম্ভীর হইয়া গেলেন। দেবতাকে আবাহন করিয়া শয়ন দেওয়া হয় না। ইহা কত বড় অপরাধের কথা। কিন্তু সম্পূর্ণ ঘটনাটি আনুপূর্ব্বিক গুপ্তভাবে রহিল। ২।৩ জন ছাড়া আর বিশেষ কেহই জানিতে পারিল না। মাত পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছেন—"মহাপ্রভু! তোমার ব্যবস্থা তুমিই করিও।"

সংবাদ আসিল যে হরিবাবা পূর্ণিমার পরই বৃন্দাবন হইতে অন্যত্র যাইবেন। তাই যন্ত্র প্রতিষ্ঠাও পূর্ণিমার দিন হওয়া স্থির হইল। মা হরিবাবাকে পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া রাখিলেন যে পূর্ণিমার দিন কিছু কাজ আছে। সেদিন তাঁহাকে আসিতেই হইবে।

এদিকে প্রথম যেদিন মন্দিরে যন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা ছিল সেইদিন হরিবাবা সংবাদ পাঠাইলেন যে সন্ধ্যার সময় মহাপ্রভুর মন্দিরের সম্মুখে তিনি কীর্ত্তন করিবেন। সন্ধ্যাবেলা মন্দিরে আরতি হইতেছে। মা দরজার সামনে দাঁড়াইয়া আছেন। এই সময়ে হরিবাবা আসিয়া পৌছিয়াছেন। মার খেয়াল হইল যে হরিবাবার নিকট যাইবেন

মা মহাপ্রভুর নিকটই থাকিবেন। মা আবার নিজের মনেই বলিলেন—"সবই মহাপ্রভু।" এই বলিয়া তাড়াতাড়ি নামিতে গিয়া মা পায়ে আঘাত পাইলেন। নামিবার সময় মার শরীর যেন অসম্ভব ভারী হইয়া যায় এবং পায়ের পাতাটি অকস্মাৎ ধনুকের মত বাঁকিয়া গেল।

আশ্চর্য্য পূর্ব্ব দিনই মা বলিতেছিলেন—"দেখো সাবধান। কেউ যেন না পড়ে যায়।" শিব মন্দিরে তখন কাজ চলিতেছিল। মা পরমানন্দ স্বামী ও মজুরদেরও সাবধান করিয়া দিয়াছেন। পরমানন্দজী আসিয়া মার নিকট সংবাদ দিলেন যে কোথায় নাকি একটি মোটরবাস পড়িয়া গিয়াছে, আবার একটি লোকও নাকি কোথা হইতে পড়িয়া গিয়া আঘাত পাইয়াছে। মা শুনিয়া বলিলেন—"ইহাতে কাটিলে হয়।" পরে সেদিন পায়ে চোট লাগার পরে মাকে যখন চেয়ারে করিয়া কুটিয়ায় লইয়া যাওয়া হইতেছিল তখন মা বলিয়া উঠিলেন—"এই রূপটাই কালকে দেখা হয়েছিল। কাকে আর দেখা হবে? নিজেকেই নিজে।"

আঘাত লাগার পরদিন হরিবাবা আসিয়া মার নিকট বিশেষরূপে তুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে মহাপ্রভু স্থাপিত হইবার পরই মা এইভাবে আঘাত পাইলেন। হরিবাবার মনে হইয়াছে যে তাঁহার সহিত যদি বিন্দুমাত্রও মহাপ্রভুর সম্পর্ক থাকিত তবে আর ঐরূপটি বোধ হয় হইত না। মা এই কথা শুনিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"পিতাজী, মহাপ্রভুর সঙ্গে যে বিশেষ সম্পর্ক আছে এবং মহাপ্রভু যে বাস্তবিকই প্রকট হইয়াছেন তাহারই নিদর্শন হইল পায়ে চোট পাওয়া।" ইহার ভিতরে যে বিশেষ রহস্য আছে তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল।

গতকাল হরিবাবা যখন মার কুটিয়ার সম্মুখে কীর্ত্তন করিতে

আসিয়াছিলেন তখনও তাঁহার সহিত মার এই সব বিষয়ে বিস্তারিত কথা হয়। ঘরে আনন্দ ব্রহ্মচারীজী, পরমানন্দ স্বামী, যোগেনদা এবং আমি মাত্র ছিলাম। মা হরিবাবাকে বলিতেছিলেন—"পিতাজী, যন্ত্র বলা সত্ত্বেও আনা হয় নাই। মন্ত্র শয়নও হয় নাই। শয়ন যদি না দেওয়া হয় তবে অপরাধ হয় কিনা? তখনই এই শরীর বলিয়াছিল যে মহাপ্রভু তোমার ব্যবস্থা তুমিই করিয়া নিও। এক হয় ভাবের পূজা। আর যদি বিধিমত পূজা করিতেই হয় তবে সেই মতই করা দরকার।"

আবার বলিতেছেন—"এই শরীরের পায়ে চোট লাগিল—শরীর বিশেষ ভারী বলিয়া মনে হইল। বল বল, পিতাজী! ইহা মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপা কিনা?"

যোগেনদা বলিলেন—"মাতাজীর এইরূপই হইয়া থাকে। এলাহাবাদে যেবার ৺দুর্গাপূজা হয় তখন প্রতিমা বিসর্জ্জন দিবার সময় যখন বাহিরে আনা হয় সেই সময় সধবা স্ত্রীলোকেরা দেবীর কপালে সিন্দুর লাগাইয়া থাকে। মা সেই সময় স্ত্রীলোকদের ভীড় দেখিয়াই বলিয়াছিলেন যে দেবীর গায়ে যেন চোট না লাগে। কিন্তু আমরা বিশেষ সতর্ক থাকা সত্ত্বেও পরে দেখি যে দেবীর একটি আঙ্গুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমরা কিন্তু কোনও উচ্চবাচ্য না করিয়া দেবী মূর্ত্তি গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়া আসিলাম। ফিরিয়া আসিয়াই শুনি যে মার পায়ে বিশেষ চোট লাগিয়াছে।"

মা এই কথা শুনিয়া শুধু হাসিতে লাগিলেন। আর কিছু বলিলেন না।

আজ পূর্ণিমা। পূর্ব্ব কথা অনুসারে মারই ঘরের মধ্যে আজ

মহাপ্রভুর যন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। যোগেনদাই সমস্ত অনুষ্ঠান কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। পূজা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত মা কিছু না খাইয়া বসিয়াছিলেন। দীর্ঘ সময় বসিয়া থাকাতে পরে পায়ের ফুলা এবং ব্যথাও কিছুটা বেশী মনে হইল। কিন্তু মা নিজ খেয়ালে যাহা করিয়া যাইতেছেন তাহাতে কে বাধা দিবে?

৮ই এপ্রিল, ১৯৫৫

আজ খুব ভোরে হরিবাবাজী চলিয়া গেলেন। এই সামান্য কয় দিনের মধ্যে যে এত ঘটনা ঘটিয়া গেল তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। তবে প্রকৃত রহস্য এখনও সকলের নিকট গোপনই রহিয়া গেল। সকল কথা কোন দিন প্রকাশ করিবার খেয়াল মার আদৌ হইবে কিনা জানি না।

মার পায়ের ফুলা ও ব্যথা এখনও আছে। এই অবস্থায় আমার সহিত একত্রে সোলন যাওয়া ডাক্তাররা নিষেধ করিতেছেন। মারও কিছুদিন এখানে একান্তে থাকারই খেয়াল দেখা যাইতেছে। আমার ১১ই রওনা হইবার কথা হইয়াছে।

১১ই এপ্রিল, ১৯৫৫

গতকাল মার নির্দ্দেশ মত কেশবানন্দ স্বামী, উপেন মহারাজ প্রভৃতি ৬।৭ জন সোলন রওনা হইয়া গিয়াছেন। আমি আজ সকালে

আগ্রা প্যাসেঞ্জারে দিল্লী রওনা হইলাম। আমার সঙ্গে বুনি, পুষ্প, রেণু, পানু, কুসুম প্রভৃতি ৭।৮ জন যাইতেছে। মা এখানেই থাকিয়া গেলেন। সঙ্গে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কেহই বিশেষ রহিল না। কিছু-দিন হইতেই বিশেষ লোক জন সঙ্গে রাখার খেয়াল যেন মার দেখা যায় না।

দিল্লী স্টেশনে আসিয়া ৪।৫ ঘণ্টা সেখানেই কাটাইয়া রাত্রের গাড়ীতে সোলন রওনা হইবার কথা। ইতিমধ্যে একটি কথা এই যে কিছু-দিন ধরিয়া তলপেটের নীচে একটি যন্ত্রণা অনুভব করিয়া আসিতেছি। ব্যথা অনেক সময় অসহ্য বলিয়াও মনে হয়। পূর্ব্ব হইতেই টিহরীর রাজমাতার নিকট তার করিয়া রাখা হইয়াছে যে তিনি যেন একজন ভাল Lady Doctor আনিয়া স্টেশনেই আমার পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। এদিকে স্টেশনে পৌছিবামাত্র পঙ্কজদা আসিয়া বলিলেন যে আজই সন্ধ্যায় ডাঃ সন্তোষ সেনের Nursing Homeএ তাঁহার স্ত্রীকে দিয়া আমার পরীক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। সন্তোষবাবুর স্ত্রী গীতাও একজন বিশেষ খ্যাতনামা চিকিৎসক। Nursing Homeএ গিয়া যে দেখাইতে হইবে তাহা আমাদের পূর্ব্বে খেয়াল হয় নাই। কিন্তু একবার পঙ্কজদা যখন সব কথাবার্ত্তা পাকা করিয়া ফেলিয়াছেন তখন একেবারে না যাওয়া শোভন হইবে না মনে হইল। ডাঃ বলরাম এবং শ্রীযুক্ত আগরওয়ালজীর বিশেষ আগ্রহ দেখিলাম না। কিন্তু তাঁহাদের বুঝাইয়া তাঁহাদের সঙ্গে লইয়াই স্টেশন হইতে অ্যাম্বুলেন্সে করিয়া সন্তোষবাবুর Nursing Homeএ গেলাম। সেখানে তিনি আমাকে পরীক্ষা করিয়া এবং পুরাতন সব X-ray plates দেখিয়া বলিলেন আমার মূল রোগ সম্বন্ধেই তিনি সন্দেহযুক্ত। তাই আমাকে

এখানে ২।৩ দিন থাকিয়া ভাল করিয়া পরীক্ষাদি করাইয়া যাইতে বলিলেন। আমরাত শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। মাত্র দুই ঘণ্টা পরে ট্রেণ ছাড়ার কথা। রিজার্ভেশন ইত্যাদি সব হইয়া গিয়াছে। ট্রেণে এতক্ষণে বোধ হয় মাল-পত্রও সব উঠান হইয়া গিয়াছে। মহা ভাবনায় পড়িলাম। সন্তোষবাবু নিজ হইতেই বলিলেন—"ভাবছেন কেন? মার আশ্রমত আছেই হনুমান রোডে। সেখানে সোজা চলে যান। আমি ভাল করে পরীক্ষা করে তবে ছাড়ব।"

অগত্যা সোলন যাওয়ার ব্যবস্থা স্থগিত রাখিয়া আমি সোজা হনুমান রোডে ডাঃ জে, কে, সেনের বাড়ী চলিয়া গেলাম। পানু ও বুনি স্টেশনে চলিয়া গেল মালপত্র এবং সঙ্গীয় সকলকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য। পথে শ্রীযুক্ত আগরওয়ালজীর সহিত দেখা করিয়া পানু সব কথা বলিয়া গেল। তাঁহার মত ভদ্রলোক সচরাচর দেখা যায় না। আজ আমাদের না যাওয়াতে তিনি বিন্দুমাত্র মনঃক্ষুণ্ণ না হইয়া বরং আনন্দই প্রকাশ করিলেন যে আমরা এখানে কয়েকদিন থাকিতেছি। তিনি নিজে পানুর সঙ্গে মোটরে গিয়া স্টেশন হইতে সমস্ত মালপত্র হনুমান রোডের বাসায় পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করিলেন। রাত্রি প্রায় দশটার পর সকলে মালপত্র লইয়া আসিলেন। আমার শরীর উপলক্ষ্য করিয়া যে সকলকে কতভাবে বিব্রত করিতেছি তাই ভাবি।

আগামী কাল ভোরেই কালকা পৌঁছিবার কথা। যোগীভাই সিমলা হইতে ambulance আনাইয়া কালকা স্টেশনে রাখার ব্যবস্থা করিয়াছেন। হনুমান রোডের বাসায় পৌঁছিয়াই যোগীভাইকে ফোন করিয়া সংবাদ দেওয়া হইল যে আজ রওনা হইতেছি

না। শুনিলাম সোলনে নাকি খুবই ঝড়-বৃষ্টি হইতেছে। যোগীভাই বলিয়াছেন এইরূপ আবহাওয়ার মধ্যে না যাইয়া ভালই হইয়াছে। ভগবান যাহা করেন তাহাই মঙ্গলের জন্য।

ডাঃ সন্তোষ সেন বলিয়াছেন যে আমার নূতন X-ray plates দেখিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলে plaster খুলিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিবেন। তাঁহার এই কথা শুনিয়া স্বভাবতঃই একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলাম যে এই অবস্থায় আমাদের কি করা কর্ত্তব্য। মার নির্দ্দেশ একান্ত প্রয়োজন। তাহা ছাড়া ডাঃ সেন মাকেও একবার সত্বর দিল্লীতে আনার কথা বলিয়াছেন। মার পা'টি একবার ভাল মত পরীক্ষা করা দরকার। সুতরাং সবদিক বিবেচনা করিয়া আজ রাত্রেই কুসুমকে মার নিকট সমস্ত কথা বলিবার জন্য বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। টিহরীর রাজমাতা তাঁহার গাড়ী সঙ্গে দিয়া দিলেন মা যদি আসেন।

১২ই এপ্রিল, ১৯৫৫

সকাল ৯টার পরে ডাঃ সন্তোষ সেনের নির্দ্দেশ মত আমাকে ambulanceএ করিয়া ডাঃ বেদপ্রকাশের চেম্বারে নিয়া যাওয়া হইল। শুনিলাম তিনি দিল্লীর একজন প্রসিদ্ধ X-ray specialist তিনি আমার চারটি প্লেট নিলেন। বেলা প্রায় এগারটা নাগাদ বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

আমরা আশা করিতেছিলাম যে মা হয়ত আজ সকালেই রাজমাতার গাড়ীতে বৃন্দাবন হইতে আসিবেন অথবা কুসুমকেই গাড়ী দিয়া ফেরৎ

পাঠাইয়া দিবেন। বেলা প্রায় তিনটার সময় বৃন্দাবন হইতে কুসুমের টেলিগ্রাম আসিল যে ডাঃ মল্লিকের সম্মতি হইলেই মা দিল্লী আসিতে পারেন। বুঝিলাম মার আসা অনির্দ্দিষ্ট। তবে গাড়ী ও কুসুমকে ফেরৎ পাঠাইয়া দেন নাই তাই আশা যে মা হয়ত আসিবেন।

সন্ধ্যাবেলা ডাঃ সন্তোষ সেনের Nursing Home হইতে পঙ্কজদা ফোন করিয়া জানাইলেন যে আগামী কাল আমার জন্য একটি spinal brace এর মাপ নিতে লোক আসিবে। আমার plaster তিনি খুলিয়া ফেলিতে চান।

১৩ই এপ্রিল, ১৯৫৫

বেলা প্রায় দশটা নাগাদ মা হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শুনিলাম মা অনেকক্ষণ হয় দিল্লী পৌঁছিয়া সোজা আশ্রমে গিয়া কুসুম প্রভৃতিকে এবং জিনিষ পত্র সব নামাইয়া আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন।

দিল্লীতে তিন দিন।

ডাঃ মল্লিককে মা অনেক করিয়া বুঝাইয়া তবে আসিয়াছেন। অবশ্য তিনি মার নিকট হইতে কথা নিয়াছেন যে মা bandage খুলিয়া ফেলিবেন না এবং এখনই হাঁটা চলা করিবেন না। ডাক্তার যাহা বলিয়াছেন মা তাহাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেছেন।

আমাকে ট্রলিতে করিয়া মার মোটরের নিকট লইয়া যাওয়া হইল। ইতিমধ্যে ডাঃ বলরামকে ফোন করায় তিনিও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মা এখানে ঘণ্টাখানেক থাকিয়া পুনরায় আশ্রমের দিকে রওনা হইলেন। ডাঃ বলরাম, পানু ও পুষ্প গেল। পানু দুপুর বেলা আশ্রম হইতে

ফিরিয়া আসিলে তাহার মুখে শুনিলাম যে মা পথে এক স্থানে গাড়া দাঁড়া করাইয়া একান্তে ডাঃ বলরামের সঙ্গে আমার চিকিৎসা সম্পর্কে বিস্তারিত আলাপ করিয়াছেন। আরও শুনিলাম যে কাল সকালে ডাক্তার বলরামের ব্যবস্থা মত মার পায়ের X-ray লওয়া হইবে এবং তাহার পরে ডাঃ সন্তোষ সেনকে দেখান হইবে।

মা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে ডাঃ সন্তোষ সেনের সহিত এমন ভাবে কথা বলিতে হইবে যাহাতে তিনি কোনও ভাবে দুঃখিত না হন। মোট কথা আমি উপস্থিত যখন বম্বের ডাক্তারদের চিকিৎসাধীন আছি তখন তাঁহাদের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া হঠাৎ plaster খুলিয়া ফেলা এবং চিকিৎসার পরিবর্ত্তন করা বোধ হয় ঠিক হইবে না।

সন্ধ্যাবেলা পঙ্কজদাকে সঙ্গে লইয়া পানু ডাঃ সন্তোষ সেনের সঙ্গে কথা বলিতে গেল। আসিলে শুনিলাম যে তিনি মোটেও দুঃখিত হন নাই বরং আনন্দের সহিত বলিয়াছেন বম্বেতে সকল কথা অবিলম্বে জানাইয়া দিতে। নূতন plates দেখিয়া তিনি বলিয়াছেন যে মূল রোগ এখন আমার নাই বলিলেই হয়। সুতরাং তাঁহার মত যে এখন plaster খুলিয়া ফেলিয়া spinal brace ব্যবহার করিয়া হাঁটাচলা করা উচিত।

রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটায় পানু ও পুষ্প ফিরিয়া আসিলে শুনিলাম যে মার নিকট সন্ধ্যাবেলা বহু লোক একত্রিত হইয়াছিলেন। টিহরীর রাজমাতা আজ রাত্রিটা মার কাছেই থাকিতেছেন।

১৫ই এপ্রিল, ১৯৫৫

সকাল ঠিক ৮টার সময় মা এখানে আসিয়া পৌছিলেন।

আজকেও আমাকে ট্রলিতে করিয়া মোটরের নিকটে নিয়া যাওয়া হইল। প্রায় সোয়া নয়টার সময় মা ডাঃ বেদপ্রকাশের কাছে X-rayর জন্য চলিয়া গেলেন। তাহার পর মা সোজা আশ্রমে চলিয়া গেলেন।

সকাল সাড়ে দশটায় মাকে ডাঃ সীতা সেনের নিকট নিয়া যাওয়া হইল। কিন্তু তিনি পরীক্ষা করার পরে মতামত কিছুই প্রকাশ করিলেন না। ডাঃ সেনের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা স্থির হয় বলিবেন।

আগামী কাল বৎসরের প্রথম দিন। সেই জন্য মা যাহাতে আজ রাত্রিটা এখানেই থাকেন সেজন্য প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম। সন্ধ্যার পর মা আসিয়া পৌঁছিলেন। আজ রাত্রে ডাঃ সন্তোষ সেন মার পা দেখিতে আসিবেন এইরূপ কথা ছিল। কিন্তু তিনি রাত্রে আর সময় করিয়া আসিতে পারিলেন না। রাত্রে টিহরীর রাজমাতা, মিসেস্ রাজেন নেহরু এবং নেপালের রাজপরিবারের মহিলারা যাঁহারা বৃন্দাবন গিয়াছিলেন তাঁহারা সব মার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন।

১৫ই এপ্রিল, ১৯৫৫ (১লা বৈশাখ, ১৩৬২ বাং)

মা আজ দিন-রাত্রি এখানেই থাকিবেন স্থির হইয়াছে। কাল সকালে এখান হইতে সোজা বৃন্দাবন যাওয়ার কথা।

বেলা প্রায় সাড়ে তিনটা নাগাদ ডাঃ সন্তোষ সেন মাকে দেখিতে আসিলেন। মার পা'টি ভাল মত পরীক্ষা করিয়া এবং নূতন

X-ray plates দেখিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করিলেন যে হাড়ে কোনও fracture নাই তবে খুব জোরে মচকাইয়া যাওয়ায় হাড়টা একটু দুমড়াইয়া গিয়াছে।

আমাকেও দেখিয়া তিনি বলিলেন যে আমার সম্বন্ধে তাঁহার মতামত তিনি ডাঃ বালিগাকে* লিখিয়া জানাইবেন। সেই সঙ্গে নূতন platesগুলিও বম্বেতে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

আজ সকালেও নেপালের পরিবারের অনেকে এবং মিসেস্ নেহরুও আসিয়াছিলেন। তাঁহার পুষ্পর গান বিশেষ ভাল লাগিয়াছে। কিন্তু আজ রাত্রেই পুষ্পর সোলন রওনা হইবার কথা হইয়াছে। মিসেস্ নেহরু মাকে অনুরোধ জাইাইলেন যে আজ রাত্রিটা পুষ্প থাকিয়া যাইতে পারে কিনা। কিন্তু মার খেয়াল আজই তাহারা রওনা হইয়া যায় তাই আর পরিবর্ত্তন করা হইল না। তাঁহাকে বলিয়া দেওয়া হইল তিনি সন্ধ্যা আটটার মধ্যে আসিলে পুষ্পর গান শুনিতে পারেন।

সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত যুগল কিশোর বিড়লাজী মার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। মিসেস্ নেহরু আসিতে বিশেষ দেরী করিয়া ফেলিলেন। যাহাই হউক সংক্ষেপে ২।১টি গান শুনাইয়া পুষ্প রওনা হইয়া গেল। রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত বহু লোক মার ঘরে বসিয়াছিলেন। পরে বিশ্রামের জন্য মার ঘরের দরজা বন্ধ করা হইল।

আজ সকালে চিলির রাজদূত মার সঙ্গে দেখা করিতে

---

* ডাঃ এ, ভি, বালিগা—বম্বের একজন অতি প্রসিদ্ধ সার্জ্জন।

আসিয়াছিলেন। ইনি মার পূর্ব্ব পরিচিত। মার নিকট অনেকবার আসিয়াছেন। ভদ্রলোকটির বয়স খুব বেশী না। তিনি মনে করেন পূর্ব্ব জন্মে ভারতেই কোনও সংবংশে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। স্বভাবটি খুব সুন্দর এবং সৎভাবাপন্ন।

মাতৃ সকাশে চিলির রাজদূত।

১৬ই এপ্রিল, ১৯৫৫

ভোর প্রায় ৬টার সময় মা নরেশ কাশ্যপের গাড়ীতে বৃন্দাবন রওনা হইয়া গেলেন। মার কথায় বোঝা গেল যে ২০শে পর্য্যন্ত মা বৃন্দাবনেই আছেন। তাহার পর কোন দিকে যান এখনও কিছু বলিলেন না। আমারও injectionএর course ২০শে সম্পূর্ণ হইবে। এই কয়দিনের মধ্যে সোলনের আবহাওয়াও ভাল হইয়া যাইতে পারে।

বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্ত্তন।

কন্যাপীঠের মেয়ে গঙ্গা কাশীতে খুবই অসুস্থা। সাধনকে বলা হইয়াছে তাহাকে লইয়া সোলন চলিয়া যাইতে। কিন্তু মা যাইবার পূর্ব্বে বলিয়া গেলেন যে গঙ্গা যেন কমলের সঙ্গেই সোলন আসে এবং সাধন যেন সোজা বৃন্দাবন চলিয়া যায়। কাশীতে এই মর্ম্মে তারও করিয়া দেওয়া হইল।

কন্যাপীঠের মেয়ে গঙ্গার অসুস্থতা।

১৭ই এপ্রিল, ১৯৫৫

আজ ভোরে উঠিয়াই শুনিলাম সাধনের দুইখানি টেলিগ্রাম

আসিয়াছে যে সে আজই দিল্লী রওনা হইতেছে গঙ্গা সহ। আমরা ভাবিলাম যে আমার গতকালের তার বোধ হয় পায় নাই। তখনই কাশীতে ফোন করিয়া জানাইয়া দেওয়া হইল গঙ্গা যেন আজ রওনা না হয়।

রাত্রে নরেশ ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার হাতে মা চিঠি লেখাইয়াছেন। গতকাল সকালে বৃন্দাবন পৌঁছিয়াই মা সংবাদ পান যে গঙ্গার শরীরের অবস্থা ভাল না। তাই মা সাধনকে দিয়া অবিলম্বে তাহাকে পাঠাইবার জন্য জরুরী তার করাইয়াছিলেন। এদিকে আজ সকালে আমি যে তার করিয়াছি তাহা ঠিক হয় নাই বুঝিলাম। রাত্রিটা খুবই চিন্তায় কাটিল।

১৮ই এপ্রিল, ১৯৫৫

খুব ভোরে পানুকে বলিলাম এই সকল সংবাদ সহ বৃন্দাবন গিয়া মাকে বলিবার জন্য। কিন্তু পানু ঠিক যাইতে ইচ্ছুক না হওয়ায় আবার কাশীতে ফোন করিয়া দেওয়া হইল যে মার নির্দ্দেশ মত গঙ্গাকে যে ভাবেই হউক যেন এখানে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

সন্ধ্যাবেলা তার আসিল যে গঙ্গারা আগামী কাল সকালে পৌঁছিতেছে। মা পূর্ব্বেই বলিয়া গিয়াছিলেন যে গঙ্গাকে যেন কালকাজীতে রাখা হয়। গঙ্গা এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়াছে। পরীক্ষার পূর্ব্ব হইতেই তাহার শরীরটা ভাল যাইতেছিল না। ডাক্তারেরা পরে ভাল মত পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে তাহার lungsএ infection আছে এবং অবস্থা খুব আশাপ্রদ না। মেয়েটি

খুবই কর্ম্মঠ, চতুর এবং সেবাপরায়ণ ও গানে পারদর্শী—স্বাস্থ্যও তাহার সাধারণ মেয়েদের অপেক্ষা অনেক ভাল। হঠাৎ তাহার এই রোগে আক্রান্ত হওয়াতে আমরা সকলেই যেন হতভম্ব হইয়া গিয়াছি। তাহার শরীরে এই রোগের স্থত্রপাত আমরা কখনও বুঝি নাই। এদিকে ডাক্তাররা বলিতেছেন যে রোগ অন্ততঃ ৫।৬ মাস পূর্ব্ব হইতেই হইয়াছে।

১৯শে এপ্রিল, ১৯৫৫

সকালে জনতা এক্সপ্রেসে যোগেশদা গঙ্গা ও গিরিবালাদিকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া পৌঁছিলেন। পানু ambulanceএর ব্যবস্থা করিয়া গঙ্গাকে স্টেশন হইতে আশ্রমে লইয়া গেল। আমার সঙ্গে দেখা হইল না। শুনিলাম গঙ্গা অসম্ভব দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে।

বিকালবেলা গঙ্গার সব plates এবং reports সহ ডাক্তার বলরামের সঙ্গে পানু পরামর্শ করিয়া আসিল। সব দেখিয়া শুনিয়া তিনিও কাশীর ডাক্তারদের মতই সমর্থন করিলেন। অবস্থা এখন অনেকটা কঠিন। পূর্ব্বে ধরা পড়িলে এমন আশঙ্কার কারণ থাকিত না।

বিকালে বুনি ও রেণু আশ্রমে গিয়া গঙ্গাকে দেখিয়া আসিল।

২০শে এপ্রিল, ১৯৫৫

আজ সকালে ডাঃ বলরামকে লইয়া পানু আশ্রমে গেল। তিনি

গঙ্গাকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া ঔষধ ও ইঞ্জেক্সনের বিধান দিয়া আসিয়াছেন।

এলাহাবাদ হইতে বিন্দু ও সুবোধ আজ এখানে আসিয়াছে। সুবোধ ও পানু আজই বৃন্দাবন রওনা হইয়া গেল। পানুকে মাও একবার বৃন্দাবন ঘুরিয়া আসিতে বলিয়াছিলেন।

বিন্দু দিল্লীতেই রহিয়া গেল। New India Assurance Co. তে তাহার চাকুরী হইয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে কাশীতে একবার তাহাকে দেখিয়া শ্রীযুক্ত বি, কে, শাহর বিশেষ পছন্দ হইয়াছিল। তখনই তিনি শ্রীযুক্ত আগরওয়াল সাহেবকে বলিয়া যান যে বিন্দুকে যেন তাঁহাদের কোম্পানীতে আনিবার চেষ্টা করা হয়। তাহার পর গতবার তিনি যখন বৃন্দাবনে আসেন তখন বিন্দুকে টেলিগ্রাম করিয়া আনাইয়া তাহার সঙ্গে চাকুরীর কথাবার্ত্তা পাকা করিয়া লইয়াছিলেন। বিন্দু বর্ত্তমানে এলাহাবাদ হাইকোর্টে practice করিতেছিল। কিন্তু শ্রীযুক্ত বি, কে, শাহ তাহাকে একরকম তুলিয়া নিয়া আসিয়াছেন। লোক মুখে শোনা যায় লোক বুঝিয়া নির্ব্বাচন করার ক্ষমতা তাঁহার অসাধারণ।

২১শে এপ্রিল, ১৯৫৫

আজ খুব ভোরে মার কাছ হইতে পানু ফিরিয়া আসিয়াছে। শুনিলাম আজই রাত্রে মা কান্তিভাইকে গঙ্গা সহ সোলন রওনা হইয়া যাইতে বলিয়াছেন। আমাকেও আগামী পরশু রওনা হইবার ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন যদি reservation পাওয়া যায়। মা কবে যাইবেন

তাহা কিছুই বলেন নাই। তবে পানুকে একান্তে বলিয়া দিয়াছেন আজই রাত্রে একটি মোটর বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিতে। ইচ্ছা হইলে মা যে কোনও সময়ে চলিয়া আসিতে পারেন।

শুনিলাম মা দিনের বেলা বলিতে গেলে কিছুই খান না। একটু ফল ও দই মাত্র খাইয়া থাকেন। রাত্রি ৯টার পর মহাপ্রভুর ভোগের পরোটা ও তরকারী একটু খান। তবে এমনি খুব হাসিখুসীই আছেন। পায়ের ব্যথা অনেকটা কম তবে ফুলা এখনও কিছুটা আছে।

ডাক্তার মল্লিক নাকি গতকাল সন্ধ্যার পর মাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি এবার মার জন্য যাহা করিয়াছেন তাহাতে আমরা সকলেই বিশেষ কৃতজ্ঞ। তবে তাঁহারাও সপরিবারে এই উপলক্ষে মার কৃপা পাইয়াছেন। মা ডাঃ মল্লিককে একটি পূজার আসন এবং দেবদেবীর কয়েকটি ছবি উপহার দিয়াছেন। তিনি নিজেও মার কয়েকটি ভাল ভাল ছবি নিয়া গিয়াছেন।

ডাক্তার মল্লিক মাকে গত পরশু হইতেই কাহাকেও ধরিয়া ধরিয়া একটু হাটিবার জন্য বলিয়াছেন। মা তাই গতকাল সকালে এবং সন্ধ্যায় কয়েক পা হাটিয়াছেন। ডাঃ মল্লিকই প্রথম দিন বলিয়াছিলেন যে ২১ দিন পর মা হাঁটিতে পারিবেন। তাঁহার কথা মা এইভাবে পূর্ণ করিয়াছেন। গতকাল ২১ দিন পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। শুনিলাম ডাঃ মল্লিক আগের bandage খুলিয়া খুব হালকা করিয়া বাঁধিয়া দিয়াছেন।

ব্রহ্মচারী কান্তিভাই গঙ্গা ও গিরিবালাকে লইয়া আজ রাত্রের গাড়ীতে সোলন রওনা হইয়া গেল। আমার জন্যও রিজার্ভেশন ২৩শে হইয়া গিয়াছে শ্রীযুক্ত আগরওয়ালজী সংবাদ দিয়া গেলেন।

রায়বাহাদুর নারায়ণ দাসজী আজ শেষ রাত্রে মার জন্য মোটর নিয়া বৃন্দাবন যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন। রাত্রি প্রায় নয়টার সময় বৃন্দাবন হইতে ফোন আসিল যে গাড়ী এখনও কেন পৌঁছে নাই। মার আগামীকাল ভোরেই দিল্লী আসার কথা। নারায়ণ দাসজীকে তৎক্ষণাৎ ফোন করিয়া দেওয়া হইল। তিনি মধ্যরাত্রেই গাড়ী লইয়া রওনা হইয়া গেলেন।

২২শে এপ্রিল, ১৯৫৫

আজ সকাল ৯টা নাগাদ মা এখানে আসিয়া পৌঁছিলেন। সঙ্গে মাত্র স্বামী পরমানন্দজী ও দিদিমা। দিদিমা আমার নিকটে রহিলেন। মা কিছুক্ষণ বসিয়া আশ্রমে চলিয়া গেলেন।

বিকালে বৃন্দাবন হইতে মার সঙ্গীয় সকলে আসিয়া পৌঁছিল। বিভু প্রভৃতি ৬।৭ জনের আজই রাত্রে সোলন রওনা হইয়া যাওয়ার কথা। সন্ধ্যার পর মা হনুমান রোডে আসিলেন। রাত্রি প্রায় দশটায় ডাঃ সন্তোষ সেন মার পা'টি দেখিতে আসিলেন। ফুলা এখনও বেশ আছে। তিনি তাই বলিলেন হাঁটাচলা যেন বেশী না হয়। সন্তোষ বাবুর ব্যবহারে ও কথাবার্ত্তায় সত্যই আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। বুঝিলাম সময় না হইলে মানুষকে চেনা যায় না। যাইবার সময় তিনি মাকে বলিয়া গেলেন—"আপনি দিল্লী আসলে যেন খবর পাই।"

রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটার পর মা আশ্রমে শুইতে গেলেন। আশ্রম বহু দূরে—এত রাত্রিতে মোটরে যাইতে হইবে। কিন্তু এখানে

মার বিশ্রাম হয়ত ঠিক মত হইবে না তাই আমরাও আর বিশেষ কিছু বলিলাম না।

২৩শে এপ্রিল, ১৯৫৫

আজ রাত্রে মার সঙ্গে আমার সোলন রওনা হইবার কথা। বম্বেতে শ্রীযুক্ত বি, কে, শাহর নিকট টেলিগ্রাম করিয়া দেওয়া হইল। এই সংবাদে তিনি খুবই আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই। প্রথম হইতেই তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে মা ও আমি একত্রে সোলন যাই।

দিল্লী হইয়া সোলন যাত্রা।

কিন্তু মার পায়ে চোট লাগায় আমার সঙ্গে আসিতে পারিলেন না। এদিকে ঘটনাচক্রে আমিও দিল্লীতে আসিয়া আটকাইয়া পড়িলাম এবং শেষ পর্য্যন্ত একত্রেই যাওয়া হইতেছে। মাও শ্রীযুক্ত বি, কে, শাহকে চিঠি লেখাইয়াছেন—"ভাইর শুভ ইচ্ছা এতটা প্রবল ছিল যে শেষ পর্য্যন্ত মা দিদির সঙ্গেই যাইতেছেন।"

আজ আশ্রমে এবং হনুমান রোডে একজন মহারাষ্ট্রী ভদ্রলোক ডাঃ কিরি (Irwin Hospital এর Plaster Section এর ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার) আশ্রমে ও আমার এখানে ভোগ দিতেছেন। পূর্ব্বে তাঁহার সহিত আমাদের পরিচয় ছিল না। পরে তাঁহার ভাইর সহিত পরিচয় হওয়ায় তাঁহার সঙ্গেও জানাশুনা হইয়া গিয়াছে। আশ্রমে বহু লোক প্রসাদ পাইয়াছে।

আমাকে রাত্রি আটটার সময় স্টেশনে লইয়া যাওয়া হইল। স্টেশনে গিয়া দেখিলাম মা তাহার পূর্ব্বেই আশ্রম হইতে আসিয়া

গিয়াছেন। স্টেশনে বহু ভক্ত নরনারী মার দর্শনের জন্য আসিয়াছেন। রাত্রি দশটায় আমরা কালকা মেলে রওনা হইলাম।

২৪শে এপ্রিল, ১৯৫৫

সকাল প্রায় সাতটা নাগাদ কালকা স্টেশনে আসিয়া পৌছিলাম। যোগীভাইর সেক্রেটারী দেবী রামজী অ্যাম্বুলেন্স, মোটর ও বাস লইয়া আসিয়াছেন। মাকে চেয়ারে করিয়া বাহিরে লইয়া গিয়া মোটরে বসাইয়া দেওয়া হইল। আমি অ্যাম্বুলেন্সে এবং অন্যান্য সকলে বাসে রওনা হইল। সোলন পৌছিয়া দেখিলাম রাজাসাহেব আমাদের জন্য সমস্ত ব্যবস্থা সুন্দর মত করাইয়া রাখিয়াছেন।

২৫শে এপ্রিল, ১৯৫৫

আজ অক্ষয় তৃতীয়া—শুভদিন। মার নির্দ্দেশমত আজ সকাল হইতেই আমার Sun-rays treatment সুরু হইল। সকালে সূর্য্যের আলোতে আমাকে আধ ঘণ্টা বাহিরে শুইয়া থাকিতে হইবে। ডাক্তাররা বলেন ইহা নাকি আমার arthritis এর জন্য বিশেষ উপকারী। বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই এই চিকিৎসা শুরু হইবার কথা ছিল কিন্তু সুযোগ সুবিধার অভাবে তাহা হইয়া উঠে নাই।

সকালে রাজা সাহেব আসিয়া মার নিকট বসিয়াছেন। কথা-

প্রসঙ্গে বৃন্দাবনে মায়ের পায়ে চোট পাইবার কথা উঠিল। এলাহাবাদে পূজার সম্বন্ধেও মা বলিলেন যে পূজা যখন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে তখন নারায়ণ স্বামীজী আসিয়া জানাইলেন যে প্রতিমার পিছনের কাপড়ের সঙ্গে ছাদের কাপড়ের সংযোগ আছে। কাজেই ঘটে স্পর্শ দোষ আসিবে। তখন মা তাঁহাকে বলিলেন—"এখন আর উপায় নাই। পূর্ব্বে পরিবর্ত্তন করা উচিত ছিল।" সেবারও মারই পায়ে চোট লাগিল।

মার সম্বন্ধে নানা অলৌকিক কথা

মা কি কথায় আবার বলিতেছেন—"নিম্বার্ক আশ্রমে ঠাকুরের বিগ্রহ যখন দগ্ধ হইতেছিল তখনও এই শরীরটাকে একটি ছেলে (লম্বা লম্বা চুল) আসিয়া ইসারায় বলে যে মোহন্তজীর খাওয়া হয় নাই। তোমাদের আশ্রমে মহাপ্রভুর যেরূপ মূর্ত্তি হইয়াছে ঠিক সেইরূপ চেহারা। একই মাপ। পরে সেইমত ফলাহারী খাবার বানাইয়া মোহন্তজীর নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়।"

মা যোগীভাইকে হাসিয়া বলিলেন—"নিম্বার্ক আশ্রমে যখন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হয় তখন মোহন্ত সন্তদাস বাবাজী বিন্ধ্যাকূটে চিঠি দিয়াছিল এই শরীরটার দাদামশায় যেন সকলকে লইয়া উৎসবে বৃন্দাবনে আসেন। এই শরীরটার কিন্তু তখনই খেয়াল হইয়াছিল যে তাহারা সকলে গেল কিন্তু এই শরীরটাকে যাইতে বলিল না। পরে ঘটনাচক্রে যখন অগ্নিদাহ এবং আবার পুনঃ প্রতিষ্ঠাও হইল তখন এই শরীরটা বৃন্দাবনেই। নিম্বার্ক আশ্রমেও যাওয়া হইল। তখন সেই মূর্ত্তিকে ধরিয়া বলা হইল—'ঠাকুর, এই শরীরের প্রতিষ্ঠার সময় আসা হয় নাই বলিয়াই কি তোমার আজ অগ্নিদাহরূপ ধারণ করিতে হইল ?'

আবার বলিতেছেন—"দিদির ঢাকার বাসায় একবার মনসা পূজা হইল। সেবারও পূজায় কি একটা বিঘ্ন হইয়াছিল। পূজা স্থান হইতে শরীর যখন শাহবাগে ফিরিয়া আসে তখন পায়ের আঙ্গুলের একটি হাড় ভাঙ্গিয়া যায়।" এই ঘটনাটি অনেকেরই জানা আছে।

মা পুনরায় হাসিয়া বলিলেন--"এই শরীরের কাছে এমন ত নাই যে কোনও দেব-দেবী বিশেষ। সবই সমান।" মা এই বলিয়া চুপ করিলেন। আমরা বুঝিলাম যখনই যে দেব-দেবীর পূজায় ত্রুটি হইয়াছে তাহাই তিনি এইভাবে নিজ শরীরের উপর গ্রহণ করিয়াছেন। মার নিকট শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণবে কোন ভেদ নাই।

২৬শে এপ্রিল, ১৯৫৫

এখানে আসিয়া মার পূর্ণ বিশ্রামই হইতেছে। বাহিরের কোনই ভীড়ভাড় নাই। বিকালের দিকে কয়েকজন মার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। অধিকাংশ সময় মা আপন ভাবেই থাকেন। খাওয়া দাওয়া খুবই যৎসামান্য করেন। মা নিজে আমার খাওয়া শোওয়া সব কিছুর ব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন। দুপুরে যাহাতে আমার বিশ্রাম হয় সেজন্য ২-৪টা পর্যন্ত মা সকলকে মৌন থাকিতে বলিয়াছেন। রাত্রেও ১১টার পর যেন আর কোনও কথাবার্তা না হয়।

২৭শে এপ্রিল, ১৯৫৫

সন্ধ্যার পর মা বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছেন। বহির হইতে অনেকেই আসিয়াছে। আজ সকালে হিমাচল প্রদেশের চিফ্ সেক্রেটারী

সস্ত্রীক আসিয়া মার সঙ্গে কথা বলিয়া গিয়াছেন। মা তাঁহাদের কথা প্রসঙ্গে বলিতেছেন—"অশান্তি দুই রকম। দুনিয়ার কাজ করিয়া অশান্তি—আর পরম পথে অগ্রসর হওয়ার অশান্তি। এই অশান্তিই আবার শান্তির একমাত্র উপায়। তিনি যে শান্ত—আত্মা—ভগবান সেই উপলব্ধি হয়। পরম শান্তির জন্য অশান্তি হইলেই শান্তি পাওয়া যায়। নিত্য আনন্দও তাহাই।"

২৯শে এপ্রিল, ১৯৫৫

মার শরীরটা কিছুদিন ধরিয়াই এলোমেলো চলিতেছে। কোথাও যাওয়া-যাওয়ার খেয়াল চলিতেছে। পরশু দিন শুইয়া শুইয়া বলিতেছিলেন—"পায়ে চোট লাগিয়া সব গোলমাল হইয়া গেল। নতুবা একেবারে সোজা উত্তরকাশী চলিয়া যাওয়া হইত।" এই প্রকার কথা বলিলেই আমার বুক শুকাইয়া যায়। একে ত আমি প্রায় এক বৎসরের উপর শয্যাগত। মার কোন সেবায় লাগিতে পারি না। এই অবস্থায় মা দূরে চলিয়া যাইতে পারেন তাহা ভাবিতেও পারি না। গতকালও মা কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"দিদি, আমি যদি কোথাও ঘুরতে যাই তবে তোমার আদর্শের দিক দিয়ে মন খারাপ করা কি ঠিক?" আজ সকালে উঠিয়াও সেই প্রসঙ্গই চলিতেছিল।

৩০শে এপ্রিল, ১৯৫৫

আজ মা সকাল ১১টার পর ঘরের বাহিরে আসিলেন। পেটটিও ঠিক যাইতেছে না।

বিকালে অনেকেই আসিয়া মার ঘরে বসিয়াছেন। একজন ভদ্রলোক মেয়ে লইয়া আসিয়াছেন। রাজা সাহেব পরিচয় করাইয়া দিলেন—"ইনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের দপ্তরে কাজ করেন।" মা বলিলেন—"আসল বিশ্ববিদ্যালয়ের দপ্তর হওয়া উচিত কিনা? যেখানে কাজ করলে আর কর্ম্মবন্ধন বাড়ে না।"

মায়ের মুখে নানা কথা।

একটু পরে আবার বলিতেছেন—"আপনিই করে—আপনিই ফল পায়। আপনার ক্রিয়া দ্বারাই অভাব সৃষ্টি হয় আবার আপন ক্রিয়া দ্বারাই সেই অভাব দূর হয়। নিজেরই করা নিজের প্রকাশের জন্য। নিজেই বিষয় ভোগ করে—নিজেই আবার ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। মৃত্যু মানে slow poison. অমৃত-ভোজী হও বাবা—অমর-ভোজী। অমর পথে চলো—যেখানে মৃত্যু নাই ব্যাধি নাই। নিজেই নির্ব্বিষয়ের দিকে চলো। তাই করবে তাই পাবে।"

আবার একজন ভদ্রলোককে বলিতেছেন—"গৃহস্থ আশ্রম বলে না। সেবা বুদ্ধি থাকিলে তবে ভগবৎ সেবায় লাগা যায়। মোহ বুদ্ধিতে মৃত্যু প্রাপ্তি। তাঁহার বিধান বড়ই ভাল। সেইজন্যই বলি মহা-যাত্রা কর সকলে—যে যাত্রায় যাত্রা বন্ধ হয়। সময় যেন বৃথা নষ্ট না হয়। সব সময় নিজ চিন্তাতেই থাকা। মৃত্যু চিন্তা না করা। যাহার যাহা ভাল লাগে—রাম, কৃষ্ণ, শিব ও মা যে নাম ভাল লাগে। সেইজন্যই বলা হয় যেখানে নেই রাম সেখানেই ব্যারাম। রাম মানে আত্মারাম—শান্তস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আত্মস্বরূপ।"

"ভগবৎ ক্রিয়াই ক্রিয়া আর সব মৃত্যু পথের ক্রিয়া। আত্ম-চিন্তাই স্বগতির দিক। জগতের ক্রিয়ায় অরূপ প্রকাশ। হরি চিন্তা

ছাড়া আর যা কিছু সব বৃথা—অক্রিয়া। স্বক্রিয়াতে স্থিত হওয়াই কর্ত্তব্য।"

"মানুষ অভাব রূপেতে প্রকাশিত—অভাবের চিন্তাই করে—অভাবই প্রাপ্ত হয়। সুতরাং স্বভাবের চিন্তাই কর্ত্তব্য। নতুবা অভাব—অক্রিয়া—অগতি—দুর্গতি—মৃত্যু। নিজেতে নিজেই। যাতায়াত রূপে সব রূপে তিনিই। আমিই যে আত্মারাম। জ্ঞান রূপেতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। শুধু তুমিই—তুমিই—তুমিই। সমস্ত কিছুতে তুমিই। আবার তুমি স্বয়ংই। অনন্ত একমাত্র তিনিই—একমাত্র আমিই।"

একজন ভদ্রলোক সরকার হইতে পেন্সন পাইতেছেন। তাঁহার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে মা বলিতেছেন—"পিতাজী সেখানেও পেন্সন পাওয়া যায়। এই পেন্সনত শুধু শরীরের সঙ্গেই। কিন্তু ঐ পেন্সনের শেষ হয় না। তাঁহার কোন কৃপাতে পেন্সন হয়ে যায় সে কথা বলা যায় না। সেই কৃপাই চাইতে হয় যদি কিছু চাওয়া দরকার।"

আজকে মার বেশ বলার ভাব ছিল। কিন্তু সন্ধ্যার ভজন আরম্ভ হওয়ায় কথা বন্ধ হইল।

১লা মে, ১৯৫৫

দুপুরে আমার খাওয়ার পর মা আসিয়া কিছুক্ষণ ঘরে বসিলেন। মা যেন সকাল হইতেই কেমন একটু অন্য ভাবে আছেন। একটু বিশেষ গম্ভীর। কয়েকটি চিঠিপত্র লেখাইয়া প্রায় তিনটার সময়

শুইতে গেলেন। সন্ধ্যার সময় একটু বাহিরে বসিয়া মা আবার একান্তে গিয়া শুইয়া পড়িলেন।

সকালে একটি চিঠির জবাবে মা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কথা বলিয়াছেন। উড়িষ্যা হইতে রাজা প্রফুল্ল চন্দ্র ভঞ্জদেও, এম, পি, মার নিকট একখানি সুন্দর চিঠি লিখিয়াছেন। মা জবাবে বলিলেন —"তাঁহাকে ডাকা বৃথা যায় না। যতক্ষণ সারা না পাওয়া ততক্ষণ ডেকে যাওয়া। আপনাকে আপনিইত ডাকা। আপনিই আপনাকে পাওয়া। অখণ্ড ডাকায় যে অখণ্ডকেই পাওয়া। নিজের আত্মা-—প্রাণের প্রাণ সেই প্রিয়কেইত ডাকা। কতকাল ভোগকে ডাকিয়া ডাকিয়া ভোগ করিয়া আসা হইয়াছে-ত। যাঁহাকে ডাকিলে ত্যাগ ভোগের ডাকাডাকির দ্বন্দ্ব চলিয়া যায় সেই ডাকটি প্রিয় হওয়া চাই।"

৩রা মে, ১৯৫৫

সোলনে মার শুভ জন্মোৎসব।

আজ হইতে মার জন্মোৎসব সুরু। সকাল হইতেই চণ্ডীপাঠ, ভাগবৎ পাঠ, রামায়ণ পাঠ, লক্ষ শিব মন্ত্র জপ ইত্যাদি সুরু হইল। তাহা ছাড়া কীর্ত্তনাদিত আছেই।

সকালে মা উঠিলে লছমীজী একটি নূতন চাদর মাকে পড়াইয়া ভোগ দিলেন। আজ সকালে নানা স্থান হইতে অনেকেই আসিয়াছেন। আকাশের অবস্থা খুবই খারাপ। দুপুরের একটু আগে হইতেই মুষলধারে বৃষ্টি সুরু হইল। রাজা সাহেবের লোকেরা দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া কত সুন্দর করিয়া মণ্ডপ ও প্যাণ্ডেল সাজাইয়াছে।

কিন্তু বৃষ্টিতে সমস্তই নষ্ট হইবার উপক্রম। সকলেরই মনটা ক্ষুণ্ণ। মা কিন্তু হাসিতেছেন। রাজা সাহেবও আসিয়া অবাক্ হইয়া বলিলেন—"মাতাজীত হাসিতেছেন!" মার জন্মোৎসবের সময় প্রায়ই এইরূপ হয় আমরা দেখিয়া আসিতেছি।

বিকালে মা উঠিয়া বসিলে আমাকে নিয়া যাওয়া হইল। মার ঘরের দরজার পরদাগুলি ঠিক এক প্রকার না ইহা লইয়া বেশ কিছুক্ষণ হাসাহাসি চলিতে লাগিল। কোথায় প্রভেদ মা অনেককেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন কিন্তু কেহই বলিতে পারিতেছে না। ইহাতে মা মেয়েদের লইয়া অনেক রঙ্গরস করিতেছেন।

আলমোড়া হইতে শৈলেশ একটি দীর্ঘ কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়াছে মার জন্মদিন উপলক্ষে। ব্রহ্মচারী কুসুম সেইটি মাকে পড়িয়া শুনাইল। সান্ধ্যকীর্ত্তন সুরু হইলে মা গিয়া বাহিরে বসিলেন।

আজ এগারটা নাগাদ মা শুইয়া পড়িলেন কিছু সময়ের জন্য। বাহিরে সকলে মিলিয়া রাত্রি ৩টার পূজার আয়োজন করিতে লাগিল।

তিনটার পর মার দরজা খুলিয়া দেওয়া হইলে কুসুম গিয়া মার আরতি করিল। অনেকেই পুষ্পাঞ্জলী দিল। মা চুপচাপ পড়িয়াছিলেন। বাহিরে কীর্ত্তন চলিতেছিল। ভোর হইলে ছেলেরা সকলে মিলিয়া কীর্ত্তন সহ আশ্রম পরিক্রমা করিয়া আসিল।

৫ই মে, ১৯৫৫

আজ মা খুব ভোরেই বাহিরে আসিয়াছেন। ঘরের সামনে খোলা জায়গায় অনেকক্ষণ হাটিয়া আবার গিয়া ঘরে বসিলেন।

প্রায় দশটা নাগাদ কালকা হইতে শ্রীযুক্ত বি, কে, শাহ সপরিবারে আসিয়া পৌঁছিলেন। সেই সঙ্গে দিল্লী হইতে ডাঃ বলরাম, শ্রীযুক্ত আগরওয়ালজী সস্ত্রীক এবং বম্বে হইতে মিঃ মেহতাও আসিয়াছেন।

খাওয়াদাওয়ার পর মা আসিয়া আমার ঘরে অনেকক্ষণ বসিলেন। শ্রীযুক্ত বি, কে, শাহ প্রভৃতি অনেকেই বসিয়াছেন। কিছুক্ষণ পর তাঁহারা খাইতে বসিলে মা গিয়া নিজের ঘরে বসিলেন। খাওয়া শেষ করিয়া আবার গিয়া তাঁহারা মার ঘরে কিছু সময় বসিলেন। প্রায় আড়াইটা নাগাদ মা শুইয়া পড়িলেন। কিন্তু এক ঘণ্টা পরেই আগরওয়ালজী ও মেহতা আসিয়া মার সঙ্গে একটু কথা বলিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীযুক্ত বি, কে, শাহও আসিয়া মাকে প্রণাম করিয়া সিমলা রওনা হইয়া গেলেন। ডাঃ বলরামও আজ রাত্রে দিল্লী রওনা হইয়া গেলেন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মা গিয়া বারান্দায় বসিলেন। সেখানেই মার আরতি করা হইল।

৬ই মে, ১৯৫৫

প্রায় নয়টার সময় মার ঘরের দরজা খুলিলে আমাকে ভিতরে লইয়া যাওয়া হইল।

আজ সূর্য্যোদয় হইতে অখণ্ড নাম কীর্ত্তন সুরু হইয়াছে। দিল্লী হইতেও কয়েকজন আসিয়া যোগ দিয়াছে।

দুপুরে খাওয়ার পরে মা আসিয়া কিছুক্ষণ আমার ঘরে বসিলেন। চিঠিপত্র পড়া হইতেছে। হরপ্রসাদ ও ভরতভাইর চিঠি আসিয়াছে।

তাহারা দুইজনেই এখন মহর্ষী রমণের আশ্রমে আছেন। তাহাদের মা গত বৎসর আলমোড়া হইতে দক্ষিণ যাত্রায় পাঠাইয়াছিলেন। রমণাশ্রমে প্রায় ৪।৫ মাস থাকিয়া যাত্রা শেষ করিয়া আবার সেখানেই ফিরিয়া আসিয়াছে। যাত্রা সম্পূর্ণ করিয়া কাশীতে ফিরিয়া আসার কথা ছিল। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে গিয়া তাহাদের নাকি এত ভাল লাগিয়াছে যে তাহারা সেখানে আরও বেশ কিছুদিন থাকিতে চায়। ভরত ভাই খুবই শান্ত, স্থির, ধীর প্রকৃতির। হরপ্রসাদের উপরই মার বিশেষ দৃষ্টি—তাহার উপর মার অহৈতুকী কৃপা করুণা। দূরে সরিয়া যাইতে চাহিলেও মা কি কখনও তাহা দেন? তাহাকে মা কেন বিশেষ করিয়া লিখাইতেছেন না অবিলম্বে ফিরিয়া আসার জন্য এই লইয়া কুসুম মার নিকট একটু দুঃখ প্রকাশ করিতেছিল। মা হাসিয়া বলিলেন—"দূর কোথায়? সবইত একটা। এই শরীরের কাছেও আত্মানুভবের জন্যই আসাত। যেখানে আত্মোন্নতির অনুকূল হয় সেখানে থাকতে আপত্তি কি? যার যেখানে ভাল লাগে।"

মাকে কুসুম আবার প্রার্থনা জানাইল—"মা, আর একবার লিখে দেও আসবার জন্য।"

মা বলিলেন—"এখন কোনই খেয়াল আসছে না। কি করব?"

সন্ধ্যার পর সোলনের কলেক্টর সাহেব মাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। ইনি মার পূর্ব্ব পরিচিত। স্থকেতে মার দর্শন করিয়াছেন। পরশু বিকালে হিমাচলের গভর্ণর

মাতৃসকাশে হিমাচলের গভর্ণর

ভদ্রীর রাজা সাহেব মার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। ইনি বাল্যকাল হইতেই মার পরিচিত। অনেক সময়েই দেখা যায় যে আমরা হয়ত চিনি না কিন্তু

বহু উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদের এবং দেশের নেতৃবর্গের মধ্যে অনেকেই মার বিশেষ পরিচিত। কোথাও না কোথাও মার দর্শন লাভ করিয়াছেন। সেদিন আন্দামান হইতে জ্যোতি চিঠি লিখিয়াছে যে সেখানকার চিফ্ কমিশনারের সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে প্রকাশ পাইয়াছে যে তিনিও মার সহিত খুবই পরিচিত। পণ্ডিত জওহরলালজী, ডাঃ কাটজু, শ্রী কে, এম, মুন্সি, ইন্দিরা গান্ধী প্রভৃতিও যে মার সহিত বিশেষভাবে পরিচিত তাহা অনেকেই জানেন না। মহাত্মা গান্ধীজী যে মাকে কত স্নেহ করিতেন, আদর সম্মান দিতেন, কমলা নেহেরু মাকে কিরূপ গুরুর মত ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন, যমুনালাল বাজাজ যে মার নিকট থাকিয়া কি প্রকার শান্তি লাভ করিয়াছিলেন, সরোজিনী নাইডু, সর্দ্দার প্যাটেল, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র প্রভৃতি যে মাকে কিরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন তাহা আশ্রমের পক্ষ হইতে কখনও propaganda করা হয় না। মায়ের নিকট ধনী দরিদ্রে কিছুই পার্থক্য নাই। মায়ের কৃপা সকলের উপর সমভাবে বর্ষণ হইতেছে। অসংখ্য রাজা মহারাজাদের মার নিকট সর্ব্বদা আসা যাওয়া দেখিয়া অনেক সময় কেহ কেহ সমালোচনা করেন—"মা ত রাজ-রাজড়ার মা!" ইহাও আমরা শুনি—জানি। কিন্তু যাহারা না জানিয়া এইরূপ অন্যায় উক্তি করে তাহার জন্য আমাদের ক্রোধ হয় না—দুঃখ অনুকম্পাই হয়। তাহারাত জানে না যে মার সংস্পর্শে আসিয়া কত বড় বড় লোকের কত অসৎ চরিত্রের স্বভাব চরিত্রের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মায়ের কৃপা যে কিভাবে ধীরে ধীরে ভিতরে ভিতরে ক্রিয়া করিয়া যায় তাহা যাঁহারা মরমী ভক্ত তাঁহারাই অনুভব করেন মর্ম্মে মর্ম্মে—তাঁহাদের জীবনের প্রতিটি কর্ম্মে।

সূর্য্যাস্তের পর অখণ্ড কীর্ত্তন সমাপ্ত হইল। কিন্তু মেয়েদের আগ্রহ

তাহারা সারারাত্রি কীর্ত্তন চালাইবে। তাহারা মাকে বিশেষ করিয়া প্রার্থনা জানাইয়াছে যে মা যেন মাঝে মাঝে একটু দর্শন দেন। রাত্রি প্রায় একটার পর মা একটি ছাপা চাদর গায়ে জড়াইয়া ঘোমটা দিয়া বৌ সাজিয়া কীর্ত্তনের স্থানে গিয়া বসিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই সকলে মাকে চিনিয়া ফেলিল। মা নিজেও বেশ কিছু সময় কীর্ত্তন করিলেন। আবার ভোর সাড়ে চারিটার সময় একবার বাহিরে আসিলেন। বাহিরে বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া এবং বৃষ্টিও পড়িতেছে। মার নির্দ্দেশ মত কীর্ত্তন বারান্দায় আনা হইল। মা আবার কীর্ত্তনে যোগ দিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন। প্রায় ছয়টা নাগাদ কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে মা বাতাসা লুট দিতে লাগিলেন এবং সকলকে নিজ হাতে করিয়া হালুয়া প্রসাদ বিতরণ করিলেন। মেয়েদের রাত্রি জাগরণ ও কার্ত্তনের পরিশ্রম যেন সার্থক হইয়া গেল।

৭ই মে, ১৯৫৫

সকালে আরতির একটু আগে মার দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। ঘরে লোক ভরিয়া গেল। সিমলা হইতে Controller of Insurance শ্রীরাজাগোপালন সস্ত্রীক মার দর্শনের জন্য আসিয়াছেন। একটু পরে মার ঘরটি খালি করিয়া দেওয়া হইল। মা মুখটি ধুইয়া আবার আমার ঘরে আসিয়া বসিলেন। অনেক সুন্দর সুন্দর কথা হইল। একটি টেপ রেকর্ডের অভাব বড়ই বোধ হইতেছে।

খাওয়ার পরে মা আবার নিজের ঘরে গিয়া বসিলেন। অনেকেই আসিয়া মার সঙ্গে কথা বলিলেন। বেলা প্রায় তুইটায় সকলে ঘর

হইতে বাহির হইয়া আসিল। মা একটু চুপচাপ শুইয়া পড়িলেন। বেলা ৩ টায় আবার শ্রীযুক্ত বি, কে, শাহ শ্রীরাজাগোপালনকে লইয়া মার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। শ্রীরাজাগোপালন আজই সিমলা যাইতেছেন।

গতকাল মার নিকট টেলিগ্রাম আসিয়াছে যে কলিকাতায় সরোজ দাদা * খবই অসুস্থ। বিকালে মা একবার জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাঁহার কোনও সংবাদ আসিয়াছে কিনা। একটু পরেই আবার বলিলেন "জন্ম মৃত্যুত আছেই।" কুসুম ও পানু মার ঘরেই দাড়াইয়াছিল। তাহারা বলিল যে তবে বোধ হয় সরোজ বাবুরই কিছু হইয়াছে। মা শুনিয়া বলিলেন—"কে জানে ? তবে কোথাও কিছু হয়েছে। দেখ কবে খবর আসে। অনেক সময় ত ছয় মাস পরেও সংবাদ পাওয়া যায়।"

বিকালে রাজা সাহেব আসিয়া সংবাদ দিলেন অবধূতজী মহারাজ আজ রাত্রেই আসিতেছেন। তিনি আম্বালা আসিয়া ফোন করিয়াছেন মোটর পাঠাইবার জন্য। রাজা সাহেব তখনই মোটর পাঠাইয়া দিয়াছেন।

৮ই মে, ১৯৫৫

মার শরীরটা ভাল না। সকালে আরতির একটু পরে গিয়া বারান্দায় বসিলেন। একটি মেয়ে মাকে গান শুনাইল। অবধূতজীও মার সঙ্গে দেখা করিয়া গেলেন।

---

* মায়ের পুরাতন ভক্ত কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ অ্যাটরণী শ্রীসরোজেন্দ্র নাথ দত্ত।

বেলা প্রায় ১২ টার সময় অবধূতজী গিয়া মার ঘরে বসিলেন। নানা কথা চলিতেছিল। প্রায় আড়াইটার সময় মার বিশ্রাম করিবার জন্য দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

বিকালে রাজাসাহেব দরিদ্রনারায়ণ ভোজনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনটার পর মাকে চেয়ারে বসাইয়া উপরে লইয়া যাওয়া হইল। রাস্তার দুই পার্শ্বে দরিদ্রনারায়ণেরা খাইতে বসিয়াছে। মা তাহার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। অনেক ছবিও তোলা হইল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে হিমাচল প্রদেশের চিফ্ সেক্রেটারী ও তাঁহার স্ত্রী মার সঙ্গে কথা বলিলেন। তাহার পর শ্রীযুক্ত বি, কে, শাহ এবং লীলাবেনও কথা বলিলেন। পৌনে সাতটায় মা গিয়া প্যাণ্ডেলে বসিলেন। মার আরতির পর শ্রীঅবধূতজীর ভাষণ সুরু হইল। ভাষণ সমাপ্ত হইলে সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত মার সঙ্গে নানা কথাবার্ত্তা চলিল।

রাত্রে আজ মার শুইতে প্রায় একটা বাজিয়া গেল।

৯ই মে, ১৯৫৫

সকালে প্রায় সাড়ে নয়টায় মার দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। আরতির পরে অবধূতজীকে লইয়া মা আমার ঘরে আসিয়া বসিলেন। ঘরটা একটু খালি করিয়া দেওয়া হইল। সামান্য কয়েকজন মাত্র ঘরে রহিলেন। বৃন্দাবনে এবার মার পায়ে চোট লাগার রহস্যের কথা হইতেছিল।

মার জন্মতিথি উপলক্ষ্যে আজ ১০৮ কুমারী সেবার ব্যবস্থা হইয়াছে। মার ঘরের বারান্দায় কুমারীরা সকলে খাইতে বসিয়াছে।

মাও গিয়া তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইলেন। লছ্মীজী সকলকে জড়ি লাগান ওড়না পড়াইয়া দিলেন। মাকেও তিনি কুমারীদের মতই একটি চাদর গায়ে দিয়া দিলেন। কুমারীদের যাহা যাহা ভোজন মাকেও একটি পাতায় করিয়া তাহা সব সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মার মুখে একটু দিয়া দিলে মা নিজেই তাহা সকলের মধ্যে বিতরণ করিতে লাগিলেন। একটি বাচ্চা কুমারীর পাতের সামনে মা বসিয়া মুখ হাঁ করা মাত্র সেও তাহার পাতা হইতে বাঁ হাতে করিয়া মার মুখে একটু কিছু দিয়া দিল। মার এই লীলা দেখিয়া আমরা অবাক হইলাম।

কুমারী ভোজনপর্ব্ব শেষ করিয়া মা গিয়া ঘরে বসিলেন। কানপুর হইতে জিতেন মুখার্জ্জী আসিয়াছেন। তিনি মার সঙ্গে কিছু কথা বলিবেন। শুইতে শুইতে মার সাড়ে তিনটা বাজিয়া গেল। বেলা পাঁচটার সময় শ্রীযুক্ত বি, কে, শাহ আসিয়া মার ঘরে বসিলেন। তিনি আজই বম্বে রওনা হইয়া যাইতেছেন। ধীরে ধীরে আরও অনেকেই আসিয়া বসিলেন। আরতির কিছু পূর্ব্বে মা গিয়া প্যাণ্ডেলে বসিলেন। গতকালের মত সৎসঙ্গ সুরু হইল।

মৌনের পর অবধূতজীকে লইয়া মা আসিয়া ঘরে বসিলেন। এ পর্যান্ত টেপ্ রেকর্ডারে যাহা কিছু রেকর্ড করা হইয়াছে তাহা আজ অবধূতজীকে শুনান হইল। রাত্রি প্রায় দশটার পর অবধূতজী তাঁহার কুটিয়ায় চলিয়া গেলেন।

১০ই মে, ১৯৫৫

আজ মার শুভ জন্মতিথি উৎসব। এই উপলক্ষে সকলের মনেই

আজ একমাত্র প্রার্থনা যে মা আমাদের মধ্যে দীর্ঘদিন থাকুন। কাশী হইতে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ও একটি অতি সুন্দর চিঠিতে লিখিয়াছেন—"সত্যই যে অখণ্ড প্রকাশরূপিণী মা জগতে প্রকট হইয়াছেন ইহাই যেন তাঁহার জন্মোৎসবের দিন আমরা স্মরণ করি। বস্তুতঃ তাঁহার জন্ম কোথায়? স্বয়ং-প্রকাশরূপিণী এবার আড়াল ভাঙ্গিয়া নিজগুণে প্রকাশিত হউন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।"

চিঠিখানির মধ্যে আরও কয়েকটি সুন্দর সুন্দর কথা তিনি লিখিয়াছেন—"চির প্রকাশমান সত্য যেন আড়াল ভাঙ্গিয়া নিজ বলেই নিজেকে প্রকাশ করে—ইহারই প্রতীক্ষা। বস্তুতঃ সেখানে আড়াল কোথায়? আবার আড়াল গড়িয়াছেনও তিনি—ভাঙ্গিবেনও তিনি। আবার ভাঙ্গা-গড়ার অন্তরালে হাসিয়া খেলা খেলিতেছেনও তিনি। তাহা ছাড়া আড়ালেও তিনিই। এই আড়ালের দ্বারা যে কৃত্রিম গণ্ডী প্রকাশ হইয়াছে তাহা কি তিনি নন? সবই যে তিনি। সবের ঊর্দ্ধেও তিনি। তিনিই-ত তুমি। আবার তুমিই বা কে? আমিই-ত। আমি ছাড়া আর কি-ই বা আছে। আবার সেখানে আমিই বা কোথায়? মা, চোখের ঠুলি খুলিয়া দেও। বুঝার বোঝা সরাইয়া দেও। কথার পালা শেষ করিয়া দেও। মা-গুরু-নিজে সবই সেই একই স্বয়ং। আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে আর কতদিন জড়াইয়া থাকিব? তোমার জন্মদিন—সকলে উৎসব করিবে। আনন্দে জয়গান গাহিবে। কিন্তু একটি চির বিরহকাতর হৃদয় তোমার সেই মহা আবির্ভাবের দিকে তাকাইয়া আছে। যখন সে তোমাকে আমি বলিয়া চিনিতে পারিবে—চিনিয়া চমকিত হইবে। অতি পরিচয়ের মধ্যে অপরিচয়ের আড়াল আর কতদিন?"

কথাগুলি খুবই মর্ম্মস্পর্শী। আজ এই শুভদিনে আমাদেরও কায়মনোবাক্যে এই একই প্রার্থনা মায়ের শ্রীচরণে।

আজ সকাল হইতেই দিনের অবস্থা খুবই খারাপ। আকাশ ঘনমেঘাচ্ছন্ন। রাজাসাহেবের লোকেরা কত পরিশ্রম করিয়া সুন্দর করিয়া প্যাণ্ডেল বানাইয়াছে। শেষ দিনে সব কি নষ্ট হইয়া যাইবে?

সন্ধ্যার সময় হইতে মূষলধারে বৃষ্টি সুরু হইল। প্যাণ্ডেলের ভিতরে সমস্ত কিছু ভিজিয়া একেবারে একাকার। সন্ধ্যার সৎসঙ্গ তবু তাহার মধ্যেই সম্পূর্ণ হইল। সাড়ে নয়টার পর মা আসিয়া ঘরে বসিলেন। টিহরীর মহারাজা-মহারাণী প্রভৃতি অনেকেই আজ আসিয়াছেন। তাঁহারাও আসিয়া মার ঘরে বসিলেন।

রাত্রি প্রায় সাড়ে বারটার সময় মার দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। দুইটার পর মা একবার উঠিয়া এদিক ওদিক ঘুরিয়া আসিলেন। ঠিক পৌনে তিনটার সময় আমাকে মার ঘরে লইয়া যাওয়া হইল। আমি ও মেয়েরা পুষ্পাঞ্জলী দিলাম। টিহরীর মহা-রাজা-মহারাণী, আম্বের রাজা-রাণী এবং যোগীভাইও ফল-মিষ্টি ইত্যাদি ভোগ সাজাইয়া আনিয়াছেন। ওদিকে পূজার আয়োজন তৈয়ারী। যোগীভাই ধীরে ধীরে মাকে ডাকিয়া উঠাইলেন। মা এদিক ওদিক করিয়া উঠিয়া বসিয়া সলজ্জ মুখে বলিলেন—"ওখানে যেতে আমার লজ্জা করে।" মার মুখে এই নূতন কথা শুনিয়া আমরা হাসিয়া উঠিলাম। মা তাহাতে আবার বলিলেন—"বাঃ, আমার বুঝি লজ্জা করে না?" মার বালসুলভ এই কথায় আমাদের এত ভাল লাগিল যে তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। যোগীভাইর প্রার্থনায় অগত্যা মা বাধ্য হইয়া উঠিয়া প্যাণ্ডেলের দিকে চলিলেন।

অতি সুন্দর করিয়া কাপড় ও ফুলমালা দিয়া মার সিংহাসনটি সাজান হইয়াছে। সিল্কের শয্যা, ভেলভেটের বালিশ ইত্যাদি সব নূতন বানান হইয়াছে। সিংহাসনে উঠিবার জন্য ভেলভেটের পাদান পর্য্যন্ত নূতন বানান হইয়াছে। মা সেখানে গিয়াই একেবারে মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন। শুধু কপালটুকু বাহিরে দেখা যাইতে লাগিল।

জন্মতিথি পূজা।

প্রায় সাড়ে তিনটা নাগাদ কুসুম পূজা আরম্ভ করিল। অবধূতজীও আসিয়া মণ্ডপের এক পার্শ্বে বসিলেন। অপর পার্শ্বে সম্ভ্রান্ত কয়েকজন। মঞ্চের দুই দিকে চৌকীর উপর ১০৮ পদের ভোগ সাজান হইয়াছে। বাহিরে তখন খুব জোড়ে বৃষ্টি পড়িতেছে। সামিয়ানা ভিজিয়া ঝড় ঝড় করিয়া জল পড়িতেছে। তবু সকলে স্থির ভাবে বসিয়া পূজা দেখিতেছে।

১১ই মে, ১৯৫৫

সকাল সাড়ে চারটার পর পূজা সমাপ্ত হইলে ভোঁগ নিবেদন করা হইল। তাহার পর আরতি। ইহাতেই প্রায় সাড়ে পাঁচটা বাজিয়া গেল। সকলে যদি তখন প্রণাম করিতে সুরু করে তবে খুবই দেরী হইয়া যাইবে তাই মাকে তখনই ঘরে লইয়া আসা হইল। রাজা সাহেবই মাকে ঘর হইতে পূজার স্থানে নিয়া গিয়াছিলেন। আবার তিনিই মায়ের হাত ধীরে ধীরে ধরিয়া মাকে উঠিয়া আসিতে প্রার্থনা করিলেন। মায়ের তখন সম্পূর্ণ অন্য ভাব—দিব্য মূর্ত্তি। বাহ্য জ্ঞান আছে কিনা বুঝা মুস্কিল। চেয়ারে করিয়া মাকে যখন ঘরে লইয়া

আসা হয় মায়ের তখন রূপ যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। হাত জোড় করিয়া চক্ষু বন্ধ করিয়া বসিয়া। যেই সে রূপ দেখিয়াছে সে আর জীবনে উহা কখনও বিস্মৃত হইবে না।

ঘরে আনিয়া মাকে বিছানায় বসাইয়া দেওয়া হইল। মা স্থির ভাবে বসিয়া আছেন দেখিয়া আমি আস্তে আস্তে বলিলাম—"মা, শুইয়া পড় একটু।" মা শুধু একটু "হুঁ" বলিয়া আবার নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন। মা যেন এ লোকে নাই। আবার কিছুক্ষণ পরে মাকে শুইবার কথা মনে করাইয়া দিলাম। মা একটু পরে শুইয়া পড়িলেন। আমরাও সকলে ঘরটি খালি করিয়া দিলাম।

প্রায় সাড়ে নয়টার সময় রায়বাহাদুর চুণীলাল কাপুরের কন্যাজামাতা প্রণাম করিতে আসিলেন। তাঁহারা এখনই সিমলা চলিয়া যাইতেছেন। মার দরজা একটু খুলিয়া দেওয়া হইল। তাঁহারা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। প্রায় সাড়ে এগারটায় মা উঠিয়া বসিলে অনেকেই গিয়া মাকে প্রণাম করিল। 'আজ শ্রীযুক্ত বি, কে, শাহর স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের এখানে প্রসাদ নিতে বলা হইয়াছে। খাওয়া শেষ হইলে তাহারা গিয়া মার ঘরে কিছু সময় বসিল। তাহারা চলিয়া গেলে মা আবার শুইয়া পড়িলেন।

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে মার দরজা খুলিয়া দিলে অনেকেই মাকে প্রণাম করিতে ঘরে গেলেন। বহু স্ত্রী পুরুষ আজ নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে চলিয়া যাইতেছে। আজ সন্ধ্যার পরে সৎসঙ্গের ব্যবস্থা বারান্দায় করা হইয়াছে। অন্যান্য দিনের ন্যায় আজও অবধূতজী মহারাজ সাড়ে সাতটা হইতে সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত ভাষণ দিলেন। তাহার পর মা নিজেই একটু সময় কীর্ত্তন করিলেন। মৌনের পর হিমাচলের গভর্ণর, তাঁহার

স্ত্রী, রাজা-রাণীরাও আসিয়া মার ঘরে বসিলেন। মার শুইতে শুইতে রাত্রি প্রায় ১২টা বাজিয়া গেল।

১২ই মে, ১৯৫৫

ভোর সাড়ে পাঁচটায় মা উঠিয়া বসিয়াছেন। ব্রহ্মচারী কান্তিভাইকে হরিবাবাজীর নিকট পাঠান হইতেছে। মা তাহাকে সব কিছু বুঝাইয়া দিলেন। কিছু পরে অবধূতজীও মাকে প্রণাম করিয়া আম্বালা রওনা হইয়া গেলেন।

ঘরটি খালি হইলে মা আবার শুইয়া পড়িলেন। দশটার পরে কেহ কেহ আসিয়া প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। ১২টা পর্য্যন্ত বারান্দায় সৎসঙ্গ চলিল। খাওয়া দাওয়ার পরও কেহ কেহ আসিয়া মার ঘরে বসিলেন। মার আজ যেন শুইবার ভাবই নাই।

সন্ধ্যা আটটার পর মা গিয়া কীর্ত্তনে বসিলেন। আশ্রমের নিত্য কীর্ত্তন সমাপ্ত হইতে না হইতেই মা নিজে কীর্ত্তন ধরিলেন। মৌনের পরও সেই কীর্ত্তন সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত চলিল। রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত আজকেও রেকর্ড বাজান হইল। সকলে শুনিলেন।

১৩ই মে, ১৯৫৫

দশটার পর উঠিয়া চুপচাপ অনেকক্ষণ বিছানার উপরই বসিয়া আছেন। কথাবার্ত্তার খেয়াল যেন নাই। ধীরে ধীরে এই ভাবটি কাটিয়া গেলে মা আসিয়া বারান্দায় সৎসঙ্গে বসিলেন। লীলাবেন

ও তাঁহার ছেলে-মেয়েরা আজ সিমলা যাইতেছে কয়েকদিনের জন্য। সঙ্গে কোনও পুরুষ নাই তাই মা তাহাদের সঙ্গে পানুকে দিয়া দিলেন পৌঁছাইয়া আসিবার জন্য।

মণ্ডীর রাজা-রাণী মার বিশেষ ভক্ত। রাজাসাহেব আজকাল দক্ষিণ অ্যামেরিকার ব্রাজিল দেশে ভারতের রাজদূত। রাণী সাহেব লিখিয়াছেন যে আজ তাঁহাদের বিবাহের ২৪ বৎসর পূর্ণ হইল। মার তাই বিশেষ পূজা ও ভোগের জন্য টাকা পাঠাইয়াছেন।

বিশ্রাম করিতে করিতে মার অনেক দেরী হইয়া গেল। হরপ্রসাদের পুনরায় একখানা চিঠি আসিয়াছে। সেই চিঠির জবাব অনেক করিয়া লিখাইয়াছেন।

সন্ধ্যার পর মা গিয়া কীর্ত্তনে বসিলেন। কীর্ত্তন শেষে অনেকক্ষণ ধরিয়া মার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইল। সাড়ে নয়টার পর মা আসিয়া ঘরে বসিলেন। ঘরেও সঙ্গে সঙ্গে অনেকে আসিয়াছেন কথার জন্য। প্রায় এগারটার পর মার দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

১৪ই মে, ১৯৫৫

জন্মোৎসবের দিন এবার প্রচণ্ড বৃষ্টি হইয়াছিল। সেই প্রসঙ্গে কথা চলিতেছে। মা বলিলেন—"তোমাদের নষ্ট ত কিছুই হয় নাই। লাইট নষ্ট হইয়া যাইতে পারিত। প্যাণ্ডেল নষ্ট হইয়া যাইতে পারিত। তাহাও হয় নাই। শুধু তোমাদের বসিতে কিছু অসুবিধা হইয়াছে।" রাজাসাহেব মার কথা শুনিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, সেইটুকুই অপরাধ রহিয়া গিয়াছে।" আমরাও সকলে হাসিতে লাগিলাম।

এবারের মত পূর্ব্বেও এইরূপ ঘটনা আরও দেখিয়াছি। ঢাকার কথা উঠিল। একবার সেখানে জন্মোৎসবের দিন এমন প্রচণ্ড ভাবে ঝড় বৃষ্টি সুরু হইল যে তাহার আর তুলনা হয় না। সকলে মার নিকট বৃষ্টি থামাইবার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। মা সেই প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে নামিয়া কীর্ত্তন সুরু করিলেন। বহু লোকে সেই সঙ্গে সঙ্গেই বাহিরে নামিয়া পড়িলেন। কিন্তু দামী জামাকাপড়ের মায়া কাটাইয়া আবার কেহ কেহ নামিতেও প্রস্তুত ছিলেন না। মা বাহির হইতে দুই হাতে জল ছিটাইয়া তাঁহাদেরও বৃষ্টির মধ্যে নামিতে বাধ্য করিলেন। খুব ধুম কীর্ত্তন হইল। উহার মধ্যেই মা বলিলেন—"প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা কর।" কিন্তু তখন এরূপ ভাবে সমস্ত মাঠ জলে ভাসিয়া যাইতেছে যে পাতা বিছান অসম্ভব। অগত্যা সকলে মার নির্দ্দেশমত কাপড়ের আঁচল পাতিয়া বসিলেন। খুব আনন্দের সহিত প্রসাদ গ্রহণ হইলে মা সকলকে নিয়া চলিলেন পুকুরে স্নান করিতে। সেখানে গিয়া সকলেই খুব আনন্দের সহিত সাঁতার দিয়া স্নান করিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্য মাও সকলকে নিয়া ফিরিয়া আসিলেন বৃষ্টিও বন্ধ হইল। মায়ের এইরূপ নানা লীলার পরিচয় আমরা বহুবার পাইয়াছি।

মায়ের লীলাকথা।

সন্ধ্যার পরে ব্রহ্মচারী কান্তিভাই ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার নিকট মা হরিবাবার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি সব জিজ্ঞাসা করিলেন। শোভা তাহার ছেলের বিবাহ উপলক্ষে একটি খেলার মোটর ও চাবীওয়ালা ঘোড়া মাকে দিয়াছে। মাও সেই লইয়া আনন্দ করিতেছেন। আম্বের রাজার ছোট ছেলেটিকে মা গাড়ীটি দিয়া দিলেন।

১৫ই মে, ১৯৫৫

সকাল ৯টার পর মা আসিয়া আমার ঘরে বসিলেন

সিমলাতে সংকীর্ত্তন মণ্ডলের উদ্যোগে অখণ্ড কীর্ত্তন ও উৎসবের আয়োজন হইয়াছে। তাঁহারা আমাদের অনুমতি না নিয়াই চিঠিতে পোষ্টারে মা যাইতেছেন বলিয়া সংবাদ ছাপাইয়া দিয়াছেন। মা এখানে আসিবার পরই তাঁহারা রাজাসাহেবের নিকট ফোন করিয়াছিলেন। কিন্তু মার শরীর ভাল যাইতেছে না সেজন্য তাঁহাদের ক্ষমা করিতে বলা হইয়াছে। আজ সকালে আবার ৫।৬ জন সিমলা হইতে মার নিকট প্রার্থনা জানাইতে আসিয়াছেন। কথা বলিয়া স্থির হইল যে আশ্রমের পক্ষ হইতে বিভু প্রভৃতি কয়েকজন যাইয়া একদিন কীর্ত্তনে যোগদান করিবে। মার যাওয়া এখন সম্ভব না।

দুপুরে মার বিশ্রাম করিতে করিতে বেশ দেরী হইয়া গেল। স্বামী চেতনদেবজী অনেকদিন পর মার দর্শনের জন্য আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত কথা বলিতে বলিতেই বিকাল চারটা বাজিয়া গেল। পাঁচটার সময় সিমলা হইতে কেওনথাল্ স্টেটের রাজা-রাণী প্রভৃতি প্রায় ১০।১২ জন মার দর্শনের জন্য আসিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে মার অনেক কথাবার্ত্তা হইল।

সন্ধ্যার পরে মা প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ বাহিরে গিয়া বসিলেন। মৌনের পরেও মার মুখ হইতে প্রশ্নের উত্তরে অনেক কথা হইল। কিছু কিছু রেকর্ডও করা হইয়াছে।

১৬ই মে, ১৯৫৫

প্রায় দশটার পর মা ঘরের বাহির হইয়া সোজা আমার ঘরে

এবারের মত পূর্ব্বেও এইরূপ ঘটনা আরও দেখিয়াছি। ঢাকার কথা উঠিল। একবার সেখানে জন্মোৎসবের দিন এমন প্রচণ্ড ভাবে ঝড় বৃষ্টি শুরু হইল যে তাহার আর তুলনা হয় না। সকলে মার নিকট বৃষ্টি থামাইবার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। মা সেই প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে নামিয়া কীর্ত্তন শুরু করিলেন। বহু লোকে সেই সঙ্গে সঙ্গেই বাহিরে নামিয়া পড়িলেন। কিন্তু দামী জামাকাপড়ের মায়া কাটাইয়া আবার কেহ কেহ নামিতেও প্রস্তুত ছিলেন না। মা বাহির হইতে দুই হাতে জল ছিটাইয়া তাঁহাদেরও বৃষ্টির মধ্যে নামিতে বাধ্য করিলেন। খুব ধুম কীর্ত্তন হইল। উহার মধ্যেই মা বলিলেন—"প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা কর।" কিন্তু তখন এরূপ ভাবে সমস্ত মাঠ জলে ভাসিয়া যাইতেছে যে পাতা বিছান অসম্ভব। অগত্যা সকলে মার নির্দ্দেশমত কাপড়ের আঁচল পাতিয়া বসিলেন। খুব আনন্দের সহিত প্রসাদ গ্রহণ হইলে মা সকলকে নিয়া চলিলেন পুকুরে স্নান করিতে। সেখানে গিয়া সকলেই খুব আনন্দের সহিত সাঁতার দিয়া স্নান করিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্য মাও সকলকে নিয়া ফিরিয়া আসিলেন বৃষ্টিও বন্ধ হইল। মায়ের এইরূপ নানা লীলার পরিচয় আমরা বহুবার পাইয়াছি।

মায়ের লীলাকথা।

সন্ধ্যার পরে ব্রহ্মচারী কান্তিভাই ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার নিকট মা হরিবাবার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি সব জিজ্ঞাসা করিলেন। শোভা তাহার ছেলের বিবাহ উপলক্ষে একটি খেলার মোটর ও চাবীওয়ালা ঘোড়া মাকে দিয়াছে। মাও সেই লইয়া আনন্দ করিতেছেন। আম্বের রাজার ছোট ছেলেটিকে মা গাড়ীটি দিয়া দিলেন।

১৫ই মে, ১৯৫৫

সকাল ৯টার পর মা আসিয়া আমার ঘরে বসিলেন

সিমলাতে সংকীর্ত্তন মণ্ডলের উদ্যোগে অখণ্ড কীর্ত্তন ও উৎসবের আয়োজন হইয়াছে। তাঁহারা আমাদের অনুমতি না নিয়াই চিঠিতে পোষ্টারে মা যাইতেছেন বলিয়া সংবাদ ছাপাইয়া দিয়াছেন। মা এখানে আসিবার পরই তাঁহারা রাজাসাহেবের নিকট ফোন করিয়াছিলেন। কিন্তু মার শরীর ভাল যাইতেছে না সেজন্য তাঁহাদের ক্ষমা করিতে বলা হইয়াছে। আজ সকালে আবার ৫।৬ জন সিমলা হইতে মার নিকট প্রার্থনা জানাইতে আসিয়াছেন। কথা বলিয়া স্থির হইল যে আশ্রমের পক্ষ হইতে বিভু প্রভৃতি কয়েকজন যাইয়া একদিন কীর্ত্তনে যোগদান করিবে। মার যাওয়া এখন সম্ভব না।

দুপুরে মার বিশ্রাম করিতে করিতে বেশ দেরী হইয়া গেল। স্বামী চেতনদেবজী অনেকদিন পর মার দর্শনের জন্য আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত কথা বলিতে বলিতেই বিকাল চারটা বাজিয়া গেল। পাঁচটার সময় সিমলা হইতে কেওনথাল্ ষ্টেটের রাজা-রাণী প্রভৃতি প্রায় ১০।১২ জন মার দর্শনের জন্য আসিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে মার অনেক কথাবার্ত্তা হইল।

সন্ধ্যার পরে মা প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ বাহিরে গিয়া বসিলেন। মৌনের পরেও মার মুখ হইতে প্রশ্নের উত্তরে অনেক কথা হইল। কিছু কিছু রেকর্ডও করা হইয়াছে।

১৬ই মে, ১৯৫৫

প্রায় দশটার পর মা ঘরের বাহির হইয়া সোজা আমার ঘরে

আসিয়া বসিলেন। টিহরীর মহারাণীকে লইয়া বেশ কিছু সময় হাসাহাসি হইল। বুনির সহিত তিনি কি এক বিষয়ে বাজী ধরিয়া হারিয়া গিয়াছেন। মা হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে বলিলেন—"আগে যদি জানিতাম যে তুমি জিতিতে চাও তবে আমি তোমাকে এক কায়দা শিখাইয়া দিতাম।" সকলেই খুব হাসিতে লাগিলেন।

দুপুর বেলা আম্বের রাজা-রাণী প্রভৃতি মাকে প্রণাম করিয়া রওনা হইয়া গেলেন। মা একটু পরে শুইয়া পড়িলেন।

রাত্রে সিমলা হইতে শ্রীযুক্ত বি, কে, শাহর মেয়ে ফোন করিতেছে যে লীলাবেন ও তাহার সঙ্গের একটি ছেলে দুইজনেই অসুস্থ। মা এই সংবাদ পাইয়াই পানুকে বলিলেন কাল সকালে সিমলা গিয়া তাহাদের দেখিয়া আসিতে।

টিহরীর মহারাজা-মহারাণী দুইজনে মাকে প্রণাম করিয়া দিল্লী রওনা হইয়া গেলেন। দুইজনের স্বভাবই এত সুন্দর ও সরল যে সকলেই মুগ্ধ। নিতান্ত আপন জনের ন্যায় সকলের সঙ্গে মেলামেশা করেন।

১৭ই মে, ১৯৫৫

কলিকাতা হইতে সংবাদ আসিয়াছে সরোজদাদা পরলোকগমন করিয়াছেন। সমস্ত পরিবারই মার বিশেষ ভক্ত। মারও আজ ভাবের কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা গেল। গত ৭ই বিকালেই মার মুখ হইতে এই জাতীয় কথা বাহির হইয়াছিল যাহাতে সরোজদাদা সম্বন্ধে সকলেই প্রায় নিরাশ হইয়া গিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার পর পানু সিমলা হইতে ফিরিয়া আসিলে সংবাদ পাওয়া

গেল যে লীলাবেনের হার্টের অসুখ কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। মা তাই ঠিক করিয়াছিলেন যে আগামী কাল কমল সেখানে গিয়া তিন দিন থাকিয়া তাহাদের নিয়া এখানে ২১শে ফিরিয়া আসিবে।

১৮ই মে, ১৯৫৫

সরোজ দাদার মৃত্যু প্রসঙ্গে।

সরোজ দাদার মৃত্যু সম্বন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা আছে। কাল তাহা লেখা হয় নাই; পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে যে গত ৭ তারিখ বিকালে সরোজ দাদার প্রসঙ্গে মা'র মুখ হইতে কিছু কথা বাহির হইয়াছিল। তখনই কেহ কেহ অনুমান করিয়া লইয়াছিলেন যে তাঁহার কিছু হইয়াছে। মা তখন পরিষ্কার করিয়া কিছু বলেন নাই। এখন খবর পাওয়া গেল যে ঠিক সেই সময় তিনি জন্ম-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণেই ছিলেন এবং তাহার ২।৩ ঘণ্টার মধ্যেই তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন। সেইদিনই সন্ধ্যার পর কথায় কথায় আবার প্রকাশ পাইয়াছিল যে মার মুখ হইতে যেন একটা হাহাকার আসিতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় হইল যে সরোজ দাদার মৃত্যু হইল ৭ তারিখ সন্ধ্যায় আর আমরা সংবাদ পাইলাম ১৭ই সকালে। অবশ্য ইহার পূর্ব্বাভাসও মা সেইদিনই দিয়া রাখিয়াছিলেন। পানু বলিয়াছিল—"একটু পরে টেলিগ্রাম আসিলেই বুঝা যাইবে কাহার কি হইল।" মা তখনই বলিয়াছিলেন—"খবর কি আর সব সময় সঙ্গে সঙ্গে আসে। অনেক সময়ত ছয় মাস পরেও আসে।"

মা আজ একটু বেশী দেরী করিয়াই বাহিরে আসিলেন। মুখে

সামান্য একটু জল দিয়া আমার ঘরে আসিয়া বসিলেন। কিছু চিঠি-পত্র পড়া হইতে লাগিল। মার আজ খাওয়ার ভাব একেবারেই নাই। বলিলেন যখন খেয়াল হইবে তখন খাইবেন। কৌশল্যা (রাণী সাহেবের পরিচারিকা) আসিয়া মাকে একটি নূতন কাপড় পড়াইয়া আরতি করিল।

প্রায় দুইটা নাগাদ মা গিয়া নিজের ঘরে বসিলেন। মা তখনও একটি চিঠি লেখাইতেছেন। এমন সময় রেণু গিয়া ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে মাকে সংবাদ দিল যে বুনি কেন জানি ভীষণভাবে কাঁদিতেছে। পানুও গিয়া মাকে সেই সংবাদই দিল। মা তাড়াতাড়ি বুনির ঘরে চলিয়া গেলেন। মার অসীম করুণা। নিজের হাতে তাহার পিঠে, মাথায়, বুকে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। একটু শান্ত হইলে মা তাহার নিকট হইতে সব শুনিয়া ঘরে আসিতে আসিতে প্রায় সাড়ে চারটা বাজিয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় মা হঠাৎ খাওয়ার ঘরে গিয়া বসিলেন—"যা আছে তাই আমাকে একটু দেও।" মা সারাদিনে কিছুই খান নাই। তাই তাড়াহুড়া করিয়া মাকে একটু দুধ এবং কয়েকখানা রুটি বানাইয়া দেওয়া হইল।

আবার আসিয়া মা ঘরে বসিলেন। সোলনের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সস্ত্রীক মার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা চলিল। বাহিরে সান্ধ্য কীর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। বাহির হইতে কে দুইজন সাধু আসিয়াছেন তাঁহারাই গান করিতেছেন। একটু পরে মা গিয়া বাহিরে মৌন পর্য্যন্ত বসিয়া অপর ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। আজ একটু শীঘ্রই মা বিশ্রাম করিতে গেলেন।

২০শে মে, ১৯৫৫

কাল রাত্রে মার শরীরটি মোটেও ভাল যায় নাই। মধ্যরাত্রে বেশ বমিও হইয়াছে। কেন যে এত গোলমাল হইতেছে বুঝি না।

সাড়ে দশটার পর মা নিজেই উঠিয়া বসিলেন। চেহারায় কিন্তু কোনও ক্লান্তির ছাপ নাই। মুখটি যেন জল জল করিতেছে। সব সময়ে এইরূপ দেখা যায় না। মা একটু বার্লির জল খাইয়াই রহিলেন। বেলা দুইটা পর্য্যন্ত মার ঘরে কথাবার্ত্তা ও চিঠিপত্র লেখান হইল। আমি বিশ্রামের জন্য চলিয়া আসিলাম। কিন্তু সংবাদ পাইলাম মা আবার চিঠিপত্র লইয়া বসিয়াছেন। চারটা নাগাদ একটু তরকারীর সুপ খাইয়া শুইয়া পড়িলেন।

বিকালে ব্রহ্মচারী কমল সিমলা হইতে ফিরিয়া আসিল। তাহার মুখে শুনিলাম লীলাবেন এখন ভালই আছেন। আগামী পরশু তাঁহাদের এখানে ফিরিবার কথা। মা টেনিস্ কোর্টে আজও বেশ কিছুক্ষণ হাঁটিয়া আসিলেন। জার্ম্মান একটি মেয়ে Eva Bosch (প্রসিদ্ধ Bosch পরিবারের) ৩।৪ দিন ধরিয়া এখানেই আছে। তাহার সহিত মা কথা বলিলেন।

রাত্রে আজ আর বেশী সময় মার ঘরে কেহ থাকিল না। মা তাড়াতাড়ি শুইয়া পড়িলেন।

২১শে মে, ১৯৫৫

বিভু, তপন প্রভৃতি ৭।৮ জন আজ সকালে সিমলা রওনা হইয়া

গেল কীর্ত্তনের জন্য। বিনয়দা, ভুবনদা প্রভৃতি আরও ৮।১০ জন ঐ গাড়ীতেই বেড়াইবার জন্য গেলেন।

মার শরীরটা আজও ভাল না। কিন্তু মৌনের পর মা অনেকক্ষণ কথা বলিলেন।

একজন যুবক মাকে প্রশ্ন করিয়াছে। মা তাহার উত্তরে বলিলেন—"যাহাতে ভজন হয় সেই কাজই করা। সময় বৃথা যাহাতে নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। চেষ্টা করিলে সব কিছুই হইয়া যায়। মন লাগাইবার জন্য নিজেদের মধ্যে চেষ্টা করা। সকলে মিলিয়া সপ্তাহে একত্রে সৎসঙ্গ পাঠ করা উচিত। খাওয়া দাওয়া করিয়া শুইয়াত কত জন্ম সকলে কাটাইয়া আসিয়াছ। বেকার সময় নষ্ট না করা। আমিই যে অমৃত সেই দিকে খেয়াল রাখা।"

মার মুখে নানা কথা।

প্রঃ—যে আত্মহত্যা করে তার সদ্গতি হয় কিনা?

মা—হ্যাঁ, এমন অনেক ক্রিয়া আছে যাহাতে মৃত্যু হইলে দুর্গতি হয়—সদ্গতি হয় না। অন্ধকার হইতে আরও অন্ধকারে যাইতে হয়। কেন এমন হয় সে কথা বলা যায় না। সেটা তাঁহার মৌজ। কর্ম্ম যে রকম—ফল সেই রকম।

মা আবার বলিতেছেন—"কর্ম্ম যে রকম ফলও সেইরূপ। তবে ভগবৎ চিন্তা দ্বারা সব ভয় দূরে চলিয়া যায়। ভগবানকেই স্মরণ করা—যিনি প্রাণের প্রাণ—আত্মা। সৎসঙ্গে হউক একান্তে হউক যে ভাবেই হউক ডাকিতে হইবেই। নতুবা আবরণ হইতে ছুটি নাই। ভগবানকে কখনও ঘুঁস দেওয়া ঠিক না। ধোকা দিলে তুমি ধোকাই পাবে। * * * * হত্যাকারী ও পরামর্শদাতা উভয়েরই সমান ফল

পাওয়া। শুভ কাজেও এইরূপই হয়। কম বেশী হউক ক্রিয়ার ফল পাইবেই।

প্রঃ—ভগবান রামচন্দ্র রাবণকে মারিয়া কি প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন ?

মা—একদিকে বলিতেছ ভগবান রাম, আবার অপর দিকে বলিতেছ 'মারা', 'প্রায়শ্চিত্ত।' ভগবান কখনও মারেন না এবং প্রায়শ্চিত্ত করিবার প্রশ্নই নাই। তিনি নিজেকে লইয়া খেলা করেন। আর তোমরা অপরকে লইয়া খেলা কর।

প্রঃ—যখন জপধ্যান করিতে বসি তখন অনেক সময় বাচ্চারা বিরক্ত করে।

মা—বালগোপাল ভাবে নিতে হয়। তাহারা বিরক্ত করে এই ভাব নিতে নাই। সেবা ভাবে নেও। বালগোপাল সেবা করিয়া যে সময়টা পাওয়া যায় সেই সময়ে জপ ধ্যান কর। শুইবার সময়ওত পাও। তাহা হইতেই অন্ততঃ কিছুটা সময় ভগবানকে দিবে।

এইরূপ আরও অনেক সুন্দর সুন্দর কথা হইল।

২৩শে মে, ১৯৫৫

সকালে সাড়ে নয়টার পর মার ঘরের দরজা খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। বেলা প্রায় একটা পর্য্যন্ত মার সহিত নানা রকম কথা-বার্ত্তা চলিল। সিমলা হইতে একজন গুজরাটী ডাক্তার আসিয়াছেন। তাহার পর মা মুখ ধুইয়া একটু কিছু মুখে দিলেন।

সকালে একজন কি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে মা

বিস্তারিত ভাবে অনেক কিছু বলিলেন—"ভগবৎ চিন্তা হইতে বড় আর কিছুই নাই। এইজন্য একটি কথা গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া বালগোপাল সেবা, কুমারী সেবা। পত্নী গৃহলক্ষ্মী—পতি পরমপতি এই ভাবনাতে সেবা। পিতামাতা গুরুজন ইহাদেরও সেবা।"

আবার বলিতেছেন—"যেমন ঘড়িতে ২৪ ঘণ্টার জন্য দম দেওয়া হয় সেইরূপ কিছু সময় ভগবৎ চিন্তায় দেওয়া। গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া ভগবানকে পাওয়ার ইহাও এক উপায়। এইরূপ বিচার রাখিবে—আমি যেখানেই থাকি না কেন সেখানেই বসিয়া বসিয়া ভগবৎ চিন্তন করিব। আর সেবা বুদ্ধিতে, যেমন মন্দিরের ম্যানেজার management করে—নিজের বাড়ী যেন ঠাকুরের এক মন্দির। আমার বাড়ীতে যারা আছে তারা সবই ভগবানের বিগ্রহ—আমার সেবা করা। আমি ম্যানেজার হইয়া সেবক হইয়া থাকিব। তবে আমার এই সেবা ভগবানেরই সেবা। এইরূপ ভাবনা নিয়া চলিতে থাকিলে ধীরে ধীরে পাক্কা সেবক হইয়া যাওয়ার আশা।"

"পাথর দেখিলে বিগ্রহ নাই, আর বিগ্রহ দেখেত পাথর নাই আর ভগবৎ বিগ্রহ ভাবনা যেখানে আনিবে সে ভগবানই। যেমন বলেনা সমস্তই ভগবানের বিগ্রহ। যদি ভগবৎ বিগ্রহ বলা যায় তবে তাহা প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করাও উচিত। পাথর বুদ্ধি থাকিলে দুর্বুদ্ধি—ভগবৎ বুদ্ধি হইল না। এইজন্য ভগবান কোথায়—এই যে অনুসন্ধান। হরেক রূপে এক ভগবানই ইহা প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। দুনিয়ার বিষয় রসে যে বুদ্ধি—বিষয়বুদ্ধি, ইহারত পরিবর্ত্তন রূপ, নিত্য রূপ নয়, অনিত্য রূপ। কিন্তু যেখানে একমাত্র ভগবৎ প্রকাশ সেখানে অনিত্যের কথা নাই। তোমার দৃষ্টি সৃষ্টির

মধ্যে নিত্য নাই, পরিবর্ত্তনশীল—ইহাই জগৎ বুদ্ধি। ইহাতে কি প্রকাশ হয়?—নাশ। যাহা নাশ হয় সেখানে স্ব-প্রকাশ নাই। সেখানে স্বয়ং-স্বরূপ কোথায়? ওখানেত নাশ নাশ হয় না। নাশ নাশ হওয়া চাই।”

মা আরো বলিলেন—“বিষয় বাসনায় মন থাকিলে তাহার স্বভাবই মনকে বিকল করা। এই জন্য চেষ্টা যতক্ষণ পর্য্যন্ত ধ্যান জপে মন না লাগে ততক্ষণ পর্য্যন্ত ধ্যানজপের চেষ্টা করিয়া যাওয়া। পরিমিত নিদ্রা ভোজন ইত্যাদির প্রয়োজন। দেখ, যখন কোথাও যাত্রা কর, যতটা প্রয়োজন মাত্র ততটাই সঙ্গে নেও, ঘর হইতে সবটাইত আর নেও না। এই জন্য ভগবৎ পথে যাত্রা করিলে ভগবৎমুখী অনুকূলতার জন্য আহার নিদ্রা যতটা প্রয়োজন ততটাই নেওয়া। যেমন বলে না, ‘যেমন খাইবে তেমনই মন হইবে।’ এই জন্য মনকে বাহিরের দিকে টানিয়া নেয়, অন্তর্মুখী হইতে দেয় না। কখনও কখনও যেমন এই মাসে একদিন বা চারদিন অথবা সপ্তাহে একদিন পরমার্থ চিন্তন করিব। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বারে বারে চেষ্টা করা মনকে তাঁহার-দিকে লাগাইবার জন্য—জপ, ধ্যান, পূজা, পাঠ, কীর্ত্তন ইত্যাদিতে। এইরূপ চেষ্টার ফলে তোমার অখণ্ডরূপে বাসনা ভোগ করিবার দিক রহিয়া গিয়াছে। জন্মে জন্মে যেরূপটা হইয়া আসিয়াছে তাহা খণ্ডিত হইয়া যাইবে। তখন তোমার মন, একেবারে না লাগিয়া গেলেও, তোমার চেষ্টার ফলে আশা, কখনও লাগিয়া যাইতেও পারে। বিষয়ে মন এতটা রাখিয়া দিয়াছ এখন ভগবানের দিকে মন লাগাও। দেখ ধীরে ধীরে তোমার রাস্তা খুলিয়া যাইবে। বিষয় চিন্তাও ছাড়িয়া যাইবে। উহাত ছাড়িয়া যাইবারই। আবরণ ধীরে ধীরে চলিয়া যাইবে। উহা

নিত্য কিনা, অনিত্য যাহা তাহা বিনাশ হইবারই। যেমন অগ্নির স্বভাব তাপ দেওয়া। অগ্নির নিকট যাইবে আর ঠাণ্ডা লাগিবে ইহাত আর হয় না। বরফের কাছে যাইবে আর গরম লাগিবে ইহাও হয় না। এই জন্য ভগবানের নাম সর্ব্বনাম সর্ব্বরূপ—ভগবৎ নামেতে পাপ হরণ করে। বলা হয় মানুষ এত পাপ করিতে পারে না যাহা ভগবৎ নামে দূর না হয়। যেমন একটি অগ্নির স্ফুলিঙ্গ যতটা জ্বালাইতে পারে ততটা পদার্থ তুমি সংগ্রহও করিতে পার না। ভগবৎ চিন্তন, ভগবানের দিকে যাইবার যে চেষ্টা তাহাতে তোমার সমস্ত পাপ নষ্ট করিয়া দিবে। নাশ নাশ হইবে—স্বরূপ প্রকাশ হইবে। এইজন্য বিষয় বাসনা যাহাতে তুমি একেবারে ডুবিয়া আছ, তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য যখন তুমি ভগবানের দিকে লাগিয়া যাইবে তখন তোমার অন্তঃশক্তি বাড়িয়া যাইবে। তুমি অভ্যাস কর। ভগবৎ চিন্তায় নিজেকে বাঁধিয়া ফেল—মন লাগুক আর না লাগুক—এতটা সময় আমি ভগবৎ চিন্তায় দিবই। আশা যে কখনও মন লাগিয়া যাইবে এবং লাগিয়া থাকেও।"

"যেমন মহাত্মারা বলিয়া থাকেন, শাস্ত্রও বলে—পরমার্থ চিন্তনের জন্য লাগিয়া যাইবে আর তোমার মিলিবে না ইহা কখনও হইতে পারে না। চেষ্টা, যতক্ষণ না মিলে, চেষ্টা ছাড়া নাই। সত্য স্বরূপ ভগবান তোমার মধ্যেই না? এইজন্য আপন চিন্তন—আপন ধ্যান ছাড়া না। আপন বস্তু আপনাকে পাওয়ার জন্য। আনন্দ আনন্দই। নিরানন্দ আর কোথায়? ঐ-ই আছেন মাত্র।"

মৌনের পরও রাত্রে মা অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিলেন। একজন প্রশ্ন করিয়াছেন—"ধর্ম্ম কি?"

মা উত্তর দিলেন—"আপনাকে পাওয়ার যে রাস্তা যাহা ছাড়া যায় না তাহাই ধর্ম্ম। প্রত্যেকেরই প্রকাশিত হইবার জন্য পৃথক পৃথক রাস্তা আছে। যেখানে তুমি আছ সেইখান নিয়াই তুমি চল। 'এক-মাত্র তিনিই-ত। তিনিই ধরিয়া আছেন। ছাড়াত নাই। আবার ভগবৎ প্রকাশের ক্রিয়াকেই ধর্ম্ম বলা হয়। যাহা অক্রিয়া তাহাই অধর্ম্ম। ধর্ম্মত একই।"

আবার বলিতেছেন—"মানুষ কর্ম্ম পূরণের জন্য জন্ম নেয়, আবার জন্ম পূরণের জন্যও জন্ম নেয়। শক্তিশালী পুরুষ বা ভগবৎ শক্তি যাহার মধ্যে প্রকাশিত রহিয়াছে তিনি নিজের কর্ম্ম নিজেও বদল করিতে পারেন।"

প্রঃ—"নর-নারীর মধ্যে বড় কে?"

মা—"দুই-ই বড়। শক্তি বিনা শিব কোথায়? রাধা বিনা কৃষ্ণ কোথায়? সীতা বিনা রাম কোথায়? শক্তি বিনা তুমিই বা কোথায়? যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকাশ না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই কেন থাকিবেই।"

সাড়ে নয়টার পর মা আসিয়া ঘরে বসিলেন। কলিকাতা হইতে ছবি* আসিয়াছে। তাহার ২।১টি গান রেকর্ড করার কথা হইয়াছে। সমস্ত ঠিক করিয়া মেশিন চালান হইবে এমন সময়ে ঘরের bulbটি হঠাৎ ফাটিয়া চৌচির হইয়া গেল। একটু পরে হইলে হয়ত মেশিনটি নষ্ট হইয়া যাইতে পারিত। বাধা পড়ায় আজ আর কিছু করা হইল না।

---

*প্রসিদ্ধ রেডিও গায়িকা কুমারী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়—মেয়েটি খুবই ভক্তিমতী ও শুদ্ধ স্বভাব বিশিষ্টা।

২৪শে মে, ১৯৫৫

আজও মৌনের পর বেশ সুন্দর কথাবার্ত্তা হইল। একজন গুরু সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে মা বলিলেন—"গুরু ভিতর হইতেই হয়। আসল খোঁজ আসিলেই আসল প্রকাশ হয়। বিনা প্রকাশ ছাড়া যে থাকাই যায় না। তিনি স্বয়ং গুরু রূপে আসিয়া নিজেই নিজে প্রকাশ করিয়া দেন বা প্রকাশ হইয়া যান।"

একজন বেশ সুন্দর, সরল প্রশ্ন করিলেন—"মাকে পাইবার সহজ সোজা মন্ত্র কি?"

মা বলিলেন—"পিতাজী, এই ছোট্ট মেয়েটি যাহা বলিবে তাহাই কি মানিবে? ভগবৎ প্রাপ্তির রাস্তা সরল সহজই। গুরু যাহা বলিবেন তাহাই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র। ঠিক ঠিক গুরু মন্ত্র জপ করিলে প্রকাশ ছাড়া হইতেই পারে না। ভগবানের রাজ্য এমন সুন্দর। তিনি নিজে যদি পড়ান তবে পাশ না হইয়াই যায় না। গুরু-শক্তি প্রকাশ হইলে ফেল আর হয় না। আগুনে প্রবেশ করিলে জ্বলিবেই। সর্ব্বনাম সর্ব্বরূপ আবার অনাম অরূপ। যদি নাম ভাল লাগে তবে সর্ব্বনাম সর্ব্বরূপত আছেই। আবার যদি নিরাকার ভাল লাগে তবে অনামী অরূপ। পিতাজী, তাঁহার সঙ্গে দোকানদারী ব্যাপার বৈশ্যবৃত্তি না রাখা। এত দিন ধরিয়া ধ্যান করিলাম কিন্তু কিছু পাইলাম না, এই বুদ্ধি রাখিতে নাই। তিনি প্রাণের প্রাণ আত্মার আত্মা। তিনি আপনের আপন। সুতরাং আপনের সঙ্গে দোকানদারী না করাই ঠিক।"

আবার বলিতেছেন—"নাম নামী অভিন্ন। স্বয়ং তিনিই যে নাম রূপে। অক্ষর ভগবানেরই রূপ। যে নাম করিলে চৈতন্য হয়, বীজ

বপন করিলে যেমন বৃক্ষ জন্মায়, যে নাম ভাল লাগে সেই নাম নিতে নিতে সর্ব্বনাম যে তাঁহারই নাম, সর্ব্বরূপ যে তাঁহারই রূপ তাহা প্রকাশ হয়। আবার তিনি যে অনামী অরূপ তাহাও ধীরে ধীরে প্রকাশ হয়। মনুষ্য জন্ম পাইয়াও যদি সেই চেষ্টা না করে তবে পশু-পক্ষী হইতে প্রভেদ কি? আপনার প্রকাশের জন্যই নিজের কল্যাণের দিকে যাওয়া উচিত। বড় বড় ধনীরাওত শান্তি পায় না। শান্তিত ধনে-জনে নাই। শান্তি আছে কিসে? আমি যে শান্ত স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, চৈতন্য স্বরূপ—এই বোধ যতক্ষণ পর্য্যন্ত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত শান্তি কোথায়? নিজেকে পাওয়ার জন্য নিজেকে প্রকাশ করা। কি সুন্দর!"

মন্ত্র সম্বন্ধে মা বলিতেছেন—"যে অক্ষরে মনের ত্রাণ হয় ইহাই মন্ত্র। অক্ষর চিন্ময়—শব্দ ব্রহ্ম—নাম ব্রহ্ম। নাম রূপে পাওয়া যায় এই ভাবনা রাখিতেই হইবে। আমার মধ্যে যে বীজ আছে তাহাতে বৃক্ষ হইবেই এই বিশ্বাস রাখা। আবার বীজ বপন করিলে যেমন জল দিতে হয়, সার দিতে হয়, সেইরূপ সৎসঙ্গরূপী সার ও জল দিয়া মন্ত্ররূপী বীজকে অঙ্কুরিত করিতে হয়। যে রকমটা চাহিবে সেই-রূপই পাওয়া যায়। বিগ্রহকে নামকে ছাড়িয়া না থাকা। চলিতে ফিরিতে খাইতে শুইতে সর্ব্বদা নাম নিয়া থাকা। দোকানদারী করা না। যতটা জল দিবে, সার দিবে ঠিক ততটা, তাড়াতাড়িই বৃক্ষ জন্মাইবে। যদি শীঘ্র না হয় তবে মনে করিবে যে আমারই দোষ। মনে করা আমারই জন্ম জন্মান্তরের ভাবনা পার করিয়া আমি তাঁর চরণে পূর্ণরূপে অর্পিত হইতে পারিতেছি না। আগুন সব আমারই। দোষ তাঁহার না। এই শরীর বলে অমরপন্থী হও—মৃত্যুপন্থী না।

অমর পথে চল। তুমি যে অমৃত অমর সেটা প্রকাশ কর। * * * * সত্যস্বরূপ ভগবানের সঙ্গ মানেই সৎসঙ্গ। যাঁহাকে আশ্রয় করিলে সকল দোষ দূরে যায় তাঁহাকেই আশ্রয় করা। অবগুণ হইতে শুভগুণ অবশ্যই পাইবে। তুমি পিতা—তুমি মাতা—তুমি বন্ধু—তুমি সখা সব। এই বোধ রাখিতে হয়। তিনি কি না দিয়া পারেন? তোমার তীব্র ইচ্ছা আছে আর প্রকাশ হয় না ইহাত হইতেই পারে না। রাস্তা লম্বা কি ছোট এ প্রশ্ন মনেও স্থান দিতে নাই। আমাকে প্রাপ্ত করিতেই হইবে এই ভাবনাই রাখা। তোমার পূর্ণ শক্তি তুমি লাগাও তবেত তুমি পাবে। পিতাজী! কি সুন্দর! একজনকে ধরিলেই সব আসিয়া যায়।"

মা নিজেই আবার বলিতেছেন—"হরিকথাই কথা আর সব বৃথা ব্যথা। তুমি না থাকিলে আমি কোথায়? অহং+কার। অহং ক্রিয়ারূপে যাহা প্রকাশ তাহাই অহঙ্কার।"

একজন প্রশ্ন করিলেন—"মা নিজেই যদি গুরু হন তবে আর অন্য গুরুর প্রয়োজন কি?"

মা বলিলেন—"মা মানে ময়। বিশ্বময় তিনিই যে। মা ছাড়াত আর কিছুই নাই। মা-ইত সব দিতেছেন। মা-ইত গুরু। মা যিনি মাপিয়া দেন।"

আবার একজনের জিজ্ঞাসা—"আসা যাওয়া হইতে মুক্তির সরল উপায় কি?"

মা উত্তর দিলেন—"আসা যাওয়া নেই-ই। আমি যে আত্মা এই ভাবটা রাখা। আসা যাওয়া হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য গুরুকে আশ্রয় করিতে হয়। কোথায় আসা—কোথায় যাওয়া? যাঁহার আশ্রয় নিলে মুক্তি তিনিই সর্ব্বত্র স্বয়ং আছেন।"

সাড়ে নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। মা উঠিয়া ঘরে আসিলেন। সিমলা হইতে গভর্ণরের সেক্রেটারী ও তাঁহার পরিবারের কয়েকজন মার সঙ্গে একান্তে একটু কথা বলিলেন। মার শুইতে শুইতে প্রায় সাড়ে বারটা বাজিয়া গেল।

২৫শে মে, ১৯৫৫

মার দরজা সাড়ে দশটার পর খুলিয়া দেওয়া হইল। শরীরটা ভাল যাইতেছে না। মুখের ভাবও একটু গম্ভীর মনে হইতেছে।

ব্রহ্মচারী হরপ্রসাদ ও ভরদ্বাজের নামকরণের একবৎসর আগামী কাল সম্পূর্ণ হইবে। আরও কয়েক জনের নূতন নামকরণের কথা হইয়াছে। মা সেইজন্য স্বামীজীকে কাল কিছু বেশী করিয়া ফুল আনিতে বলিলেন।

আজ মা একটার মধ্যেই বিশ্রাম করিতে গেলেন। বিকালে চারটার পর দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। সিমলা হইতে শ্রীযুক্ত মহেশ (Director of Designs) মার দর্শনের জন্য আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে কথা বলিয়া পরে মা বাহিরে একটু হাঁটিলেন।

বিকালে ২।১টি চিঠি মাকে শোনান হইতেছে এমন সময় মা হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"দেখিলাম শঙ্করানন্দ স্বামীর* চেহারা খুব খারাপ—দাড়ি কামান। তাহার আবার কি হইল কে জানে?"

স্বপ্নে শঙ্করানন্দজীকে দর্শন।

---

* কাশীর অতি পুরাতন ভক্ত স্বামী শঙ্করানন্দ সরস্বতী। কয়েক বৎসর হয় ইনি কাশীতেই দেহরক্ষা করিয়াছেন।

রাত্রে মৌনের পূর্ব্ব হইতেই প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি সুরু হইল। তবু বাহির হইতে বেশ অনেকে মার কথা শুনিতে আসিয়াছে।

সৎসঙ্গে একজন প্রশ্ন করিলেন—"প্রথমেই সংসারের প্রতি বৈরাগ্য আসে অথবা ভগবৎ অনুরাগের পর এই বৈরাগ্যের উৎপত্তি হয়?"

মা বলিলেন—"যেমন যেমন ত্যাগ হইতে থাকে অর্থাৎ যতটা ভগবৎ অনুরাগ হয় ততটাই বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য আসে। ভগবানে মন লাগান মানে ভগবানের প্রতি আকর্ষিত হওয়া, আর বৈরাগ্য হওয়া মানে বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য হওয়া। ভগবানের প্রতি অনুরাগ হওয়া আর বিষয়ে বৈরাগ্য আসা এক সঙ্গেই হয়। ত্যাগ হইয়া যায়। ত্যাগ করিবার প্রয়োজন হয় না। এই ত্যাগই আসল ত্যাগ। যেমন মন্দিরে যাইতেছ চলিতে চলিতে সাথে সাথেই আকর্ষণ হইতে থাকে।"

প্রঃ—ইহার অর্থ তাহা হইলে প্রথমে আকর্ষণ পরে বৈরাগ্য উৎপত্তি।

মা বলিলেন—"আগে পরে না। ভগবৎ আকর্ষণের সাথে সাথেই বিষয় ত্যাগ হইতে থাকে।"

আবার বলিতেছেন—"এই শরীরের নিকট উৎপটাং কথা কিছু শুনিতে চাওত শোন। (অবধূতজীকে লক্ষ্য করিয়া) পিতাজী কেমন সুন্দর বুঝাইয়া বলেন। কাল কথা হইতেছিল ভগবানের মায়া কখন আসিল, মায়ার সৃষ্টি কখন হইল? যতক্ষণ ভগবান ততক্ষণই তাঁহার মায়া। তুমিত পরমানন্দকে ত্যাগ করিয়া আছ। তুমিইত ত্যাগী। মহানকে ত্যাগ করিয়া তুমি মহাত্যাগী। (সকলের হাসি) ব্রহ্মানন্দ পরমানন্দ ইহা কখনও ত্যাগ হইতে পারে না। পর্দ্দাতে আবরণ

রহিয়াছে। উহাত স্বয়ং প্রকাশ নিত্য—কখনও পরিবর্ত্তন হয় না। যাহা ত্যাগ হইবার তাহাই ত্যাগ হয়."

"ভগবানের রাজ্যের খেলা কি সুন্দর দেখ। আত্মা—এক আত্মাইত। তবুও তুমি, আমার, তোমার এই সব। যদি আমার তোমার বলিতে হয় তবে ভগবানের নিত্যদাস। যেখানে অনিত্যরূপে অহংকারের খেলা—ত্যাগ হওয়ার যাহা তাহা ত্যাগ হইয়া যায়। যেমন জলের গতি, উপরে দেখিলে মনে হয় গঙ্গার জল স্থির রহিয়াছে। কিন্তু প্রতিক্ষণেই গঙ্গার প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে। জগৎ-ত গতিশীল, যেখানে গতি ঐ জগৎ। তুমি ছোট ছিলে, বদলিয়া গিয়াছ যুবক হইয়াছ। আবার বার্দ্ধক্য আসিবে। দেখ সব সময়ই ত্যাগ হইয়া যাইতেছে।"

"যত্র জীব তত্র শিব, যত্র নারী তত্র গৌরী।" এইরূপেও আমিই বা তুমিই। অনিত্যরূপে কে? সব সময় পরিবর্ত্তন হইতেছে, বদলাইয়া যাইতেছে। যাহা বদলাইবার তাহাই বদলাইয়া যাইতেছে স্বয়ং প্রকাশ যাহা নিত্য সেখানে বদলাইবার কি আছে?"

একটু থামিয়া মা আবার বলিতেছেন—"আমি, আমার পরিবার, বাবা, মা, ঘর-বাড়ী ইত্যাদি সব বস্তুতে আপনত্ব মানিয়া রাখিয়াছ। জগতরূপে, পরিবাররূপে কত জনম জনম আমার আমার করিয়া আসিয়াছ। আমি অমৃত, আত্মা—এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি তাঁহারইত। যদি আমার তোমার থাকেত ভগবানে লাগাও। বরফে কি আছে? —জলইত। এইরূপ নিরাকার সাকার। সাকার কি? স্বয়ংই ক্রিয়া, ক্রিয়ারহিত ক্রিয়া। আকর্ষণ—আপনার মধ্যেই আপনার আকর্ষণ। যখন হইতে ভগবান তখন হইতেই মায়া। ভগবান কখন

নেই? এইজন্য মায়াও অনাদি। অন্ত কোথায়? কিসের আকর্ষণ? কার প্রকাশ? বিচার কর। আপন যাহা তাহার যখন প্রকাশ হইল তবে মায়া কার? নিজকে পাইবার চেষ্টা করা—চাই দাসরূপে, চাই আত্মারূপে। তুমিত অমৃত, আত্মারাম। জন্ম-মৃত্যুর ভোগ কেন তবে? যেখানে কাহারো উৎপত্তিই হইল না, ওখানে কি করিয়া বদ্ধ হইলে? অমৃত, আত্মারামের প্রকাশের জন্য আবরণ হটাইবার চেষ্টা করা। নিজের মধ্যেই নিজে। যেখানে আত্মা সেখানে আমি থাকি কি করিয়া? আমার তোমার মধ্যেই আমি থাকে না? ত্যাগ আর আকর্ষণ সাথে সাথেই। পরিবর্ত্তন রূপে, অপরিবর্ত্তন রূপে তিনি স্বয়ংই। আপনাতেই যে আপনি রহিয়াছে তাহার প্রকাশের জন্য চল। যে না চলে সে আত্মহত্যা করিয়াছে। ভগবৎ চিন্তায় আবরণ হটাইবার চেষ্টা কর। চল, অমরপন্থী হইয়া যাও। অমৃতের পথে চলিবার চেষ্টা কর।"

২৬শে মে, ১৯৫৫

সকালে পাঠের পর ব্রহ্মচারী কান্তিভাই ফুল লইয়া মার নিকট গেলে মা সকলকে ফুল ও চন্দন দিতে বলিলেন। বায়ুমণ্ডলের উদ্দেশ্যেও ফুল দিতে বলিলেন। কান্তিভাইর রঘুনাথ দাস নামকরণের আজ এক বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। মার খেয়াল আজ আরও কয়েকজনের নামকরণ হইলে মন্দ হয় না।

ব্রহ্মচারী কুসুম ও পানু এবং নর্ম্মদা শঙ্করের নামকরণ।

পঞ্জিকা খুলিয়া দেখা গেল আজই বিশেষ শুভদিন। আজ তাই ব্রহ্মচারী কুসুমের নাম শুকদেবানন্দ, ব্রহ্মচারী পানুর নাম গম্ভীরানন্দ

এবং গুজরাট হইতে নর্ম্মদা শঙ্কর ব্যাস বলিয়া একটি ব্রাহ্মণ ছেলে আসিয়াছে তাহার নাম দত্তাত্রেয়ানন্দ রাখা হইল। মার নির্দ্দেশ মত কুসুম এবং পানু আজ প্রাতঃকাল হইতেই মৌন রহিয়াছে। নামকরণ উপলক্ষ্যে আজ এখানে ভাণ্ডারাও হইল।

গত বৎসর এই দিনেই ব্রহ্মচারী কান্তিভাইর নাম রঘুনাথ দাস, ব্রহ্মচারী হীরুর নাম হরপ্রসাদ এবং ব্রহ্মচারী ভরতভাইর নাম ভরদ্বাজ রাখা হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বেও অষ্ট্রিয়ান মহিলা ব্লাঙ্কার নাম আত্মানন্দ, অ্যামেরিকান যুবক জ্যাকের নাম জয়ানন্দ, ফরাসী ডাক্তার ওয়াইন্ট্রেবের নাম বিজয়ানন্দ, ফরাসী রাজদূত পেটিটের নাম সত্যানন্দ, ইংরাজ প্রফেসার টার্ণবুলের নাম প্রেমানন্দ এইরূপ অনেক নামই মা রাখিয়াছেন।

বিকাল বেলাও নামকরণ উপলক্ষে কিছু মিষ্টি আনান হইয়াছে। মা মৌনের পর নিজের হাতে তাহা বিলি করিলেন।

আজ সন্ধ্যাবেলাও সৎসঙ্গে খুব সুন্দর সুন্দর কথা হইল। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—"গুরুর সবচেয়ে বড় সেবা কি?"

মা উত্তর দিলেন—"আদেশ পালন করাই সবচেয়ে বড় সেবা। শাস্ত্রে আছে 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে কহে কাম, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে কহে প্রেম'। সুতরাং গুরু যাহা আদেশ দেন তাহা নির্ব্বিচারে পালন করিলেই সর্ব্বাপেক্ষা বড় সেবা হয়।"

প্রঃ—আদেশ যাহা পালন করা সম্ভব না এইরূপ আদেশ তিনি যদি দেন?

মা বলিলেন—"প্রফেসার ছাত্রদের পরীক্ষা নেন। তিনি ভাল করিয়াই জানেন যে ছাত্র কোন পর্য্যায়ের। তুমি যেখানে দাঁড়াইয়া

নেই? এইজন্য মায়াও অনাদি। অন্ত কোথায়? কিসের আকর্ষণ? কার প্রকাশ? বিচার কর। আপন যাহা তাহার যখন প্রকাশ হইল তবে মায়া কার? নিজকে পাইবার চেষ্টা করা—চাই দাসরূপে, চাই আত্মারূপে। তুমিত অমৃত, আত্মারাম। জন্ম-মৃত্যুর ভোগ কেন তবে? যেখানে কাহারো উৎপত্তিই হইল না, ওখানে কি করিয়া বদ্ধ হইলে? অমৃত, আত্মারামের প্রকাশের জন্য আবরণ হটাইবার চেষ্টা করা। নিজের মধ্যেই নিজে। যেখানে আত্মা সেখানে আমি থাকি কি করিয়া? আমার তোমার মধ্যেই আমি থাকে না? ত্যাগ আর আকর্ষণ সাথে সাথেই। পরিবর্ত্তন রূপে, অপরিবর্ত্তন রূপে তিনি স্বয়ংই। আপনাতেই যে আপনি রহিয়াছে তাহার প্রকাশের জন্য চল। যে না চলে সে আত্মহত্যা করিয়াছে। ভগবৎ চিন্তায় আবরণ হটাইবার চেষ্টা কর। চল, অমরপন্থী হইয়া যাও। অমৃতের পথে চলিবার চেষ্টা কর।"

২৬শে মে, ১৯৫৫

সকালে পাঠের পর ব্রহ্মচারী কান্তিভাই ফুল লইয়া মার নিকট গেলে মা সকলকে ফুল ও চন্দন দিতে বলিলেন। বায়ুমণ্ডলের উদ্দেশ্যেও ফুল দিতে বলিলেন। কান্তিভাইর রঘুনাথ দাস নামকরণের আজ এক বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। মার খেয়াল আজ আরও কয়েকজনের নামকরণ হইলে মন্দ হয় না।

ব্রহ্মচারী কুসুম ও পানু এবং নর্ম্মদা শঙ্করের নামকরণ।

পঞ্জিকা খুলিয়া দেখা গেল আজই বিশেষ শুভদিন। আজ তাই ব্রহ্মচারী কুসুমের নাম শুকদেবানন্দ, ব্রহ্মচারী পানুর নাম গম্ভীরানন্দ

এবং গুজরাট হইতে নর্ম্মদা শঙ্কর ব্যাস বলিয়া একটি ব্রাহ্মণ ছেলে আসিয়াছে তাহার নাম দত্তাত্রেয়ানন্দ রাখা হইল। মার নির্দ্দেশ মত কুসুম এবং পানু আজ প্রাতঃকাল হইতেই মৌন রহিয়াছে। নামকরণ উপলক্ষ্যে আজ এখানে ভাণ্ডারাও হইল।

গত বৎসর এই দিনেই ব্রহ্মচারী কান্তিভাইর নাম রঘুনাথ দাস, ব্রহ্মচারী হীরুর নাম হরপ্রসাদ এবং ব্রহ্মচারী ভরতভাইর নাম ভরদ্বাজ রাখা হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বেও অষ্ট্রিয়ান মহিলা ব্লাঙ্কার নাম আত্মানন্দ, অ্যামেরিকান যুবক জ্যাকের নাম জয়ানন্দ, ফরাসী ডাক্তার ওয়াইন্ট্‌বের নাম বিজয়ানন্দ, ফরাসী রাজদূত পেটিটের নাম সত্যানন্দ, ইংরাজ প্রফেসার টার্ণবুলের নাম প্রেমানন্দ এইরূপ অনেক নামই মা রাখিয়াছেন।

বিকাল বেলাও নামকরণ উপলক্ষে কিছু মিষ্টি আনান হইয়াছে। মা মৌনের পর নিজের হাতে তাহা বিলি করিলেন।

আজ সন্ধ্যাবেলাও সৎসঙ্গে খুব সুন্দর সুন্দর কথা হইল। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—"গুরুর সবচেয়ে বড় সেবা কি?"

মা উত্তর দিলেন—"আদেশ পালন করাই সবচেয়ে বড় সেবা। শাস্ত্রে আছে 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে কহে কাম, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে কহে প্রেম'। সুতরাং গুরু যাহা আদেশ দেন তাহা নির্ব্বিচারে পালন করিলেই সর্ব্বাপেক্ষা বড় সেবা হয়।"

প্রঃ—আদেশ যাহা পালন করা সম্ভব না এইরূপ আদেশ তিনি যদি দেন?

মা বলিলেন—"প্রফেসার ছাত্রদের পরীক্ষা নেন। তিনি ভাল করিয়াই জানেন যে ছাত্র কোন পর্য্যায়ের। তুমি যেখানে দাঁড়াইয়া

আছ সেই স্থিতি হইতেইত তুমি আদেশ পালন করিবে। কখনও আবার গুরু যাহা আদেশ দেন তিনি নিজেই তাহা পালন করাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। কিন্তু একেবারে না পড়িলে কিভাবে পাশ হয়? চেষ্টা থাকিলে তবু পালন করার শক্তি প্রকট হইতে পারে। আদেশের উপর পূর্ণরূপে নিষ্ঠা থাকা উচিত।"

একজন বলিলেন—"মাই যখন নিজে আমাদের প্রশ্নোত্তর দিতেছেন তখন আর আমাদের চিন্তার কি কারণ আছে?"

মা তাড়াতাড়ি জবাব দিলেন—"পরমার্থ কথায় এই শরীরটার কান পবিত্র হইবে সঙ্গে সঙ্গে তোমাদেরও এইজন্যই এখানে বসা। এই শরীরটাকে বসিতে বল তাই বসে। আবার খেয়াল যদি না হয় তবে বসেও না। প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য এই শরীর এখানে বসে না। সত্য কথা হইতেছে এই শরীরটা অন্যের কাছে বসেও না, অন্যেরটা খায়ও না, অন্যেরটা পড়েও না, অন্যের ঘরে যায় না, অন্যের সঙ্গে কথা বলে না। এই শরীর আবার অন্য দিক দিয়া নিজের মাতা পিতা বন্ধুর সঙ্গে যেমন কথা বলে সেইরূপই। ভাষণ দেওয়া—লেক্‌চার দেওয়াত এই শরীরের হয় না। তোমরা যেমন ঘণ্টা বাজাও তেমনই শুন।"

২৭শে মে, ১৯৫৫

ব্যাঙ্গালোরে All Faiths Conference হইতেছে। ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ সভাপতি। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ মহাদেবন মার নিকট সম্মেলনের জন্য একটি বাণী চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। মা

সাধারণতঃ এইরূপ বাণী ইত্যাদি পাঠান না। আমরা বিশেষ প্রার্থনা করিয়া মার নিকট হইতে কয়েকটি ছত্র পাঠাইয়া দিলাম—"হে অমর আত্মা, মৃত্যু পথ হইতে অমর পথের যাত্রী হও। অমর আত্মা অমর পন্থী স্বয়ং আপনাতে আপনি।"

গত ১০ তারিখে জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের চিঠির উল্লেখ করা হইয়াছে। আজ মা সেই চিঠিখানার জবাব দিলেন। কয়েকটি কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য—"একমাত্র তিনিই আছেন বলে তাঁহার প্রকাশের জন্য তাঁহারই বলা তাঁহাকেইত। গতি ও স্থিতি রূপেতে যিনি আবার তিনিই অক্ষর রূপেতে—যাহার ক্ষরণ হয় না। ভাষায় এবং সেই গভীরেও তিনিইত, গতির মধ্যে সহজ গতিতেও, সর্ব্বক্ষণ যেখানে অচল থেকেও সচল। আবার অভাব রাজ্যের বীরত্ব যেখানে সর্ব্বক্ষণ, সেই বীরত্বের ধ্বংশ রূপটাও প্রকাশ গ্রহণ চাইত। উহা কি দিয়ে? যত কথার ভাণ্ডার যে আবার সে-ই। সেইজন্য যে ভাণ্ডারের আশ্রয় নিলে বৃথা ফল, বৃথা ভোগ, বৃথা রূপটি—তাহার বৃথা হয়ে প্রকাশ পায়, যদিও বৃথা রূপও ওই-ত। সেখানে ভাণ্ডার অভাণ্ডারের প্রশ্ন নেই—বৃথা অবৃথার প্রশ্ন নেই। কিছু না থেকেও সেখানে সব আছে। আপন স্বরূপ—আপনাতে আপনিই। যে মনে যা নিজ লক্ষ্যে মেনে চলা যায়। সেইটি ধরে চলতে হয়ত। যেখানে হাহাকারের রাস্তা। সেই ক্রিয়াটি সর্ব্বক্ষণ জাগ্রত রাখার জন্য স্বক্রিয়াই প্রয়োজন। যে রসাল ভাষা কথা আপনারই প্রকাশের দিক সেই দিকটাই গ্রহণীয়। পিপাসিত জনের যেমন জল ভুল হয় না, সেইরূপ ঐ লক্ষ্যে নিজকে জাগ্রত রাখার কেবল চেষ্টা।"

মা শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয় সম্বন্ধে ইতিমধ্যে একদিন বলিতে-ছিলেন—"দেখলাম বাবা এই শরীরটার খুব কাছে কাছে বসে পরমার্থ ভাবে, দীর্ঘ সময় কাটাল।" আজ সকালে উঠিয়াই বলিতেছেন—"এই শরীরটার কাছে বাবা বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে—কোনও কথা নাই। শুধু একটা উদার উদাস ভাবের প্রকাশ। শরীরটাত ভিতরে খুব বেশী সুস্থ না।" আবার ঐ প্রসঙ্গেই বলিলেন—"এই ছোট্ট মেয়েটাত বাবার কাছেই। কোন কোন সময় কোন কথা বলা এসে যায়। তাই সামান্যই বলা হয় মাত্র।"

স্বপ্নে শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজকে দর্শন।

জন্মোৎসবের শেষ দিনের একটি ঘটনা লিখিতে ভুল হইয়া গিয়াছে। একজন পাঞ্জাবী ভদ্রমহিলা প্যাণ্ডেলে বসিয়া মাকে দেখিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন মা সিংহের উপর জগদ্ধাত্রীরূপে বসিয়া আছেন। তাহা দেখিয়াই তিনি জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন।

মৌনের পর আজও মার সঙ্গে কিছু কথাবার্ত্তা হইল। একজন ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন—"রুদ্রাক্ষ মালা জপের আবশ্যকতা কি?"

মা উত্তর দিলেন—"এক এক পূজার যেমন এক এক রকম ফুল সেইরূপ মন্ত্রও পৃথক, মালাও পৃথক। মালা জপের আবশ্যকতা অবশ্যই আছে। তবে এক এক স্থানে আবার মালা জপ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু ততক্ষণ পর্য্যন্ত জপ করাই প্রয়োজন। জপ যখন হইয়া যায় (আপনা হইতেই) তখন আর সংখ্যা রাখার দরকার নাই। কিন্তু যতক্ষন জপ করা হয় ততক্ষণ সংখ্যা রাখিতেই হইবে। কম করিলেও একমালা হওয়াই দরকার। জপ করা আর জপ

মালা জপের আবশ্যকতা।

হওয়াতে অনেক তফাৎ। ১০৮ মালা জপেরও বিশেষ কথা আছে। কে জানে কোন সময় ভগবৎ অনুভূতি হইয়া যায়। সংখ্যা জপ করিয়াও আবার ভগবানকে অর্পণ করিতে হয়। দুই বেলা তুমি যেমন নিয়মিত ভোজন কর তাহা ছাড়া অন্য সময়ও খাইতে পার। সেই রকম জপও নিয়মিত ২।৩ বার করিতেই হইবে। অন্য সময় যদি আরও করিতে পার তবেত ভালই। মনের এইরূপ অবস্থা আনা চাই যে ভগবৎ স্মরণ বিনা থাকাই মুস্কিল।"

"একটা গল্প বলি—একজন লোক ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই 'হরেকৃষ্ণ' নাম করিতেন। একদিন একজনের বাসায় অতিথি হন। যাঁহার বাড়ীতে ছিলেন তিনি রাত্রে শুনিলেন যে শুধু 'হরেকৃষ্ণ', 'হরেকৃষ্ণ' নাম হইতেছে। প্রথমে বুঝিতেই পারেন নাই। পরে জানালা দিয়া আওয়াজ শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন যে অতিথির গলার স্বর। অতিথি শুইয়া আছেন। কিন্তু তাঁহার শ্বাসে শ্বাসে ঐ নাম জপেরই আওয়াজ হইতেছিল।"

"সেই জন্যই বলা হয় অভ্যাস করিবার জন্য চেষ্টা চাই। নিজের ঘরে যাওয়ার জন্যই চেষ্টা। তাঁহার দিকে মন না গেলেই দুর্ব্বুদ্ধি—দুর্গতি—দুর্ভোগ। প্যারালিসিসের মত মন দুর্ভোগের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য দৌড়ায়। মনকে অবশ করিয়া ফেলে। ভগবৎ মন্ত্র জপ ও ধ্যানে ঐ রোগ দূরে যায়।"

মৌনের পর মা ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন। রাজা সাহেব মাকে প্রশ্ন করিলেন—"এই জগত মিথ্যা হইলেও ভাসমান কেন?"

মা উত্তর দিলেন—"মিথ্যা, ঠিক না। তবে জাগতিক সত্য। ব্যবহারিক সত্য যদি না হইত তবে ভাসমান হইতে পারে না।"

আবার বলিতেছেন—"এক ব্রহ্ম যখন তখন আর জাত কখন? তাই অজাতবাদ। সৃষ্টি-স্থিতির কোন কথাই নাই।"

২৮শে মে, ১৯৫৫

কালরাত্রে মার শুইবার ভাব আদৌ ছিল না বলিলেই হয়। পেটে যথেষ্ঠ ব্যথা ছিল। সেই সঙ্গে শ্বাসের একটু কষ্টও হইতেছিল। খাওয়া-দাওয়া একপ্রকার নাই বলিলেই হয়। খুব ভোরে মা বলিয়া দিয়াছেন না ডাকিলে যেন কেহ ঘরে না যায়। মা নিজেই প্রায় সাড়ে এগারটা নাগাদ উঠিয়া ঘরের বাহিরে আসিলেন।

আজ সকালে বম্বে হইতে শ্রীযুক্ত বি, কে, শাহ আসিয়াছেন। দিল্লী হইতে ডাঃ বলরামকেও কয়েক দিনের জন্য সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। তিনি এখানে থাকিয়া আমাকে বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিবেন।

দুপুরে মার বিশ্রাম করিতে করিতে প্রায় আড়াইটা বাজিয়া গেল। বেলা চারিটার সময় বি, কে, শাহ মার সঙ্গে একান্তে কথা বলিতে আসিয়াছেন। মা উঠিয়া বসিলেন। কিছু পরে ডাঃ বলরামকেও ঘরে ডাকিয়া নেওয়া হইল।

আজ মৌনের পর আর কোনও কথাবার্ত্তা হইল না।

২৯শে মে, ১৯৫৫

মার শরীর আজ একটু ভালই মনে হয়। সকাল দশটার মধ্যেই

মার দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। সিমলা হইতে কয়েকজন ভদ্রলোক আসিয়াছেন। মার সঙ্গে তাঁহারা কিছু কথা বলিলেন। পরে আমাকেও মার ঘরে লইয়া যাওয়া হইল।

শোভা ও ভুবনদা আজ আশ্রমে ভাণ্ডারা দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বি, কে, শাহর পরিবারকে এখানেই খাইতে বলা হইয়াছে। খাওয়া শেষ হইলে মা শ্রীযুক্ত শাহ ও তাহার মেয়ে সুনয়নার সহিত একান্তে অনেকক্ষণ কথা বলিলেন। প্রায় তিনটার সময় মা শুইয়া পড়িলেন।

আবার সাড়ে চারটার পরই মার দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। অনেকেই ঘরে আসিয়া বসিলেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বাহিরে গিয়া অনেকক্ষণ হাঁটিয়া আসিয়া আমার ঘরে বসিলেন। মৌনের কিছু আগে গিয়া মা কীর্ত্তনে বসিলেন। মৌনের পর আজও আর কোনও কথাবার্ত্তা হইল না। মিরাট কলেজের অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণানন্দ পন্থ আসিয়াছেন। তিনিই সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত ভাষণ দিলেন।

৪ঠা জুন, ১৯৫৫

আজ বৃন্দাবনে দীনবন্ধু যাহা দেখিয়াছিল সেই প্রসঙ্গে মার নিকট কথা উঠিল। মা আজ ঘটনাটি বিস্তারিত বর্ণনা করিলেন।

বৃন্দাবনের প্রস্তররূপী মহাত্মা প্রসঙ্গে।

একদিন বিকালে মা বৃন্দাবনের আশ্রমে পিছন দিকের মাঠে বেড়াইতেছেন। দূরে অনেকেই দাঁড়াইয়া আছে—তাহার মধ্যে দীনবন্ধুও। হঠাৎ মা দেখিলেন যেন কেউ নিকটেই মাকে প্রণাম করিল। মা একটু থামিয়া দেখিলেন। মার মুখ দিয়া বাহির

হইল "ও পাথর।" আবার চলিলেন। মার পায়ের কাছে সত্যই একটি বড় পাথর তাহার অধিকাংশ ভাগই মাটির ভিতরে। আশ্চর্য্য দূর হইতে দীনবন্ধু দেখিল যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া কেহ মাকে প্রণাম করিলেন এবং মার ঐ কথার পর তিনি আবার ঐ পাথরের মধ্যেই অন্তর্হিত হইলেন। মার কথা অত দূর হইতেও দীনবন্ধু স্পষ্ট শুনিতে পাইয়াছিল।

মা এখন যাহা বলিলেন তাহা হইতে এইটুকু বুঝিলাম কোনও মহাপুরুষ ঐরূপে ওখানে আছেন। দীনবন্ধুর বিশেষ ইচ্ছা যে ঐখানে বেদী করিয়া বাঁধান হয় যাহাতে কেহ উহার উপর চলাফেরা না করিতে পারে।

৯ই জুন, ১৯৫৫

মার কাছে শুনিলাম মা ইতিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণানন্দ অবধূতজীকে দেখিয়াছেন—মার নিকটে বসা। আবার শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়কেও দেখিয়াছেন মার কাছে বসিয়া আছেন। অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় আছেন—যেন একটা পরমহংস ভাবের প্রকাশ। হাসিতেছেন—ভাবে বিভোর—সম্পূর্ণ উলঙ্গ মূর্ত্তি। বলা বাহুল্য ইহা সবই মার সূক্ষ্মে দেখা।

মার নানারূপ সূক্ষ্ম দর্শন।

আমার যে এই দীর্ঘ দিনের অসুস্থতা তাহার মূর্ত্তিও মা সূক্ষ্মে বহু দিন পূর্ব্বেই দেখিয়াছিলেন। মা তখন অজ্ঞাতবাসে পুরীতে আমি বিন্ধ্যাচল আশ্রমে। মা সেখান হইতে দেখিতেছিলেন একটি

রোগের মূর্ত্তি জানোয়ারের মত দেখিতে আমাকে যেন ধরিবেই—লইয়া যাইবেই। মা অখণ্ডানন্দ স্বামীজীকে তখনই বলিলেন আমার নিকট তার করার জন্য। আশ্চর্য্যের বিষয় আমিও বিন্ধ্যাচলে পিঠে একটা ভয়ানক বেদনা অনুভব করি ঠিক ঐ সময়। পরে মায়ের নিকট হইতে তার আসিলে বুঝিতে পারি যে মা উহা সব বুঝিয়াছেন। এত বৎসর পরে গত বৎসর দোলের সময় হইতে পিঠে পুনরায় সেই ব্যথা প্রচণ্ড আকারে দেখা দিয়াছে। বর্ত্তমানেত আমি প্ল্যাস্টারেই আছি। মা এখানে আসিয়াও সেই রোগের মূর্ত্তি দেখিয়াছেন। সরাইয়া দিবার খেয়াল কখনও হয়, কখনও বা তেমনটা আবার হয় না।

মার শরীরটা এখনও বিশেষ ভাল যাইতেছে না। নিজ খেয়ালে কখনো কিছু খাইলেন, কখনও বা শুধু জল খাইয়া থাকেন। পায়ের অবস্থা প্রায় স্বাভাবিক। তবে হাঁটাচলা করিতে কখনো কখনো একটা স্থানে লাগে, বিশেষতঃ অসাবধানে বেমোড়ে পা পড়িলে।

এখানে আসিয়া বীথু* টাইফয়েডের মত হইয়া শয্যাগতা আছে। প্রথমটায় তাহার জন্য একটু চিন্তাই হইয়াছিল। এখন ডাক্তার বলরামের নির্দ্দেশ মত চিকিৎসায় অনেকটা ভালই।

কলিকাতা হইতেও কয়েকজন মার কাছে আসিয়াছেন।

আজ মৌনের পর বেশ সুন্দর সুন্দর কথা হইল। একজন প্রশ্ন করিলেন—"মানুষত ভগবানেরই রূপ। মানুষের সেবা আর ভগবানের সেবায় পার্থক্য কি?"

মায়ের মুখে নানা কথা।

---

* এলাহাবাদের অতি পুরাতন ভক্ত ৺নীরজ নাথ মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা কুমারী বীথিকা মুখোপাধ্যায়, এম, এ; ডি, ফিল। কুমারী বীথিকা বর্ত্তমানে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা।

মা উত্তর দিলেন—"মানুষ বলিলে ভগবান নয়, আবার ভগবান বলিলে মানুষ নয়। যেমন বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি নয়। সবের মধ্যেই ভগবান এইটি জানিয়া সেবা করা চাই। এই জন্যই ভগবৎ বুদ্ধিতে সেবা করা প্রয়োজন। ঈশ্বর বুদ্ধিতে তৎবুদ্ধিতে সেবা করিলে ভগবানের সেবার ফল হয়। পশুপক্ষী বৃক্ষআদির সেবাও ভগবৎ বুদ্ধিতে করিলে ফল পাওয়া যায়।"

অপর একজন প্রশ্ন করিল—"আমার ইষ্ট গোবিন্দ। শিবরাত্রির সময় কাহার ধ্যান করা।"

মা—"তোমার পতি কাহারো পুত্র এবং তোমার ছেলের পিতা, তিনিইত। তিনরূপে তিনি একই। যে ভাবেই ধ্যান কর, ইষ্টেরই ধ্যান হয়। যেভাবেই ডাক ভগবানকেই ডাকা হয়।"

প্রঃ—দুর্গাপূজার সময় গোবিন্দের নাম করিতেছিলাম। নাম করিতে করিতে চোখ খুলিয়া দেখি সামনে দুর্গাপ্রতিমা দাঁড়াইয়া।

মা—"গোবিন্দ দুর্গারূপে। দুর্গাকে যে প্রণাম কর তা গোবিন্দকেই প্রণাম হয়। আমার গোবিন্দই দুর্গারূপে, শিবরূপে—কি আপত্তি? সব নামই ভগবানের, আবার অনামী অরূপ। যে রূপ যে ভাবে নেবে তাই পাবে।"

প্রশ্ন :—জীবনে ভগবানের কোনও দর্শনই হইল না। তাঁহার জন্য ব্যাকুলতা কি করিয়া হইবে?

মা—"ঐ-ইত—দেখা নাই, কিন্তু তাঁহার জন্য ব্যাকুলতা আসিয়া যায়—আপন কিনা! যে দেখিয়াছে তাহার আর ব্যাকুলতার কথা কি? আপন বস্তু হারাইয়া গিয়াছে। মানে পর্দ্দার আড়ালে পড়িয়া

গিয়াছে, এই জন্য ব্যাকুলতা আসে। কোনও স্থানে এই ব্যাকুলতাকে বিরহ বলা হয়। ইহা সাধনার ব্যাকুলতার বস্তু হইতে পৃথক।"

প্রশ্ন:—ভগবান যদি আপনই, তবে সেটা জানা নাই কেন?

মা—"প্রশ্ন যে করিতেছ।"

প্রশ্ন:—একটু ঝলক দর্শন তো করাইয়া দেও।

মা—"ভগবানকে ছাড়িয়া আর তুমি কোথায়? ঐ ঝলক কোনরূপে কোন ভাবে প্রকাশ হয়। যাহার দুনিয়ার বস্তুর কোন অভাব নাই—অর্থাভাব নাই, মোটর, ঘরবাড়ী সব কিছুই মজুদ, কিন্তু শান্তি কই? তুমি জ্ঞান স্বরূপ, শান্তি স্বরূপ—যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইহা না পাইতেছ ততক্ষণ পর্য্যন্ত শান্তি নাই। দুনিয়ার স্বভাব অভাব জাগরণ করিয়া রাখা। যেমন অগ্নিতে যত বেশী কাঠ দিবে ততই বেশী প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। এইরূপ অর্থ, গাড়ী যত বেশী পাইবে অভাব আরও বাড়িয়া যাইবে। দুনিয়াতে দুনিয়ার বস্তু পাইয়া পরম শান্তি কখনও হইতে পারে না। এই জন্য চাই স্বভাবের জাগরণ। অভাবের মধ্যে তুমি থাকিতে পার না। অভাবে শান্তি নাই। নিত্য নূতন চাওয়া আসিবে। বিষয় যাহাতে বিষ হয় ইহাতে পরম শান্তি নাই। যাহা আসা যাওয়ার মধ্যে তাহাতে শান্তি কোথায়? যতক্ষণ দুই ততক্ষণ দুঃখ। দুই হইতেই দ্বন্দ্ব, দুঃখ। অভাব হইতে দুঃখ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত না হইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত শান্তি পাইতেই পারে না। নিত্য সত্য যাহা তাহার প্রকাশের জন্য সকলেরই চেষ্টা করা চাই। নিজের ঘরে যাইবার চেষ্টা কর। পরের ঘরে অপরের সাথে থাকিলে দুঃখ দ্বন্দ্ব—মানে দুই নিয়া অন্ধ। অন্ধকার মানে অজ্ঞান।"

১০ই জুন, ১৯৫৫

আজও মার সঙ্গে সকালে বেশ সুন্দর সুন্দর কথা হইল।

মার সহিত কথোপকথন

প্রশ্ন :—জগতে কি সবই নিয়ন্ত্রিত?

মা—তাহা না হইলে এই শরীরকে লইয়া এলে কেন? তোমার ভাগ্যে ছিল, সে'টা ভোগ করার জন্য শরীরকে পাইয়াছ।

প্রশ্ন :—ভাগ্য পরিবর্ত্তন করা যায় না?

মা—ইহা তাঁহার নিজের হাতে।

প্রশ্ন :—আমার বদলাইবার ক্ষমতা নাই?

মা—তুমিই তো—তুমিই তো আত্মা, ভগবান সব কিছু তুমিই।

প্রশ্ন :—এই দৃষ্টির আমার প্রয়োজন নাই?

মা—তোমার কাজ তুমি কর, আমার কাজ আমি করি।

প্রশ্ন :—কথা হইতেছে মানুষের নিজের করিবার কোনও অধিকার নাই?

মা—নিশ্চয় আছে।

প্রশ্ন :—তবে আগে হইতেই ভাগ্য নিশ্চয় হইল কি করিয়া? ভাগ্য কি? মানুষের কর্ম্মে এই ভাগ্য ফলের পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে কিনা?

মা—ক্রিয়া দ্বারা বদলান যায় না। ভোগ করার জন্যই এই শরীর। দেহ মানে দেও—দেও।

প্রশ্ন :—ক্রিয়া তো ইচ্ছাধীন?

মা—ইচ্ছাধীন আবার ইচ্ছাধীন নয়ও। ইচ্ছাধীন—তাঁহার ইচ্ছাই

ইচ্ছা। যে ইচ্ছা তুমি ব্যবহার করিতেছ সেই ইচ্ছা ভগবৎ চিন্তায় লাগান চাই। তখনই মহান ইচ্ছার সন্ধান পাওয়া যাইবে। পরম ইচ্ছা চাই—যে ইচ্ছায় ইচ্ছা অনিচ্ছার পাড়ে যাইবে।

প্রশ্ন :—প্রারব্ধের সঙ্গে ইহার কি সম্বন্ধ?

মা—প্রারব্ধ থাকিলে করাইয়া নিবে। তুমি একেবারে চুপচাপ থাকিতেই পার না। সবই প্রারব্ধ হইতে হইতেছে।

প্রশ্ন :—নিজের হাতে তাহা হইলে কিছুই নাই?

মা—নিজের হাতেইত। ভগবানে লাগাওত হইবে। নতুবা মৃত্যু পথে যাত্রা। যে লাইনে যাইবে সেই স্থিতিই পাইবে। অবশ্য মহান শক্তি হইলে বদলাইতে পারে। ইহারও এক স্থান আছে। প্রারব্ধ আছে, আবার প্রারব্ধের উপরেও এক স্থিতি আছে। সেখানে অধিকারী অনধিকারীর কথা নাই। যখন বন্যা আসে তখন সব ভাসাইয়া নিয়া যায়।

প্রশ্ন :—দেখি কখন বন্যা আসে সেই অপেক্ষায় আছি।

মা—(হাসিয়া) আচ্ছা, বন্যার অপেক্ষায় আছ! তুমিত মহাতপস্বী! বন্যার খবর করিতে গিয়া নিজের ভোগের কর্ম্ম বাড়াইয়া দিবে। নিজের খোঁজ কর।

প্রশ্ন :—মহাপুরুষের নিকট আসিয়াও দেখা যায় কাহারো কাহারো অবনতি হয়। ইহাও কি প্রারব্ধ হইতেই হয়?

মা—যদি মহাপুরুষের নিকটই আস তবে অবনতি হইতেই পারে না। আগুনের নিকট যাইবে আর তাপ লাগিবে না ইহা হইতেই পারে না।

প্রশ্ন :—আপনার নিকট দূর দূর হইতে লোক আসে, কেন আসে?

মা—(কোহিনূর দাদা—জজকে উদ্দেশ্য করিয়া) জিজ্ঞাসা কর ইহাকে। তুমিত আপনার নিকট আপনিই।

প্রশ্ন :—সকলে তোমার কথা বুঝিয়াও বুঝিল না।

মা—"আমি" বুঝিয়াছি—ইহা হয় না।

প্রশ্ন :—আপনার নিকট আংশিক রূপে আসিয়াও কি কাজ হয়?

মা—হ্যাঁ, **আপনার** নিকট আংশিক রূপে আসিয়াও কি কাজ হয়। মহাত্মার নিকট যে আসা যাওয়া উহা সংসারে আসা যাওয়ার হাত হইতে ছুটি পাইবার জন্য। আসা যাওয়ার আর কথাই না আসে। আসা থাকিলে যাওয়া, যাওয়া থাকিলে আসা।

প্রশ্ন :—তোমার কি ইচ্ছা হয় না, এ আসিয়াছে—ইহার একটু কিছু করিয়া দি?

মা—তোমার ইচ্ছাইত। যে দিকেই দেখ তোমারই।

প্রশ্ন :—মার নিকট আসা যাওয়া মানে তোমার শরীরের নিকট আসা যাওয়া।

মা—শরীর মানে যাহা সরিয়া যায়।

প্রশ্ন :—এখানে আসিলে কি কিছুই হইবে না।

মা—নিশ্চয় হইবে।

প্রশ্ন :—কিছুইত হয় নাই।

মা—কিছুই হয় নাই। তোমারত তবে অন্তদৃষ্টি হইয়াছে। আমার কিছু হয় নাই ইহা বুঝিতে পারা ভাগ্যের কথা।

প্রশ্ন :—ইহাত Consolation prize.

মা—অতৃপ্তি। ইহাত ভালই। এইদিকে আসিলে অভাব জাগরণ হয়। আরও আগে গেলে এই অভাব স্বভাবে যাইবার প্রথম Stage.

তাঁহাকে ছাড়া দুনিয়া অন্ধকার। দুনিয়ায় কোন আকর্ষণ নাই—এই স্থিতিতে তুমি আসিয়া গিয়াছ একথা বলা হইতেছে না। তাঁহার জন্য ব্যাকুলতাও অগ্রসর হওয়া। আজও পাওয়া হল না। কি করিয়া দিন কাটে?

প্রশ্ন :—নাম হইতেই কি সব কিছু হইতে পারে?

মা—হ্যাঁ, বীজ হইতেই বৃক্ষ হয়। বৃক্ষ হইতে বীজ হয়। বীজেই বৃক্ষ আর বৃক্ষেতে বীজ।

প্রশ্ন :—কৃপা গ্রহীতার উপর নির্ভর করে? না, দাতার উপর নির্ভর করে?

মা—সব সময়ই কৃপার বর্ষণ হইতেছে। পাত্র সোজা রাখিলে ভরিয়া যাইবে। পাত্র উল্টা ধরিলে বহিয়া যাইবে। সব সময় তোমার পাওয়ার ইচ্ছা অভাববোধ রহিয়াছে। সোজা কথা, তুমি সাধন করিয়া যাও, বাকী তিনিই পূরণ করিয়া নিবেন। যত্র জীব তত্র শিব, যত্র নারী তত্র গৌরী। অখণ্ড কৃপা হইলে অখণ্ড প্রকাশ। যতটা করিবে ততটাই পাইবে। এক হয় কর আর পাও। ইহার আগে গেলে দেখা যায় আমার কর্ম্মের ফলে এই কৃপা আসে নাই।

প্রশ্ন :—কৃপার প্রকাশ কিছু সাপেক্ষ কি?

মা—না।

প্রশ্ন :—জন্মান্তরের কর্ম্মফল কি?

মা—না। অহৈতুকী কৃপাতে এই কথা আসিতে পারে না। আবরণ নষ্ট করার জন্য কর্ম্মের প্রয়োজন। তোমাকে যে বুদ্ধি দিয়াছেন তাই দিয়া তুমি কাজ কর। তাঁহার কৃপা অহৈতুকী। কেন কৃপা করিতেছেন না ইহা তাঁহার মৌজ। নিজেরইত—যাহা

ইচ্ছা করেন। যখন হেতু থাকে তখন প্রাপ্তির ইচ্ছা আর ফল ভোগ। আমি করিয়াছি তাই ফল ভোগ করিতেছি। কিসের ফল? নিজের ক্রিয়া, নিজের ফল। ভগবান আপন, এক আত্মা। প্রথমে এই বোধ আসে না তাই প্রশ্ন উত্থাপন হয়। যে স্থানে দাঁড়াইয়া আছ সেখান হইতে ঐরূপই দেখায়।

প্রশ্ন :—যাহার নিকট কৃপার অখণ্ড ভাণ্ডার রহিয়াছে তিনি কৃপা করেন না কেন?

মা—নিশ্চয়ই করেন। অনুভব নাই। যে কোন লাইনে চল—প্রথমে হাহাকার ব্যাকুলতা, পাওয়া যাচ্ছে না। ইহার পর—কি যেন নাই, ভিতরে কি যেন পাওয়া যাচ্ছে না। বিষয় ভোগ ভাল লাগে না। কোনও স্থিতিতেই সন্তোষ আসিয়া না পড়ে ইহা খেয়াল রাখা। কাহারো দর্শন, কাহারো কিছু অনুভব, কেউ বা আনন্দ অনুভব করে, সুখ বোধ হয়—মনে করে নিজেই ভগবান হইয়া গিয়াছে। যেমন গরীব তাহার খাওয়া জুটে না, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করাতে খাওয়ার ব্যবস্থা হইল। খাওয়া জুটিলত পড়ার নাই। তাহাও দেওয়া হইল। ইহার পর ঘরবাড়ী ছেলেমেয়ে এই সবও হইল। সব হইয়া গেল এখন আবার বাড়ীতে ভাড়াটে বসান। ভাড়াটে ভাড়া দেয় না—ইহার জন্য আবার লড়াই। এই হইল সংসারের রূপ। আধ্যাত্মিক পথে পরম প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে বিভূতির মধ্যে আটকাইয়া পড়ে। ইহার মধ্যে আটকাইয়া পড়াও বিঘ্ন।

মা আবার বলিতেছেন—"ইষ্টলক্ষ্য প্রাপ্তি চাই। সমস্ত প্রকাশ হইতে ভগবানের বিভূতি। বিভূতিরূপে স্বয়ং। অদ্বৈত আত্মা—আবার দ্বৈতরূপে কে? ঐ-ইত। এই পথে কিছুই অনুভব না হইলে কেহ

থাকিতেই পারে না। এই দিকে থাকারও কোনও সংযোগ রহিয়াছে। ভগবানই যে ইষ্ট—ইহা ভুল করিয়া বিষয়কে ইষ্ট করিয়া নেয়। ভগবান ছাড়া অপরকে ভাবা তাহাতে 'দু-ইষ্ট' আসিয়া গেল—'দুষ্ট'। বলে না, দুষ্ট বুদ্ধি আসিয়া গিয়াছে। কবে যাইবে? নিজেকে তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করা দরকার। বিচার করিয়া দেখিবে—আজ সারাদিন কি করিয়াছি? ভগবৎ চিন্তন ছাড়িয়া কতক্ষণ ছিলাম? পুরুষ হউক, স্ত্রী হউক, শুইয়া বা বসিয়া—কতটা ইষ্ট চিন্তা আর কতটা অনিষ্ট চিন্তা, মানে মৃত্যু গতির মধ্যে ছিলাম—ইহা মনে করা। মনুষ্য জন্ম দুর্লভ। এই দুর্লভ জন্ম পাইয়াও যদি ইষ্ট চিন্তায় সময় না দেয় তবে ভাবিতে হইবে—আমি কি করিতেছি? আমার সারা জীবন কি এইভাবে চলিবেই চলিবে? যে কেউ এই ভাবনা করিবে তাহার মঙ্গল। না করিলে মৃত্যুগতি। সুখ দুঃখ শোক ভুলিতে হইবেই। বন্ধু কাহাকে বলে?—যে ইষ্টের প্রতি মন করিয়া দেয়। সেইত পরম বন্ধু। যে ইহার দিক হইতে সরাইয়া মৃত্যুর দিকে গতি করিয়া দেয় সে শত্রু, মিত্র নয়। নিজেকে সংশোধন করার চেষ্টা করো। যে নিজেকে শুধরাইবার চেষ্টা না করে সেত আত্মঘাতী। বিষয় ভোগে slowpoison হয়। আর slow poisonএ মৃত্যুর দিকে গতি হয়। এই জন্য মানুষ মাত্রেরই কর্ত্তব্য অমৃতগতি নেওয়া।"

প্রশ্ন:—সংসারে থাকিতে গেলেই অন্য চিন্তা আসিয়া যায়। কি করা যায়?

মা—সংসার মানে সংশয়ের জায়গা। যে সং-কে সার মানিয়াছে—সে-ত সং সাজিয়া আসিয়াছে, এই জন্য সংসার।

প্রশ্ন: -দপ্তরে কাজ করিবার সময় কি করা উচিত?

মা—খেয়াল করিবে ঐরূপে তুমিই প্রকাশ হইয়াছ।

প্রশ্ন :—মুস্কিলত, জজসাহেবের না, মুস্কিল হইতেছে উকিলের।

মা—ভগবান তুমিই ঐরূপে—ঐ ক্রিয়ারূপে এই ভাবনা রাখিবে। সমস্ত ক্রিয়াতে 'তৎ'-ভাবনা রাখা। সব ক্রিয়া হইতেই স্বরূপ প্রকাশ হইবে। সমস্ত ক্রিয়া আলাদা মনে করা না—ঐ-ই-ত। ক্রিয়াশক্তি কে?—তুমিইত। শক্তি কে?—খুদ। কাছাড়িতেই থাক, আর যেখানেই থাক, তাঁহাকে ভুলিয়া যাওয়াই বিঘ্ন। কর্ম্মে আসক্ত হওয়াই বিঘ্ন।

প্রশ্ন :—'এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি'—এই দর্শন কিরূপ?

মা—আত্ম দর্শন, প্রত্যক্ষ দর্শন মানে কি? দ্রষ্টা, দৃশ্য আর দর্শন—এই তিন যেখানে সেখানে ব্রাহ্মীস্থিতি হয়। যেখানে ক্রিয়া অক্রিয়ার কথা নাই তাহাই আত্মস্থিতি। আর যদি রূপ দৃষ্টিতে দেখ তবে সর্ব্বত্র। যেমন বলে না, 'যত্র যত্র নেত্র হেরে তত্র তত্র কৃষ্ণ স্ফুরে'।

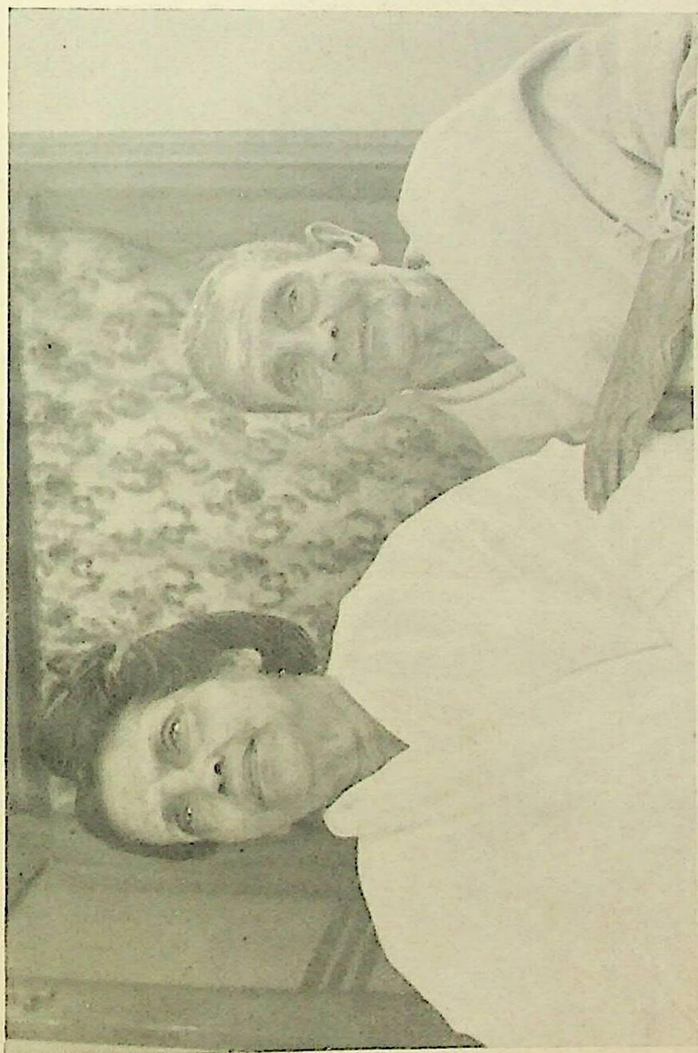
প্রশ্ন :—কৃষ্ণ কোথায় স্ফুরিত হইল?

মা—এক কৃষ্ণইত, আর কিছুই নাই। কৃষ্ণ ছাড়া যাহা কিছু দেখ তাহা আসল দর্শন নয়। সর্ব্বাঙ্গীন দর্শন ইষ্টের প্রকাশ।

প্রশ্ন :—রূপের অনুভূতি?

মা—রূপ বা যাহা কিছু বল, অনুভূতিতে অনুভবকারী থেকে যায়। অনুভবও একটা স্থান মাত্র। তাই অনুভবের উপরে চলো।

কথা প্রসঙ্গে মা আবার বলিতেছেন—"মাকে জানা মানে মাকে পাওয়া আর মা হইয়া যাওয়া। মা মানে আত্মা, মা মানে ময়। স্ব-ময়—আত্ম সত্ত্বা—ঐ-ইত। জ্ঞান স্বরূপ, আত্ম স্বরূপ, শিব স্বরূপ। হইয়া যাওয়া মানে আছেইত। যেমন পিতা-পুত্র-পতি একই, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন নাম একেরই। সর্ব্বরূপ তাঁহারই।



প্রশ্ন :—তুমি বল খেয়াল হইতেছে না। খেয়াল কি ?

মা—খেয়ালত খেয়ালই।

প্রশ্ন :—খেয়ালের পিছনে কোনও কারণ নাই ?

মা—কারণ মানত কারণ থাকিতেও পারে। আবার বিনা কারণেও হইতে পারে। এই শরীরেরত মাথা খারাপ।

প্রশ্ন :—মাথাত আমারই খারাপ।

মা—বেশ বলিয়াছ। ঠিক বলিয়াছ। আমিত এইরূপই বলি। দুনিয়াতে কিছু না কিছুর জন্য সকলেই পাগল। কেহ কম, কেহ বেশী। ভগবানের লীলা কেমন মজার। কেমন পাগলখানা বানাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার মৌজ—মৌজী সরকার কিনা ? নিজেকে নিয়াই নিজের মৌজ।

প্রশ্ন :—ভগবান কি বস্তু ?

মা—কিছু নয়। ভগবান কোনও বস্তু হইলে তাঁহার পিছনে লোক যাইবে কেন ? ভগবান পূর্ণ। এইজন্য পূর্ণের প্রকাশের জন্য তাঁহার কাছে আসা। ভগবানের অভাবের বোধেই দুনিয়ার দুঃখ। যেখানে ভগবানের প্রকাশ সেখানে দুই নাই—দুঃখের স্থান নাই। ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য চল—চেষ্টা কর। ঐ-ত আসল পাগল। পাগল মানে—পাওয়া গেল—পেয়ে গেল। মানে অনন্ত প্রকাশ হওয়া। এই পাগলের জন্য পাগল হইলে দুই-এর জন্য যে পাগলামি তাহা ছুটিয়া যায়। কেহ কোনও শরীরের জন্য পাগল। ঐ পাগলামিতে মোহ মায়ায় পড়িয়া নিজের শরীর নষ্ট করিয়া দেয়। ভগবানের জন্য পাগল হইলে শরীর নষ্ট হয় না। হরি কথাই কথা আর সব বৃথা ব্যথা। যে শ্বাস পড়িতেছে সে'টা যেন ব্যর্থ না যায়। ভগবানত আপন। আপনাকে পাইবার জন্য চেষ্টা করা চাই।

১১ই জুন, ১৯৫৫

আজ সকালে মার নিকট অস্ট্রেলিয়ান এক মেম সাহেব আসিয়াছেন। তিনি মার নিকট আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধে কথা তুলিলেন।

মায়ের মুখে বিবিধ প্রসঙ্গ

প্রশ্ন :—জাগতিক পদার্থ প্রাপ্তির জন্য আধ্যাত্মিক বা মানসিক শক্তির প্রয়োগ বা ব্যবহার করা ঠিক কি না?

মা—ভগবৎ শক্তি ভগবানের কাজে না লাগাইয়া দুনিয়ার কাজে লাগাইলে শক্তির ক্ষয় হয়। পরমার্থ শক্তিকে দুনিয়ার দিকে লাগাইলে এই শক্তির ধারা খণ্ডিত হইয়া যায়। সাধন করিতে করিতে শক্তি যদি আসিয়া যায় তবে তাহার ক্ষয় করা উচিত নয়। যেমন বিভূতি—সবই ভগবানের বিভূতি, তাঁহার মায়া, তাঁহার লীলা, তাঁহারই খেলা। এই খেলার মধ্যে হরিচিন্তন না রাখিয়া তোমার যাহা প্রাপ্তি হইয়াছে তাহাকে দুনিয়ার ব্যবহারে লাগান ঠিক নয়। এক হয় মহামায়া, আর হয় বিষয় মায়া—বিষয় ভোগ। তুমি অমৃতের যাত্রী হইয়া যদি তাঁহার পথে না চলত বিঘ্ন। বিষয়েতে আসিয়া বিভূতির মধ্যে ফাঁসিয়া থাকিবে না। বিভূতি—ইহাও এক স্থিতি মাত্র। ইহাতে কাহারো ভাল করিতে পার, খারাপও হইতে পারে। কিন্তু ইহা দ্বারা চরম পরম মিলিবে না। শক্তি প্রাপ্ত করিয়া তাহার ক্ষয় করা চাই না। আত্মপ্রকাশের জন্য চেষ্টা কর। নয়ত বিঘ্ন, পতন।

মা আবার বলিতেছেন—"একত হয় শক্তির ব্যবহার করা, আর এক হয় স্বাভাবিক। আপনা আপনিই হইয়া যায়। শক্তির ব্যবহার করিলে 'আমি' থাকিয়া যায়। এইজন্য ইহাতে পতন হইতে পারে।

কিন্তু যেখানে স্বাভাবিক সেখানে একথা নয়।"

প্রশ্ন :—মোহ আর প্রেমে তফাৎ কি?

মা—মোহেতে ফাঁসিয়া যাওয়া, আর প্রেমে আপনা প্রকাশ। মোহে ফাঁসিয়া গেলে হায়-হায় করিতে হয়।

প্রশ্ন :—কাহাকেও গুরু মানা হইয়াছে। কিন্তু তিনি চেলাও বানান না, বেটা বলিয়াও ডাকেন না। কি করা যায়?

মা—কম্‌সে কম্ তাঁহার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখ। বন্ধুত্বের মধ্যে সমস্ত আসিয়া যায়।

প্রশ্ন :—দোস্তও ধোকা দেয়।

মা—না, ধোকা দেয় না। যে পরম বন্ধু সে কখনও ধোকা দেয় না। দুনিয়ার দৃষ্টিতে ত্যাজ্যপুত্র হইতে পারে। কিন্তু ঐ বন্ধু ত্যাগ হয় না।

প্রশ্ন :—আপনিত হাসিয়া উড়াইয়া দেন!

মা—সবত হাসিই। বন্ধুর মধ্যেই সব—মাতা-পিতা-বন্ধু।

প্রশ্ন :—জীবনের পরম পুরুষার্থ কি?

মা—নিজকে জানিবার চেষ্টাই পরম পুরুষার্থ।

প্রশ্ন :—এত বড় প্রশ্নের এত ছোট জবাব!

মা—অত বিরাট বটবৃক্ষ তাহার বীজ কত বড়? ঐটুকুর মধ্যেই সমস্ত বৃক্ষটি।

প্রশ্ন :—ভগবান আছেন কি না? দেখা দেন না কেন? আমি একজন মহাত্মাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি একটি ডাণ্ডার বাড়ি দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্যথা কোথায়?

মা—যেমন ঐ ব্যথার অনুভব হয়, তেমনই এই অনুভূতি স্বয়ং

প্রকাশ। যেমন ব্যথার অনুভব ভিতরে হয়, সেইরূপ ভিতরে অনুভূতিও হয়। যতকাল ভগবানকে না পাওয়া ততকাল তাঁহার খোঁজ বন্ধ না করা। চাই ধ্যান—চাই জপ—একটা কিছু কর। ভগবৎ চিন্তনের চেষ্টা কর। জন্ম জন্মান্তরের সংস্কার আবরণ রহিয়া গিয়াছে—নিরাবরণ করিবার চেষ্টা কর।

শাহবাগের কথা।

কথাপ্রসঙ্গে মায়ের মুখে সেই পুরাতন ঢাকার শাহবাগের কথা শুনিয়া সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইলেন। মা তখন শাহবাগে আছেন। সাধনার খেলা চলিতেছে। ভোলানাথ চাকুরী করেন সেখানেই। বাগানের মালিক নবাবজাদী প্যারী বানু—তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত যোগেশ ঘোষ, হিরণ দিদির শ্বশুর। বেশ লম্বা-চওড়া মোটাসোটা, রাসভারী লোক। সকলেই ভয় করে, মান্য করে। মোটা সোনার চেইন—সঙ্গে ঘড়ি। বাগানে আসেন দেখাশুনা করিতে। অনেক দূর হইতে তাঁহার মোটর যায়। শব্দ শুনিয়াই মা খড়খড়ি বন্ধ করেন। এমন না যে আড়াল হইতে দেখেন। কারণ বিবাহের পর ভোলানাথ গুরু ছিলেন—বাল্যে ছিলেন পিতা। ভোলানাথ বলিয়াছিলেন পুরুষের দিকে চাহিতে নাই। তাই পিতাও পুরুষ, ভাইও পুরুষ—জাগতিক দৃষ্টিতে। এমন ত বলেন নাই যে পরপুরুষের দিকে দেখিতে নাই।

শ্রীযুক্ত যোগেশ ঘোষের নিকট খবর গিয়াছে শাহবাগে কীর্ত্তন হয়, কালীপূজা হয়। ভোলানাথ একদিন আসিয়া বলিলেন যে উপরওয়ালা ডাকিয়াছেন। তাঁহার ভয় যায় এই সব ব্যাপারে বুঝি তাঁহার চাকুরী যাইবে। মার ত সহজ ভাব—যাহা হইয়া যায়। নির্দ্দিষ্ট দিনে

মাকে লইয়া ভোলানাথ পাল্কী গাড়ীতে করিয়া সেখানে যান। মেয়েরা মার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলেন। ভোলানাথের ভয় কাটিয়া যায়।

মা সেই সময় মৌন। মধ্যে মধ্যে কুণ্ডলী দিয়া কথা হইয়া যাইত আপনা হইতেই। কখনও শত অনুরোধেও কথা বাহির হইত না, আবার নিজেই হয়ত কথা হইত। প্রথমে মুখ দিয়া মন্ত্র উচ্চারিত হইত, পরে কথা হইয়া আবার মন্ত্র উচ্চারিত হইত। যিনি এত লজ্জাশীলা তাঁহারই হয়ত আবার কোনও সময় ঘোমটা সরিয়া গিয়াছে। তখন বেপড়োয়া, ভ্রুক্ষেপও নাই।

যোগেশবাবু মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি কি উপাসনা করেন। মা বলিলেন—ব্রহ্ম উপাসক। 'এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি' যেখানে সেখানে সবইত ব্রহ্ম। যোগেশবাবু মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাঁহার ছেলের (প্রফুল্লবাবুর—হিরণদিদির স্বামীর) চাকুরী কবে হইবে? মার মুখ হইতে ঐরূপ কুণ্ডলী দিয়া জবাব আসিল—"আট মাস পরে।" এই সব শুনিয়া যোগেশবাবুর মনোভাব কি রকম হইয়া গেল। ভোলানাথের চাকুরীত গেলই না, বরং জল লাইটের ভাল ব্যবস্থা হইল। পরে ক্রমে ভোলানাথের কাছে দীক্ষা নিয়া নিজ উপরওয়ালার অভিমান নিম্ন কর্ম্মচারীর কাছে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। আট মাস পর প্রফুল্লবাবুর চাকুরীও হইয়াছিল।

মার অবস্থা তখন কিরূপ? রান্না করিতে করিতে কাঠ উনানে গুঁজিয়া দিতে যাইয়া হয়ত সেইরূপই বসিয়া থাকেন। যেখানকার হাত সেখানেই আছে, পুড়িয়া গেলেই বা কে সরায়? খাইতে বসিয়া হয়ত বা থালার উপরেই এলাইয়া পড়িয়াছেন। কখনও তরকারী কাটিতে যাইয়া বঁটির সম্মুখেই লুটাইয়া পড়িলেন। এইরূপত অবস্থা।

ভোলানাথের ভাইপো আশু ও অমূল্য—মটরী পিসিমার ছেলে—ভোলানাথের কাছেই থাকে। তাহাদের স্কুলের ভাতও নিয়মিত হয় না। সকলেই বোঝে মা যতক্ষণ পারেন ততক্ষণ 'না' নাই। না পারিলে আর কি করিবেন? সকলে সহানুভূতির দৃষ্টিতেই দেখে। কিন্তু এইরূপে আর কতদিন যায়? একদিন মটরী পিসিমা ও অমূল্য আসিয়া বলিল তাহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, তাই কিছুদিন ভোলানাথের কাছে থাকিতে আসিয়াছেন। ক্রমে মার ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া সংসারের সমস্ত ভার লইলেন। মার নিজের ভাবে আরও বেশী সময় থাকিবার সুযোগ হইয়া গেল। মটরী পিসিমা সেই যে মার আশ্রয়ে আসিলেন আর যান নাই। কাশীতে আশ্রমে মার উপস্থিতিতে তিনি দেহত্যাগ করেন।

দুপুরে শ্রীযুক্ত বি, কে, শাহ মার নিকট আসিয়া বসিলেন। মাকে হৃদয়ের কথা বলিতেছিলেন—মা, গরীব ছিলাম। ধন, ঐশ্বর্য্য, মান, প্রতিষ্ঠা অনেক পাইয়াছি। এখন শুধু প্রার্থনা তুমি হৃদয়ে থাক। পূজার ঘরে যাইলেই যেন তোমাকে চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাই। বেশ সুন্দর ভাবটি—ঐকান্তিকতায় ভরা।

১২ই জুন, ১৯৫৫

দিদিমার অসুস্থতার পূর্ব্বাভাস।

ইতিমধ্যে দিদিমার শরীরটা খারাপ হইয়াছিল। মা দেখেন একটি মূর্ত্তি দিদিমাকে যেন ধরিতে গিয়াছে। মা তাহাকে রাস্তা দেখাইয়া দিলেন। তবুও একটু যেন দৃষ্টি দিদিমার উপর পড়িয়াছে।

দিদিমা বাথরুমে যাইবেন কাছে মেয়েরা কে জানি ছিল দেখে দিদিমা চৌকী হইতে পড়িয়া যাওয়ার মত। মেয়েটি ধরিয়া ফেলিল কিন্তু দেখে বসিয়াও যেন গা ছাড়া ভাব। বেশ খারাপ অবস্থা। মা তখনই গিয়া সব ব্যবস্থা করিলেন।

মার সহিত আজও কিছু কথাবার্তা হইল। একজন প্রশ্ন করিলেন—প্রার্থনাতে প্রারব্ধ ক্ষয় হয় কি না?

মায়ের মুখে বিবিধ প্রসঙ্গ।

মা—যাহাতে প্রারব্ধ ক্ষয় হয় এই প্রার্থনা প্রকাশ হওয়া কঠিন। প্রারব্ধ ক্ষয় করা সব চাইতে কঠিন।

প্রশ্ন :—কোনও মহাত্মার অস্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার অপমৃত্যুর ফল আসিবে কি? যাহার জ্ঞান প্রাপ্তি হইয়া গিয়াছে তাহারও প্রারব্ধ ভোগ করিতে হইবে কি?

মা—কেহ কেহ বলে যে জ্ঞানীরও প্রারব্ধ ভোগ করিতে হয়। যেমন পাখার Switch বন্ধ হইয়া গেলেও খানিকক্ষণ ঘোরে। ঐ পাখা চলাই প্রারব্ধ। আবার কাহারো মত যে জ্ঞানাগ্নি সব জ্বালাইতে পারে আর এই প্রারব্ধ জ্বালাইতে পারে না?

প্রশ্ন :—প্রারব্ধ নষ্ট হয় না। আমি ত দেখিতে পাই শরীরই নষ্ট হইয়া যায়।

মা—শরীর বাধক হইতে পারে না।

প্রশ্ন :—জ্ঞানীরও রোগ হয়, আর কষ্ট হয় না?

মা—কোথায় আসা যাওয়া—আপনাতে আপনিই।

প্রশ্ন :—লোকেত দেখে তাহারও ক্যান্সার ইত্যাদি হয়।

মা—লোকে দেখে দেখিতে দেও। যাহার কষ্ট বোধ তাহার ঐ স্থিতি নয়।

দিদি—মহাপুরুষেরওত ব্যারাম হয়।

শাশ্বতানন্দজী—তাঁহার প্রারব্ধ ভোগ নাই।

মা—Connection কাটিয়া গিয়াছে, মুক্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দেখিতেছে ব্যারামে ভুগিতেছে—। যে বাণ ছাড়া হইয়া গিয়াছে তাহাকে আর ফেরৎ আনা যায় না। যাহা করিয়া রাখিয়াছ, এখন করিতেছ না, তাহা ভুগিতেই হইবে।

প্রশ্ন :—প্রারব্ধ ভোগের জন্যই শরীর?

মা—শরীর না থাকিলে কে ভোগ করিবে?

প্রশ্ন :—জ্ঞানী কোন দৃষ্টিতে প্রারব্ধ ভোগ করে আর কে দেখে?

মা—আপনাকে আপনি দেখে। প্রারব্ধ ভোগ থাকিলে ওখানে মুক্তি কই।

প্রশ্ন :—স্বপ্নের ভাল মন্দ ক্রিয়া হয় কি?

মা—স্বপ্নে কাউকে মারিয়া জাগিয়া দেখে যে কিছুই না, এই যে দৃশ্য সবই স্বপ্ন। তুমিও না, সেও না। যাহা দেখ তাহাই স্বপ্নে আসে। তুমিইত সর্ব্বত্র। স্বপ্নে তোমারই সব, জাগ্রতেও তোমারই সব। স্থূল, সূক্ষ্ম, অনন্ত শরীর তোমারই—অনন্ত ও শান্ত একই।

প্রশ্ন :—মৃত্যুর সঙ্গে কি যায়?

মা—বাসনা কামনা সহ তোমারই সূক্ষ্ম শরীর। যেমন ফুলের গন্ধ যায় আসে। তোমারই জন্ম মৃত্যু, আবার জন্ম মৃত্যু কিছুই হয় না। মৃত্যুর পর বাসনা, কামনা সহ সূক্ষ্ম শরীর বায়ু-ভূত নিরাশ্রয়—মানুষ নিজ কর্ম্মানুসারে জন্ম নেয়। বাসনা জড়িত আমি বা অহমিকা যায় আসে—আত্মার আসা যাওয়ার প্রশ্ন নাই। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ—কারণের কারণ আত্মা। তাহার প্রকাশ না হওয়া

পর্য্যন্ত আসা যাওয়া। আত্মা স্বয়ং প্রকাশ, আসা যাওয়া জীবের। নিজকে প্রকাশ করিবার জন্য পর্দ্দা সরান মাত্র।

প্রশ্ন :—মনকে কি করিয়া বশ করা যায়?

মা—হরি চিন্তনেই মন বশ হয়। অভ্যাস যোগ বলে না—সৎসঙ্গ, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, শ্রবণ, জপ-ধ্যান সব রকমের অভ্যাস করা।

প্রশ্ন :—সাধন কি প্রকারে আরম্ভ হয়?

মা—গুরু কৃপায়।

প্রশ্ন :—গুরু কৃপা কিসে হয়?

মা—সৎসঙ্গ কর।

প্রশ্ন :—নিদ্রা কি করিয়া জয় করা যায়?

মা—যখন সিনেমা দেখ তখন নিদ্রা আসে না। বাহিরের ভোগে মন আকৃষ্ট থাকে, নিদ্রা আসে না। জাগ্রতে যে পরিশ্রম হয়, নিদ্রায় বিশ্রাম হয়। নিদ্রায় জীব নিজ স্বরূপে যায় অজ্ঞান আবরণে। যেখানে নিরাবরণ স্বরূপ প্রকাশ সেখানে নিদ্রার প্রশ্ন নাই। ঐ নিরাবরণ স্বরূপ স্থিতিতে ক্রিয়া ও গতি যত বেশী হইবে ততই নিদ্রার প্রয়োজন কম হইবে। শরীরের ক্লান্তিতে নিদ্রা আসে। পরিমিত আহার ও নিদ্রা চাই। তমোগুণে আলস্যেও নিদ্রা বেশী হয়। তমোগুণ যত হইবে নিদ্রাও তত হইবে। সত্ত্বগুণের প্রকাশে নিদ্রা কমিয়া যায়।

২২শে জুন, ১৯৫৫

আজ হইতে অম্বুবাচীর প্রবৃত্তি। মা তাই বেশ সকালেই খাইতে

বসিয়াছেন। খাইতে বসিয়া বলিলেন প্রাণগোপাল বাবুকে দেখিতেছেন পূর্ব্বে যেমন মার কাছে আসিয়া বসিয়া জপ-ধ্যান করিতেন তেমনই তিনখানা আসন বিছাইয়া সহজ ভাবে বসিয়া শুইয়া থাকার জন্য যেন প্রসন্ন ভাবে বসিয়া আছেন। খুব সুন্দর উজ্জল জ্যোতির্ম্ময় চেহারা—ঋষির মত। আওয়াজ বেশ মিষ্ট। ইহার মধ্যে ভোগ লাগাইবার সময় হওয়াতে অন্য ঘরে যেন ভোগ লাগাইবার জন্য গেলেন। ইতিমধ্যে কে একজন আসিয়া (যাহাদের ছোঁয়া চলে না) খাওয়ার ঢাকনী খুলিয়া দেখিয়া চলিয়া গেল। প্রাণগোপাল বাবুর স্থিতিতে উহা যে স্পর্শদোষে দুষ্ট হইয়াছে তাহা বুঝিবার মত নয়। ইহা হইতে গতির অবস্থাও বুঝা যায়। মা যেন দেখিয়াই পুনরায় তাড়াতাড়ি রান্নার ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। সম্মুখে বিরাট উৎসব ময়দানও গঙ্গার মত। সেখানে প্রাণগোপালবাবু সহ মা বেড়াইতে গেলেন। তাহাকে মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি ভোগ হয়ে গেছে?" তিনি বলিলেন—"হ্যাঁ, ঠাকুরজীর সামনে রেখে দেওয়া হয়েছে।" মা বলিলেন—"আচ্ছা, বেড়িয়ে এস। পরে সব কথা হবে।" ভোগ যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহা মা আর বলিলেন না। ভোগ আবার বানান হইলে সব স্পষ্ট করিয়া বলিবেন এইরূপ যেন অভিপ্রায়। প্রাণগোপালবাবু যেন মার কাছে পাকাপাকি থাকার ব্যবস্থা করিয়াই আসিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মা চুপ করিলেন। আর কিছু প্রকাশ করিলেন না। তিনি এখনও মার সঙ্গেই আছেন কিনা তাহাও বোঝা গেল না।

স্বপ্নে ৺প্রাণগোপাল বাবুকে দর্শন।

ইতিমধ্যে মা স্বপ্নে শচীদাদা, উপেনবাবু (মার জ্যেঠাত ভাই),

ডাঃ মহেন্দ্র সরকার, ভোলানাথের বড় ভাই এবং ভাইজীর স্ত্রীকেও দেখিয়াছেন।

আজ রায়বাহাদুর চুণীলাল কাপুরের মেয়ে শীলা ও জামাই আসিয়াছে। কিছুদিন আগে জিপ-দুর্ঘটনায় মার কৃপায় আশ্চর্য্যজনক ভাবে তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। জিপটি মণ্ডীর পথে পাহাড়ের রাস্তা হইতে প্রায় ২৫০ ফিট নীচে পড়িয়া যায়। ভদ্রলোক অলৌকিক ভাবে রক্ষা পাইয়াছেন। বাহিরে তিনি ছিটকাইয়া পড়েন। সামান্য চোট পাইয়া অজ্ঞান হইয়া যান। তিনি বলিতেছিলেন যে মা যেন তাঁহাকে একেবারে কোলে করিয়া বাঁচাইয়াছেন।

আজ বিকালে মা বিন্ধ্যাচলের মোতিয়া তালাওর কাহিনী বলিলেন। সকলেই খুব আনন্দ পাইল। কথায় কথায় মার মুখে প্রকাশ পাইল ইতিমধ্যে মা হরিবাবাকে দেখিয়াছেন যেন একটি নৌকায় হরিবাবা ও মা এবং আমাদের দিক হইতে জাগতিক দিকে অপরিচিত আরও অনেকে আছেন।

২৩শে জুন, ১৯৫৫

আজ সকালে ঋষিকেশ হইতে শ্রীগনেশ দত্ত গোস্বামীজী আসিয়াছেন। ইনি অনেক সময় উত্তরকাশীতে এবং অনেক সময় নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ান। ঋষিকেশে সপ্তর্ষি আশ্রমের প্রতিষ্ঠা ইনিই করিয়াছেন। অনেকেই ইঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করেন। ত্যাগের ভাব খুবই আছে এবং বিশেষ একজন কর্ম্মযোগী। এবার ঋষিকেশে সপ্তর্ষি

মায়ের দর্শনে গোস্বামী গনেশ দত্তজী।

আশ্রমে নভেম্বর মাসে সংযম সপ্তাহ যাহাতে হয় তাহার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাইলেন।

মার সম্বন্ধে কথা প্রসঙ্গে বলিলেন যে তিনি ধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করেন কুলী-মজদুর ও সাধারণ লোকের মধ্যে, আর মা ধর্ম্মভাব প্রবেশ করাইতেছেন রাজা-মহারাজার মধ্যে যেখানে ধর্ম্মের নামও কখনও বোধহয় হয় নাই। বলিলেন ভারতে তিনজন বিশেষ খ্যাতি সম্পন্ন মহাপুরুষ—দক্ষিণে মহর্ষি রমণ ও শ্রীঅরবিন্দ এবং উত্তর ভারতে মাতাজী। বাকী দুইজনত গত হইয়াছেন, এখন একমাত্র মাতাজীর উপরই সকল ভার। আরও বলিলেন যে মাতাজীকে তিনি প্রায় ৩০ বৎসর ধরিয়া শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছেন। পণ্ডিত নেহরুর বাড়ীতে তিনি নাকি প্রায়ই যান। তাঁহার সহিতও মার সম্বন্ধে কথা হয়। তিনিও মাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি করেন।

কাশী হইতে খবর আসিয়াছে কন্যাপীঠের মেয়েরা পাশ করিয়াছে। সেই উপলক্ষ্যে কেহ আজ মার নিকট ২৫৲ টাকার মিষ্টি ভোগ দিলেন। সকলে আনন্দ করিয়া মার হাত হইতে প্রসাদ নিতেছেন। মোতী নামে একটি কুকুর আসিয়া রোজ বিকালে মার নিকট হইতে কিছু প্রসাদ লইয়া যায়। আজ সে আসে নাই। কিন্তু তাহার ভাগও রাখিয়া দেওয়া হইল। মা বলিলেন—“দেখ, অভ্যাসের কি রকম গুণ। সে রোজ আসে, তাই আজ না আসিলেও তাহার ফল উপস্থিত। কিন্তু যদি সে আজ না আসে তবে কাল আর তাহার জন্য তোমরা রাখিবে না। যদি অভ্যাস ছাড়িয়া দেও তবে শক্তি প্রকাশিত হইতে যাইয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়া ফিরিয়া যায়।”

কয়েকদিন হয় কলিকাতা হইতে একটি ছেলে নাম সত্য ভট্টাচার্য্য

বাড়ী ছাড়িয়া সাধু হইবার উদ্দেশ্যে আসিয়াছে। কিন্তু মা তাহাকে কাশী চলিয়া যাইতে বলিলেন যদি সেখানে কোনও চাকুরী পায়। কারণ তাহার স্ত্রী ও অল্প বয়স্কা কন্যা আছে।

২৭শে জুন, ১৯৫৫

আজ দিল্লী হইতে মার দর্শনের জন্য শ্রীমতী কমলা জয়সওয়ালের সঙ্গে পাকিস্তানের হাই কমিশনার রাজা গজনফর আলি খান আসিয়াছেন।

মাতৃ সকাশে পাকিস্তানের রাজদূত।

তিনি ইতিপূর্ব্বেও মার কাছে কয়েকবার আসিয়াছেন। মুসলমান হইলেও কীর্ত্তন বড় ভালবাসেন। শুনিতে শুনিতে তাঁহার চোখ দিয়া জল ঝড়িয়া পড়ে। শুনিয়াছি ইহার পূর্ব্বপুরুষ রাজপুত ছিলেন এবং এখনও রাজা উপাধি ব্যবহার করেন। মাকে তিনি বলিলেন —"আমি সকলকেই মাতাজীর দর্শন করিতে বলি। সকলে দর্শন করিয়া আনন্দও পায়।" মা হাসিয়া বলিলেন—"এ শরীরটার সঙ্গে সকলের আত্মিক সম্বন্ধ। তাই সকলেই এই শরীরটার আপন।"

কমলার সহিত মিসেস্ পুরী আসিয়াছেন। তাহার ছোট মেয়েটিকে মা বলিতেছেন—"দোস্তজী, তুমি আমার দোস্ত তো? সব বাচ্চারাই আমার দোস্ত। আর তাহাদের বাবারা-মারা এই শরীরের মা-বাবা। তবে আর কেউ বাদ গেল না।"

রাজা গজনফর আলী কিছুক্ষণ মার নিকট বসিয়া কসৌলী চলিয়া গেলেন। সেখানেই আহারাদি করিবেন।

বিকালে পণ্ডিত নেহরুর সেক্রেটারী শ্রীউপাধ্যায়জী দুইটি মেয়ে সহ

মার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। মা রাত্রে অনেক পুরাতন গল্প করিলেন।

কমলা নেহরু প্রসঙ্গে।

কমলা নেহরু যে সময় দেরাতুনে মার কাছে আসিতেন তখনও উপাধ্যায়জী সঙ্গে আসিতেন। কমলাজী বেশ লম্বা ও সুশ্রী ছিলেন। মার একটু ইঙ্গিত পাইলে তিনি হয়ত মার নিকটই স্থায়ীভাবে আসিয়া পড়িতেন। অনেক সময়ই বলিতেন—"মা, আপনি বলেনত গান্ধীজীকে ছাড়িয়া আপনার কাছেই আসিয়া পড়ি।" বেশ একভাবে স্থির হইয়া ধ্যানে বসিবার অভ্যাস ছিল। শরীরে হয়ত পিপড়া উঠিয়াছে—কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই। উপাধ্যায়জী নাকি খেয়াল করিয়া তাহা ঝাড়িয়া ফেলিতেন মাঝে মাঝে।

মা আরও বলিলেন কমলাজী মার নিকট আসিয়া শুইয়া থাকিতেন। সকলে চলিয়া গেলে তিনি চুপচাপ মার কাছে আসিতেন আবার কেহ আসিবার আগেই ভোর ৬টায় উঠিয়া চলিয়া যাইতেন। তখনও দেরাতুনে মার কোনও আশ্রম হয় নাই। আজকালকার মত কোন স্থানই ছিল না। মারত ঐ সব দিকে একেবারেই খেয়াল নাই। নতুবা মা একটু মত দিলেই কমলাজী হয়ত নিজেই একটি স্থান করিয়া দিতেন। মা থাকিতেন ঘুরিয়া ফিরিয়া—কখনও আনন্দচকে—কখনও কোথাও—কখনও কোথাও। মা সেই সময়ই সোলন আসিয়া একটি গুহায় ১৫ দিন ছিলেন। একদিন দেখেন অখণ্ডানন্দজীর গৈরিক বেশ। মার খেয়াল হইল তাই হরিদ্বার আসিয়া অখণ্ডানন্দজীকে তার ও চিঠি দিয়া আনাইয়া সন্ন্যাস নেওয়ান।

ইহার কিছুদিন পর কিষণপুর আশ্রম প্রতিষ্ঠা হইল। কমলাজীর কঠিন রোগ—মাকে আলমোড়া যাওয়ার পথে ভাওয়ালী স্যানাটো-

রিয়ামে নিয়া যাওয়া হইল তাঁহাকে দেখিবার জন্য। চিকিৎসকদের অমতেই কমলাজী মার সঙ্গে দেখা করিলেন। পুনরায় আলমোড়া হইতে ফিরিবার পথেও ভাওয়ালীতে দেখা হইল। সেই শেষ দেখা। তাহার পর কমলাজী সুইজারল্যাণ্ডে গেলেন আর ফিরিয়া এলেন না। সেই সব স্মৃতি এখনও কিছু কিছু কন্যা ইন্দিরার বুকে গাঁথা আছে—অবশ্য সে তখন খুবই ছোট। পণ্ডিতজীরও অনেক কিছুই জানা আছে। মার প্রতি তাই তাঁহার শ্রদ্ধা এখনও অক্ষুণ্ণই আছে। অবশ্য সময়াভাবে তিনি মার নিকট বেশী আসিতে পারেন না ইহা সত্য।

২৮শে জুন, ১৯৫৫

কাল হইতে খুবই বৃষ্টি চলিতেছে। কলিকাতা হইতে গঙ্গাচরণ দাদার চিঠি আসিয়াছে। ভাইজীর স্ত্রী দেহত্যাগের দিন মধ্যাহ্নে আহার করিতে বসিয়া বলিলেন বুকে একটু ব্যথা। নীচ হইতে তাঁহার ভগ্নিপতি ডাক্তার আসিয়া দেখেন দুই মিনিটের মধ্যেই তাঁহার প্রাণ চলিয়া গিয়াছে। হার্টটি নাকি একটু দুর্ব্বল ছিল। ছেলে কলিকাতায় ছিল। সে ১৫।১৬ দিন পরে যাইতে পারে।

আজ দুপুরে কলিকাতা হইতে কুমারী চিত্রা * আসিয়াছে। সে সদ্য দুই বৎসর অ্যামেরিকায় থাকিয়া আসিয়াছে। সেখানে স্কলারসিপ্‌ লইয়া গিয়াছিল উদ্ভিদ্‌ বিদ্যায় শিক্ষা গ্রহণ করিতে।

---

* কুমারী চিত্রা ঘোষ, এম, এ, (ঈশান স্কলার)—অবসরপ্রাপ্ত Director of Education শ্রীএস, কে, ঘোষের কন্যা। ইনি বর্ত্তমানে স্থায়ীভাবে আশ্রম জীবন যাপন করিতেছেন।

চিত্রা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ কৃতী ছাত্রী। আজ দুই বৎসর পর মার দর্শন পাইয়া মার কাছে আসিয়া আনন্দে মাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। যাওয়ার সময় মা তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন—"যেমনটি যাচ্ছ তেমনটিই ফিরে এসো।" মার উপর একটা বিশেষ আকর্ষণ। অ্যামেরিকা হইতে প্রায়ই অতি সুন্দর সুন্দর চিঠি মার নিকট লিখিত। মাও তাহার জবাবে অতি সুন্দর সব বাণী পাঠাইতে বলিতেন। মা রাজা সাহেবের সঙ্গে তাহার পরিচয় করাইয়া দিলেন।

কথা হইল এখন হইতে বাংলা মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার সকলে সংযম পালন করিবে। বিশেষ কোনও কারণে না হইলে শেষ বৃহস্পতিবার। সকাল ৫টায় উষা কীর্ত্তনের পর স্নান ও নিত্য কীর্ত্তন। ৮টার পাঁচ মিনিট আগে শঙ্খ বাজিলে সকলে নিজ নিজ আসনে বসিবেন। ৮টা হইতে ৮৷৷টা পর্য্যন্ত মৌন ধ্যান। ধ্যানের পরে গুরু-প্রণাম এবং ৫ মিনিট কীর্ত্তন। তাহার পর গীতা পাঠ তিন অধ্যায়, চণ্ডীপাঠ, উপনিষৎ পাঠ, ভাগবৎ পাঠ এবং সর্ব্বশেষে ১৫ মিনিট কীর্ত্তন। দুপুরে একপদ ডাল বা শব্জীর সহিত ভাত বা রুটী ও দৈ। দুপুরে পুনরায় ৩টা হইতে ৩৷৷টা ধ্যান, ৩৷৷টা হইতে ৪টা পাঠ এবং ৪টা হইতে ৫টা ধর্ম্মালোচনা ও কীর্ত্তন। সন্ধ্যাবেলা ৭টা হইতে ৭৷৷টা পর্য্যন্ত মহিম্ন স্তোত্র পাঠ। তাহার পর পৌনে নয়টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন এবং পরে নিত্য মৌন। রাত্রে দেড় পোয়া দুধ পান।

১লা জুলাই, ১৯৫৫

আজ হোসিয়ারপুর হইতে আম্বের রাণীসাহেব দুইটি ছেলে এবং

রাজা সাহেব সহ আসিয়াছেন। কলিকাতার আশু বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রহশান্তি অনুষ্ঠান করাইতেছেন এখানেই মায়ের নিকট। মা এবার কিছু সময়ের জন্য সেখানে গিয়া বসিয়াছিলেন। সারাদিন প্রায় লাগিয়া গেল।

আজ কমলের সঙ্গে কাশী হইতে গোপালের মা আসিয়াছে। তাহার সঙ্গে রাত্রে মার অনেক কথা হইল। আমরা সকলে হাসিতেছিলাম আবার দুঃখও হইতেছিল তাহার মুখে সব করুণ কথা শুনিয়া। বিড়াল তাহার বড়ই প্রিয়। কিভাবে তাহার প্রিয় বড় বিড়ালটিকে সে মারা যাওয়ার দিন কোলে নিয়াছিল, কিভাবে তাহার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ হইল, কিভাবে তাহাকে গঙ্গায় ভাসাইয়া দিল, ছোট বাচ্চা দুইটি কিভাবে আশ্রম হইতে কোথায় চলিয়া গেল ইত্যাদি—ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া মায়ের নিকট তাহার ব্যথাভরা বুকটা হালকা করিতেছিল। লীলাময়ী করুণাময়ী মার কি অপূর্ব্ব লীলা!

আজ কি কথা প্রসঙ্গে মা বলিতেছিলেন যে শক্তিশালী না হইলে কিছু উপদেশ দিলে কেহ শুনিবে না, উল্টা অন্যায় বলিবে তাহাতে চিত্ত আরও বিক্ষিপ্ত হইবে। তাই নিজ শক্তি বৃদ্ধি করিবার যাহারা পথ নিয়াছে তাহারা অপরকে উপদেশ বিশেষ দিবে না। শিক্ষকের বা গুরুর স্থান অধিকার করা তাহার কর্ত্তব্য নয়।

গুরু ও দীক্ষা দান প্রসঙ্গ।

গুরু সম্বন্ধেও নানা আলোচনা হইল। নানারকমে গুরুকরণ হইতে পারে—দৃষ্টি দ্বারা, বাক্য দ্বারা, স্পর্শ দ্বারা ইত্যাদি নানা ভাবে। মহাপুরুষরা শক্তির প্লাবনেও সব ভাসাইয়া লইতে পারেন। আধার

অনুসারে শক্তি লাভ হইয়া থাকে। গুরুর স্থিতি অনুসারে শিষ্যের অবস্থান হয়। তাহার উপরে যাইতে পারে না। যেমন ভগবৎ কথা শুন—বক্তার যতটা শক্তি সেই সঙ্গে তোমাকে যুক্ত করিয়া দেয়। এক হয় সৎ কথার ফল, আর যে বলে তাঁহার শক্তি—এই দুই-ই পায়। গ্রহীতা তেমন শক্তিশালী হইলে উপদেশ মাত্র জ্ঞান হয়। উপদেশ দ্বারা দীক্ষা—যে উপদেশে নিগ্রন্থি হইয়া যায়। মন্ত্র দীক্ষায় যতটা শক্তি আছে ততটাইত দিবে। শক্তিশালী হইলে স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে বা দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে লক্ষের স্থানে পৌছাইয়া দিতে পারেন। অন্ততঃ যাহার যতটা শক্তি ততদূর নিয়া যাইতে পারে। গুরু যদি অগ্রসর না হয় শিষ্য তাহার আগে যাইতে পারে না। শিষ্যকে এই জন্য রাস্তায় অপেক্ষাও করিতে হয় যতক্ষণ পর্য্যন্ত গুরু অগ্রসর না হয়। আবার অনেক সময় শিষ্য গুরুর আগেও পৌছিয়া যাইতে পারে। পূর্ব্ব সংস্কার অনুযায়ী দীক্ষা নিয়া নিজের অন্তর্শক্তি এত বাড়িয়া যায় যে গুরুর আগেও চলিয়া যাইতে পারে। দীক্ষা যে নিল তাহার শুধু এতটাই পাওয়ার বাকী ছিল। যেখানে আমার গুরু জগদ্‌গুরু—জগদ্‌গুরু আমার গুরু। জগত মানে গতি, আর বদ্ধ মানে জীব। জগদ্‌গুরুর যে স্থিতি তাহার প্রকাশ। যেখানে 'আমি' কে তাহার প্রকাশের শক্তি যিনি দিতে পারেন তিনিই জগদ্‌গুরু। গাঢ় অন্ধকার হইতে যিনি নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিতে পারেন—তিনিইত গুরু। তোমার গুরু হরেক রকমে প্রত্যেকের নিকট আছেন। আর প্রত্যেকের গুরু তোমারই গুরু। দেখ গুরু তবে কিন্তু একই হইলেন।

দান সম্বন্ধেও কথা হইল যে অপাত্রে দান হইলে তাহার ফলভোগ

হইবেই। তবে নিষ্কাম ঈশ্বর বুদ্ধিতে দান করিলে তাহার জন্য বন্ধন হয় না।

যে ভগবানকে পাওয়ার চেষ্টা করিতেছে আর ইহারই মধ্যে দীক্ষা দিতে আরম্ভ করিল, তবে তাহাকে ঐ স্থানেই থাকিতে হইবে।

আবার উপদেশ নাই, দৃষ্টি নাই, স্পর্শ নাই, মন্ত্র নাই, কিন্তু যাহার শক্তিপাত হইয়াছে সে হয়ত তখনই বুঝিতে পারে। অথবা বহু পরেও বুঝিতে পারে। যেখান হইতে শক্তিপাত হয় বন্যায় যেমন সমান ভাবে সব ভাসাইয়া নিয়া যায় তেমন সব ভাসাইয়া দেয়। এখানে স্বভাব আপনার মধ্যে আপন করিয়া নেওয়া। অপরের নিকট হইতে দীক্ষা নিয়াছে, এই স্থান হইতে নেয় নাই, এই কথা তখন আর টিঁকে না। তাঁহারই না? তিনিই নয়? ঐ মহান শক্তি স্বাভাবিক রীতিতে আপনাকে আপনি করিয়া নেয়। স্ব-স্ব প্রকাশ— স্ব-ই একমাত্র। কতটা শক্তিপাত করা হইয়াছে তাহারত লিষ্টি করা কখনও হয় না।

একজনে এক গুরুর নিকট দীক্ষা নিয়াছে। পরে তাহার এক মহাত্মার দর্শন হয়। তাঁহার নিকটও সে যাতায়াত করে। তাঁহাকেও ভাল লাগিয়াছে। গুরু শুনিয়া চটিয়া গেলেন—"আরে, আমি বাগান লাগাইয়াছি আর তুই অপরকে দিয়া খাওয়াচ্ছিস্?" শিষ্য বলিল— "ঐ মহাত্মার নিকট যাতায়াতে আমার গুরুর নিষ্ঠা বাড়িয়া গিয়াছে।" কিন্তু গুরু তাহা বুঝিল না।

কথাপ্রসঙ্গে মা আবার বলিতেছেন—"পূজার উদ্দেশ্য—ইষ্ট প্রকাশ, আপনাকে পাওয়া আত্মপ্রকাশের জন্য—যাঁহার পূজা করিলে অদ্বৈত-দ্বৈতের প্রশ্ন আসে না তাঁহার পূজা করা। ভগবানের জন্য পূজা

নিষ্কাম পূজা। যতক্ষণ অজ্ঞান ততক্ষণ প্রশ্ন। যে লাইনে চলে সেই বিদ্যা আসিয়াই যায়। যেমন পড়া—পাশ করা। সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যার জন্যও জ্ঞানদাতা ভগবানকে জানার চেষ্টা করা। অর্থকরী বিদ্যায় বাসনা-কামনা, ভোগ করিয়া করিয়া Slow poisoning—ধীরে ধীরে মৃত্যু দশা। তুমি অমরযাত্রী হইয়া যাও—অমৃত স্বরূপ হও।"

অপ্রিয় সত্য বলা উচিত কি না সেই প্রসঙ্গে মা বলিতেছেন—"গীতায় তো বলা হইয়াছে যে অপ্রিয় সত্য বলিবে না। পৃথিবীশুদ্ধ লোককে তুমি বলার কে? তোমার কথা তাহারা শুনিবে কেন? তোমার যদি সেই শক্তি থাকে যে বলিলে তাহারা শুনিবে তবেই বলা উচিত। নতুবা তোমার মন ক্ষিপ্ত হইবে—সাধনায় ব্যাঘাত হইবে। তোমার Sensitive মনে আঘাত লাগিবে যে 'আমার কথা' ইহারা শুনিল না। অবশ্য বন্ধু বা মিত্রকে বলিতে পার। বন্ধু মানে যাহারা সঙ্গে হৃদয়ের বন্ধন আছে, সেই পরম বন্ধুকে লাভ করার পথে যিনি সহায়ক হন। আর শত্রু হল যিনি মৃত্যুর দিকে নিয়া যান।"

৫ই জুলাই, ১৯৫৫

সোলনে গুরুপূর্ণিমা উৎসব।

আজ গুরুপূর্ণিমার উৎসব। ভোর সাড়ে চারটা হইতে কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। আটটার সময় পূজা আরম্ভ হইলে একজন নাম রক্ষা করিতে লাগিলেন। কলিকাতা হইতে বুনি প্রভৃতি কয়েকজন আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সঙ্গে রজনীগন্ধার মালা, পদ্মফুল ইত্যাদি অনেক কিছু লইয়া আসিয়াছে। মাকে ঐ সব দিয়া অতি সুন্দর

ভাবে সাজান হইল। পূজার সময় মায়ের একটু ভাবান্তর লক্ষ সকলেই করিলেন। চক্ষু বন্ধ করিয়া যেন কোন লোকে চলিয়া গিয়াছেন। যোগীভাই মাকে অনুরোধ করিয়া আনিয়াছিলেন পূজার স্থানে। তিনিই আবার মাকে ঘরে লইয়া গেলেন। পুজান্তে নীরদাদা সকলকে দিয়া অঞ্জলী দেওয়াইলেন। সেই ১৯৪৬ সনে সোলনে গুরু-পূর্ণিমা উৎসব হইয়াছিল। আর এত দিন পরে আবার আজ। সোলনবাসী ভক্ত স্ত্রী-পুরুষদের তাই আনন্দ আর ধরে না।

দশটার সময় পূজা সমাপ্ত হইলে একদিকে হোম সুরু হইল এবং অপর দিকে নিত্য গীতাপাঠ ইত্যাদি। কীর্ত্তন বেলা চারটা পর্য্যন্ত চলিবে। বেলা প্রায় দুইটার পরে মা একটু বিশ্রাম করিতে গিয়াছেন। কিন্তু মার আর শোয়া হইল না। একটু পরেই মা নিজ হইতে কীর্ত্তনের স্থানে আসিয়া খুব জোরে কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। মা বলিলেন—"কি করা, ওরা কীর্ত্তন করছে, তাই শোয়ার ভাব নেই।" এইরূপে বেলা চারটা পর্য্যন্ত বেশ ধুম কীর্ত্তন চলিল। তাহার পর পাঠ। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা পর্যান্ত গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা চলিল। তাহার পর মা বাহিরে আসিলে সকলকে আম বিতরণ করা হইল।

আজ বিকালে গঙ্গাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল। যাদবপুর হাসপাতালে তাহার ভর্ত্তির ব্যবস্থা হইয়াছে। সঙ্গে কমল, কান্তিভাই এবং প্রিয়রঞ্জন গেল। মা উপর পর্যান্ত গিয়া তাহাদের বিদায় দিলেন। গঙ্গা নিতান্ত অসুস্থ শরীর লইয়া চলিয়া গেল। তাহার জন্য সকলেরই মনটা বিশেষ খারাপ। মার কৃপায় সুস্থ হইয়া পুনরায় আশ্রমে ফিরিয়া আসে তবেই সকলের আনন্দ।

৬ই জুলাই, ১৯৫৫

আজ বিকালে ঘুরিতে ঘুরিতে মা মোতীর সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। মার কথায় পরিষ্কার বুঝা গেল মোতীই পূর্ব্বে বাজিতপুরে টম্‌টম্ নামে ছিল। তখন সে গরীব ভাবে দিন কটাইয়াছে—এখন রাজার বাড়ীতে থাকিয়া জন্ম পূরণ করিতে আসিয়াছে। বাজিতপুরে তখন মার সাধনার খেলা চলিতেছে। মা রাত্রে বসিতেন কখনো কখনো সকাল হইয়া যাইত। রাত্রেও মা যদি কখনও বাহিরে যাইবেন টম্‌টম্ কোথা হইতে আসিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকিত। মা হয়ত পুকুর ঘাটে গিয়াছেন রান্নাঘর সব খোলা আঢাকা অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু টম্‌টম্ পাহারাদার। ও মুখত দিতই না বরং সব ভালভাবে আগলাইয়া রাখিত।

মোতীর সম্বন্ধে নানা কথা।

আজ নীরজদাদারা রওনা হইয়া গেলেন। বীথু এখন সুস্থ আছে। তাহার কলেজ শীঘ্রই খুলিয়া যাইতেছে। তাই যাইতে হইল।

১১ই জুলাই, ১৯৫৫

আজ আমাদের সোলন ত্যাগ করিবার দিন। মার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই আজ চলিয়া যাইতেছে। এ দিকে হঠাৎ খবর আসিল মোতী মোটর দুর্ঘটনায় আহত হইয়াছে। আশ্রমের রোয়াকের উপর শুইয়া আছে। দেখা গেল বেচারার পায়ে চোট লাগিয়াছে।

সোলন হইতে বিদায়।

মা নিত্যকার মত রসগোল্লা খাওয়াইতে গেলেন। কিন্তু আজ আর তাহার ঐ প্রিয় বস্তুটির প্রতি আগ্রহ দেখা গেল না, শুধু মার আঙ্গুল কয়টি একটু চাটিল।

সোলনে রাজা সাহেবের সর্ব্বদিকে সুব্যবস্থার মধ্যে থাকিয়া মার অসংখ্য ভক্ত এবার দীর্ঘসময় মাতৃসঙ্গের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। সোলন ত্যাগের পূর্ব্বক্ষণে আজ সকলের মনেই এই নিরভিমানী একান্ত মাতৃগতপ্রাণ একনিষ্ঠ ভক্তের কথা বিশেষ করিয়া মনে আসিতেছে।

যাত্রার সময় আসিয়া গেল। ধীরে ধীরে আমাকে ambulanceএ শোয়াইয়া দেওয়া হইল। মাকে হয়ত এবার দীর্ঘসময় আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে হইবে। আমার চোখে জল দেখিয়া মা বলিলেন— "একি! এখনত প্লাস্টার খুলিতে যাইতেছ, এখন আবার কান্না কেন?" মাও মোটরে উঠিলেন। আমরা সকলে একসঙ্গেই রওনা হইলাম। কালকা ষ্টেশন হইতে রাত্রি প্রায় পৌনে বারটায় আমাদের ট্রেণ ছাড়িল। আমি মার কামরাতেই রহিলাম। রাত্রি প্রায় আড়াইটায় ট্রেন আম্বালা ষ্টেশনে পৌছিলে মা নামিয়া গেলেন। মা দেরাদুনের দিকে যাইতেছেন। আমি বম্বের পথে।

১২ই জুলাই, ১৯৫৫

ভোর প্রায় সাড়ে ছয়টায় আমি দিল্লী আসিয়া পৌছিলাম। পূর্ব্ব হইতেই শ্রীযুক্ত বি. কে. শাহর ব্যবস্থায় বম্বের গাড়ীতে রিজার্ভেশন ঠিক করা ছিল। আমাকে ট্রলিতে করিয়া নিয়া কামরার

ভিতরেও সেই ট্রলিতেই শোয়াইয়া দিল। বম্বেতে গত ডিসেম্বর মাসে যখন আমার প্ল্যাস্টার পড়ান হয় তখনই ডাঃ শেঠ এইরূপ একটি ট্রলির ব্যবস্থা করেন যাহাতে প্ল্যাস্টার পড়া অবস্থায়ও আমার পক্ষে ঘোরাফেরা সম্ভব হয়।

দিল্লী ষ্টেশনে আমার সঙ্গে দেখা করিতে অনেকেই আসিলেন। মেয়েদের মধ্যে বেলু, বিল্লো, বিশুদ্ধা ও রেণু প্রভৃতি আমার সঙ্গে।

১৩ই জুলাই, ১৯৫৫

সকাল প্রায় সাড়ে আটটায় বম্বে আসিয়া পৌছিলাম। স্টেশনে শ্রীযুক্ত বি, কে, শাহ, লীলাবেন, ডাঃ কৃষ্ণমূর্ত্তি, সোপোরী সাহেব, মূলজীভাই প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। আমাকে অ্যাম্বুলেন্সে Breach Candy House-এ লইয়া আসিলেন। এই বাড়ীটি একেবারে সমুদ্রের উপরে। দৃশ্য অতি সুন্দর—চমৎকার ব্যবস্থা।

১৬ই জুলাই, ১৯৫৫

পরশু প্রসিদ্ধ German Radiologist Dr. Kronenbergerকে দিয়া আমার X-ray নেওয়া হইয়াছিল। আজ বিখ্যাত সার্জ্জন ডাঃ বালিগা X-ray plates পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে ফল অতিশয় সন্তোষজনক হইয়াছে। হাড় এত উত্তমরূপে জোড়া লাগিয়াছে যে মনে হয় যেন কেহ অপারেশন করিয়া সেট্ করিয়া দিয়াছে। এইরূপ সুন্দর সেট্ হইতে প্রায় দুই বৎসর সময় লাগিবার কথা। ডাক্তার-

দের মত হইল আর প্ল্যাষ্টার ব্যবহার করার প্রয়োজন হইবে না। তাই আজ হইতে উহা খুলিয়া ফেলা হইল। মাকে এবং হরিবাবাজীকে এই সংবাদ তারে জানাইয়া দেওয়া হইল। তবে শুনিলাম এখনও দুই মাস বিছানায় শুইয়া থাকিতে হইবে; তাহার পর নড়াচড়া করিবার অনুমতি দিবে।

১৭ই জুলাই, ১৯৫৫

দেরাদুন হইতে বুনির পত্রে জানিলাম মা আম্বালা হইতে ট্রেণে সাহারাণপুর গিয়া সেখান হইতে মোটরে সোজা কিশনপুর আশ্রমে গিয়া পৌঁছিয়াছেন। গত ১৫ই বিকালে মা রায়পুর গিয়াছিলেন; সঙ্গে আরও অনেকে গিয়াছিল। শাশ্বতানন্দজীকে সেখানে রাখিয়া দত্তাত্রেয়ানন্দকে মা সঙ্গে নিয়া আসিয়াছেন। রায়পুর হইতে ফিরিবার পথে মা আনন্দচকেও যান এবং চিত্রাদের সব দেখাইয়া আসেন। তাহারা পূর্ব্বে এই সব আর কখনও দেখে নাই। কিছুদিন হয় পাঞ্জাবী মেয়ে কৃপালও চাকুরী ছাড়িয়া মার কাছে আসিয়াছে স্থায়ী ভাবে আশ্রমে থাকিবার জন্য। সেও মার কাছেই আছে।

দেরাদুনে মা।

চিত্রাও লিখিতেছে যে বিকালের দিকে বেশ ভীর হয়। প্রায়ই মা ঐ সময় কল্যাণবনের দিকে বেড়াইতে যান। মা নিজের মনে কখনও বিশ্রাম করেন, কখনও ঘুরিয়া বেড়ান। কখনও কখনও সারা রাত আবার শুইবার ভাবই নাই।

দুইজনের চিঠিতেই একটি অদ্ভুত ঘটনার কথা জানিলাম।

আমাদের কল্যাণবনের বাগানে একটি গাছে বেশ সুন্দর দুইটি আম হইয়াছে। ঐরূপ রূপ ও রং নাকি সচরাচর দেখা যায় না। ঐ আম সম্বন্ধে মা নাকি অনেক পুরাতন কথা বলিয়াছেন। ছোট বেলায় নাকি একবার বৈশাখ মাসে মা দিদিমাকে বলিয়াছিলেন যে বৎসরের প্রথম আম ঠাকুরকে দেয় আর তাঁহারা দিবেন না? দিদিমা বলেন—"আমাদেরত বাগান নাই। আমরা আম কোথা থেকে পাব?" তাহাছাড়া দিদিমার নাকি মার উপর নিষেধ ছিল যে অপরের বাগানের আম যেন ঢিল ছুড়িয়া না পারে। মা এই সব কথার পর পুকুর পাড়ে স্নানে গিয়াছেন। দেখেন যে একটা গাছের খুব উঁচু একটি ডালে দুইটি অদ্ভুত গড়ণের আম ফলিয়া আছে। স্নান করিয়া ফিরিবার সময় তাহারই মধ্যে একটি আম মাটিতে পড়া দেখিয়া সেইটি লইয়া আসিয়া দিদিমাকে দিলেন। দিদিমা ভয় পাইয়া মাকে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথায় পেলি?" মাত মিথ্যা কথা বলেন না। গাছের তলায় পাইয়াছেন শুনিয়া দিদিমা তাহা ঠাকুরকে দিলেন।

কল্যাণবনের দুইটি আমের কথা।

কল্যাণবনে যে দুইটি আম হইয়াছে তাহা নাকি দেখিতে ঠিক সেইরূপ। মা বলিয়াছেন—"এতদিন কিন্তু আর সেই রকম কেনও আম দেখা যায়নি।"

আর একবার নাকি কথায় কথায় দিদিমা মাকে বলিয়াছিলেন—"এই দিনে সকলেই আম দুধ খায়। কিন্তু তোমাদের এমনই বরাত যে একটা আমও নাই যে আম খাবি।" এই কথার একটু পরেই মা তাঁহার ঠাকুরমার সঙ্গে ঢেঁকীশাক কুড়াইতে গিয়া সেই শাকবনে

একটি অদ্ভূত বড় আম পড়িয়া থাকিতে দেখেন। তাহার আশে-পাশে কিন্তু কোনও আমের গাছ নাই। মা উহা আনিয়া দিদিমাকে দেন। বলিলেন—"শাকবনে পেয়েছি।" দিদিমা জানিতেন যে মা কখনও মিথ্যা বলেন না। তিনি তাই মহা খুসী হইয়া ঐ আম দিয়া সকলকে আম-দুধ খাইতে দেন। আশ্চর্য্য এই যে খাওয়ার পর অনেক খোঁজ করিয়াও আমের আঁটিটি আর পাওয়া গেল না।

সংবাদ পাওয়া গেল যে কল্যাণবনের আম দুইটির ফটো তোলা হইয়াছে।

২০শে জুলাই, ১৯৫৫

দেরাদুন হইতে কুসুম ব্রহ্মচারীর পত্রে জানিলাম যে পরশু সকালে মাকে সেখানকার কলেক্টর এবং আরও কয়েকজন ভক্তের বাড়ীতে নিয়া যাওয়া হইয়াছিল। পরে নরেশের বাড়ীতে মার ভোগ ও কীর্ত্তনাদি হয়। খাওয়াদাওয়ার পর মা দিল্লীর নরেশ কাশ্যপের গাড়ীতে হরিদ্বার রওনা হইয়া গিয়াছেন। সঙ্গে আরও অনেকে গিয়াছে।

২৩শে জুলাই, ১৯৫৫

কুসুমের পত্রে জানিলাম যে মা গত ২০শে সকালে মোটরে কিশনপুর আশ্রমে ফিরিয়া গিয়াছেন। মা হরিদ্বারে পৌছিয়াই বিকালে রিক্সায় ব্রহ্মকুণ্ডে যান। পরদিন চতুর্দ্দশী—গঙ্গাস্নানেরও যোগ ছিল। সকালে খুব জোর বৃষ্টি হইতেছিল! মা বৃষ্টির মধ্যেই পায়ে হাঁটিয়া

সকলকে লইয়া আবার ব্রহ্মকুণ্ডের দিকে রওনা হইলেন। খড়খড়ির মোড়ে গিয়া এত কাদা যে মাকে বলিয়া কহিয়া রিক্সায় বসান হয়। ব্রহ্মকুণ্ডে প্রচণ্ড ভীর। মার সঙ্গে অনেকেই আছে। হঠাৎ মার দৃষ্টি পড়িল স্বামী প্রকাশানন্দের উপর। বলিয়া উঠিলেন—"তোর চুলগুলি দিবি নাকি?" প্রকাশানন্দ বলিল—"তোমার যখন বলা আসল তখন নিশ্চয়ই। আর সকলেও কি একসঙ্গেই নাকি?" মা একটু হাসিয়া বলিলেন—"আর সকলকে কেন জড়াচ্ছ, বাপু? তুমি হলে সন্ন্যাসী—ওরা হচ্ছে ব্রহ্মচারী। ইচ্ছা হলে রাখবে—ইচ্ছা হলে ফেলবে।" অগত্যা প্রকাশানন্দজী স্নান করিয়া মুণ্ডিত মস্তকে মাকে প্রণাম করিলেন। সঙ্গীয় সকলেই স্নান করিল। মা আর স্নান করিলেন না।

বিকালে মা সকলকে নিয়া আবার সপ্তসরোবর গিয়াছিলেন। চিত্রা ঝর্ণা প্রভৃতি যাহারা লছমনঝোলা দেখে নাই তাহারা গিয়া সকলেই ঘুরিয়া আসিয়াছে। মা আর যান নাই।

২৫শে জুলাই, ১৯৫৫

দেরাদুন হইতে পত্র আসিয়াছে বম্বে হইতে ভাইয়া (শ্রী বি, কে, শাহ) গত ২১শে রাত্রে মার কাছে দেরাদুন গিয়াছিলেন। পরদিন সকালে মাকে নিয়া তিনি টপকেশ্বর গিয়াছিলেন। আজ মার দিল্লী রওনা হইবার কথা। সেখানে ২।৩ দিন থাকিয়া বৃন্দাবন যাইবেন।

ভাইয়াত ইতিমধ্যে দেরাদুন হইতে দিল্লী হইয়া বম্বে ফিরিয়া আসিয়াছেন। মা আমার জন্য বাগানের কয়েকটি আম পাঠাইয়াছেন। ভাইয়ার মুখে মার অনেক কথা শুনিলাম।

২৭শে জুলাই, ১৯৫৫

কুসুম দিল্লী হইতে লিখিতেছে যে মা গত কাল দিল্লী আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। স্টেশনে নিউ ইণ্ডিয়ার পক্ষ হইতে অনেকেই ছিলেন —মার ভক্তদের মধ্যেও বহু লোক উপস্থিত ছিলেন। নিউ ইণ্ডিয়ার ম্যানেজার হুন সাহেবের গাড়ীতে মা সোজা আশ্রমে চলিয়া যান। দিল্লী পৌঁছিয়াই স্টেশন হইতে মা দিদিমার সঙ্গে এক পার্টিকে বৃন্দাবন পাঠাইয়া দিয়াছেন। গতকাল আশ্রমে ডাঃ সন্তোষ সেন মার দর্শনের জন্য গিয়াছেন।

দিল্লী আশ্রমে দুই দিন।

৩০শে জুলাই, ১৯৫৫

দিল্লীর পত্রে জানিলাম গত ২৮শে সূর্য্যোদয় হইতে গতকাল সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত অখণ্ড কীর্ত্তন হইয়াছে। কীর্ত্তন সমাপ্ত হইবার পরই মা মোটরে বৃন্দাবন রওনা হইয়া গিয়াছেন। যোগীভাই সোলন হইতে দিল্লী আসিয়াছেন। তাঁহার গাড়ীতেই মা বৃন্দাবন গিয়াছেন।

১লা আগষ্ট, ১৯৫৫

বৃন্দাবন হইতে কুসুমের পত্রে জানিলাম যে মার আগমন উপলক্ষ্যে হরিবাবাজী আশ্রমের সম্মুখভাগ সাজাইয়া গুছাইয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিলেন। রাস্তার উপর কাপড় বিছান ছিল—দুপাশে সব রঙীন

পতাকা সাজান। হরিবাবাজী নিজে কীর্ত্তন করিয়া মাকে আশ্রমের ভিতর নিয়া যান।

মার প্রোগ্রাম পূর্ব্বে জানা না থাকায় তিনি ঝুলন উপলক্ষ্যে পূর্ব্বেই মৈনপুরী যাওয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাই পাঁচ দিনের জন্য হরিবাবাজী মৈনপুরী চলিয়া গিয়াছেন।

একাদশীর দিন হইতে বৃন্দাবন আশ্রমে ঝুলন উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। জন্মাষ্টমীতে গোয়ালিওর যাওয়ার জন্য গোয়ালিওরের মহারাণী সাহেবা বিশেষ অনুরোধ করিয়া পত্র দিয়াছেন। কিন্তু উপস্থিত মার বৃন্দাবনেই থাকার কথা।

৩রা অগাষ্ট, ১৯৫৫

বৃন্দাবনের পত্রে জানিলাম শ্রীযুক্ত রাওয়াৎজী মাকে লইয়া ইতিমধ্যে একদিন গোবর্দ্ধন গিয়াছিলেন। সঙ্গে অনেকেই গিয়াছিলেন। বেশ আনন্দ হইয়াছে। ঝুলন উৎসব বেশ আনন্দের সহিত হইতেছে।

গোবর্দ্ধনের মা।

৬ই আগষ্ট, ১৯৫৫

বুনি ও কুসুমের পত্র আসিয়াছে। গত ৩রা সেখানে ঝুলন পূর্ণিমা উৎসব খুব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। অবধূতজীর বিশেষ চেষ্টাতেই এবার ঝুলন উৎসব এত সুন্দর ভাবে হওয়া সম্ভব হইয়াছে। শুনা গিয়াছিল যে বৃন্দাবনে একমাত্র

বৃন্দাবনে ঝুলন উৎসব ও জন্মাষ্টমী।

স্বয়ং ভগবান ব্যতীত অপর কেহ ঝুলনে বসেন না। সেইজন্য আশ্রমে সকলেরই মনে আশঙ্কা ছিল যে এবারে মা কি করেন। কিন্তু অবধূতজী স্বয়ং সমস্ত ব্যবস্থা একেবারে রাজসিক ভাবে করিয়াছিলেন। অবধূতজী একজন ত্যাগী মহাত্মা হইয়াও নানা বিষয়ে তাঁহার অপূর্ব্ব কর্ম্ম-ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার মাতৃভক্তিও অতুলনীয়। তিনি মথুরা হইতে বিশেষ লোকজন আনাইয়া রূপার পাতে মোড়া সিংহাসন অতি সুন্দর করিয়া সাজাইয়া মাকে তাহার উপর বসাইয়াছিলেন। মাকে হলুদ রংয়ের কাপড় পড়াইয়া ফুলের মালা ও ফুলের বাঁশী হাতে দিয়া সাজান হইয়াছিল। মা হাতে গোপালজীর মূর্ত্তি নিয়া বসিয়াছিলেন। ধ্যান, কীর্ত্তন, আরতি ইত্যাদিতে রাত্রি প্রায় দুইটা বাজিয়া যায়।

১৩ই আগষ্ট, ১৯৫৫

সংবাদ পাইলাম গত ১০ই বৃন্দাবনে জন্মাষ্টমী উৎসব বেশ ভাল ভাবে হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যাবেলার সৎসঙ্গ এবং হরিবাবাজীর কীর্ত্তন আমাদের আশ্রমেই হলের মধ্যে হইয়াছিল। মহাপ্রভুর মন্দিরটি খুব সুন্দরমত সাজাইয়াছিল। মায়ের সম্মুখে দোলনার উপরে পাঁচটি গোপাল মূর্ত্তি সাজান হইয়াছিল। প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারীজীকে মা গোপাল পূজা করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি মন্ত্র পড়িয়া কুসুম ব্রহ্মচারীকে দিয়াই পূজা করান। বৈদিক প্রথায় পূজা হয়। পূজা অন্তে প্রভুদত্তজী প্রভৃতি চলিয়া গেলে মার আরতি হয়। সকলের প্রসাদ পাওয়া হইয়া গেলে মা নিজেই ঘরে গিয়া গোপালদের সুন্দর

করিয়া শোয়াইয়া দিলেন এবং গোপালদের বলেন—"অন্যান্য বার-ত আমার কন্যাপীঠের বন্ধুরা এসব করে। এবার আমার বন্ধুদের কাজ আমিই করে দেই। সকলে ভালমত শুয়ে থাক। পড়ে যেও না।"

জন্মাষ্টমীর দিনই দুপুরে মা প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারীজীর সহিত বৃন্দাবন হইতে ২০ মাইল দূরে দাউজীর মন্দিরে যান। পথে ব্রহ্মাণ্ড ঘাট হইয়া আসেন। মার সঙ্গে বাহিরের কেহ কেহ গিয়াছিলেন।

আশ্রমের নূতন গোশালার প্রতিষ্ঠাও ঐ দিন করা হয়। দেরাদুন আশ্রম হইতে কয়েকটি গরু ট্রাকে করিয়া নিয়া আসা হইয়াছে।

২০শে অগাষ্ট, ১৯৫৫

ইতিমধ্যে মা তিন দিনের জন্য গোয়ালিওরের মহারাণীর বিশেষ আগ্রহে কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়া গোয়ালিওর গিয়াছিলেন। মা মোটরেই গিয়াছিলেন। মহারাণী সাহেবা বিশেষ ভক্তিমতি এবং খুবই করিৎকর্ম্মা। মা এবং অন্যান্য সকলের জন্যই খুব ভাল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মার জন্য কয়েকটি তাঁবু লাগান হইয়াছিল—অপর সকলে ছিলেন গেষ্ট হাউসে। মায়ের তাঁবুর সম্মুখে একটি বিরাট বট গাছের নীচে বিশাল সামিয়ানা লাগান হইয়াছিল।

গোয়ালিওরে মা।

গোয়ালিওরের মহারাজা সিন্ধিয়া ভারতের রাজন্যবর্গের মধ্যে অন্যতম। তিনি বর্ত্তমানে মধ্যপ্রদেশের রাজপ্রমুখ (গভর্ণর)। রাজপ্রাসাদের দরবার হল শুনিলাম ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। প্রাসাদের উদ্যানসহ ১৪ মাইলের পরিখা। প্রাসাদের নাম 'জয় ভিলাস্।'

মহারাণী বিজয়ারাজে কৃষ্ণভক্ত। মা যখন মধ্যপ্রদেশে সাগরে গিয়াছিলেন তিনি তখন কলেজে পড়িতেন। ইনি মধ্যে মধ্যে বৃন্দাবনও গিয়াছেন কিন্তু মার সঙ্গে পরিচয় ছিল না বলিয়া আশ্রমে আসেন নাই।

প্রথম দিনই মাকে জন্মাষ্টমীর ঝাঁকি দর্শন করাইতে নিয়া গিয়াছিলেন। সবুজ ঘাসের উপর ফুলের পাপড়ী বিছাইয়া অতি সুন্দর ফুলের আলপনা দিয়াছিল। গাছতলায় শ্রীকৃষ্ণ—সম্মুখে পদ্মের সরোবর, পাহাড়, গাছপালা ইত্যাদি। সকলে দেখিয়া খুবই আনন্দ লাভ করিয়াছে।

পর দিন বিকালে ইমামবাড়া নামে একটি পাব্‌লিক হলে মাকে নিয়া যাওয়া হয়। বিকালের সৎসঙ্গ সেখানেই হয়। মা অনেকক্ষণ নাম করিয়াছিলেন। স্থানীয় সনাতন ধর্ম্ম মন্দিরেও মাকে মহারাণী নিয়া গিয়াছিলেন। তিনিত মার জন্য যেন একেবারে পাগল। ১৮ই দুপুরে মা গোয়ালিওর হইতে রওনা হইয়া আসেন। আশ্রমের সকলকেই মহারাণী বিশেষ আদর যত্ন করিয়াছেন।

বুনি বৃন্দাবন আশ্রমের ঝুলনের দিনের একটি ঘটনার বিষয় লিখিয়াছে। ঝুলনের মধ্যে মা যখন রাত্রে দোলার উপর বসিয়াছেন সেই সময় দিদিমার ঘরে ছাদের নীচে পাখীর বাসা হইতে দুইটি চড়াই পাখী মাটিতে পড়িয়া চিৎকার করিতে থাকে। পরে দেখা গিয়াছিল যে দুইটিই মরিয়া পড়িয়া আছে। মার নির্দ্দেশে তাহাদের দুইটিকেই আশ্রমের বাগানে আম গাছের তলায় মাটির নীচে পুতিয়া দেওয়া হয়। গোয়ালিওর হইতে ফিরিয়া আসিয়া মা ঐ স্থানটি বাঁধাইয়া দিতে বলিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন—"ঝুলন পূর্ণিমার দিন

বেচারারা মারা গেছে—ভাল দিনেইত গিয়েছে।" এইসব শুনিয়া মনে হইল, কে বলিবে পাখীরূপে তাহারা কে ছিল ?

এলাহাবাদ হইতে ৺গোপাল ঠাকুর মহাশয়ের মেয়ে বিশেষ করিয়া মায়ের নিকট চিঠি দিয়াছে প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও পূজার পূর্ব্বে তাহাদের আশ্রমে তিন দিনের জন্য যাইতে। সুতরাং মা হয়ত এলাহাবাদ হইয়া কাশীর দিকেই যাইবেন। কাশী আশ্রমেই ভাগবৎ জয়ন্তী হওয়ার কথা।

৩০শে অগাষ্ট, ১৯৫৫

বুনির চিঠি আসিয়াছে। ব্রহ্মচারী সাধনের ইচ্ছা অনুসারে বাগানের মধ্যে হরিবাবার কুটিয়ায় যাওয়ার পথের পাশে একটি ফুসের কুটিয়া বানান হইতেছে। মা নাকি বলিয়াছেন যে মা যখন আসিবেন ঐ কুটিয়াতেই থাকিবেন এবং মা চলিয়া গেলে সাধন ওখানে থাকিবে। বৃন্দাবন আশ্রমের সুব্যবস্থাও মার কৃপায় জানিলাম আশাতীত ভাবে হইয়া যাইতেছে। সরকারী Agriculture Departmentএর লোকজন আসিয়া বাগান করিতে সাহায্য করিতেছে। পাঞ্জাবের Chief Engineer শ্রীযুক্ত বর্ম্মা সাহেব* নিজে আসিয়া সব দেখিয়া গিয়াছেন। আশ্রমের মধ্যে টিউব-ওয়েল বসান যায় কিনা তিনি তাহার জন্য

* শ্রী পি, এল, বর্ম্মা—ইনি একজন বিশেষ খ্যাতনামা ইঞ্জিনিয়ার। ভারতের অন্যতম আধুনিক সহর চণ্ডীগড় তিনিই বানাইয়াছেন। পরে ইনি Union Public Service Commissionএর Senior member ছিলেন। বিশেষ সৎ ও ধর্ম্মপ্রাণ পুরুষ।

চেষ্টা করিতেছেন। ওদিকে বাগানের জন্য সরকারা নম্বর আনিবার কথাও চলিতেছে।

সংবাদ পাওয়া গেল কাশীতে মাখনের* ছোট বাচ্চাটি মারা গিয়াছে। দিদিমা মার নিকটেই আছেন। তিনি এই সংবাদ শুনিয়া বলিয়াছেন—

মাখনের কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু।

"আমি ভেবেছিলাম প্রার্থনা জানিয়েছে হয়ত ভালই হবে। আমি এসব কানে না শুনলেও পারতাম।" মাও নানা ভাবে নাকি ঐ বাচ্চাটির কথা বলিয়াছেন—"জন্ম পূরণ করতে এসেছিল। ভোগ থাকলে বাঁচে, না হলে মরে যায়। ছেলেটা মার পেটে আসবার পর থেকেই বাবাকে আশ্রমবাসী করেছে। জয়দেব ছিল নাম। এমন যোগাযোগ যে ঠিক এই অল্প সময়টুকুই মামুর (মাখন) কাশীতে না থাকা। বন্ধনের ক্রিয়ায় বাপকে বাঁধতে দেবে না। কাশীধামে গঙ্গাপ্রাপ্তি—পুরুষোত্তম মাস ভালই হল একরকম!"

পূর্ব্বদিন রাত্রেই মা দেখিতেছিলেন যে স্বামী অখণ্ডানন্দজী গাড়ীতে কোথাও যাইতেছিলেন। মা যেন ছুটিয়া গিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। গাড়ীটা উল্টাইয়া গেল। কিন্তু কেহ আঘাত পাইল না। কাহারা যেন বলাবলি করিতেছিল যে স্বামীজীর আঘাত না লাগে সেইজন্যই যেন মা গিয়া সামনে দাঁড়াইয়াছেন। ইতিমধ্যেই মা দেখিলেন মামুর ছোট বাচ্চাটি ও বড় ছেলেটিকে। বড়টি বেশ হাসিতেছে। ছোটটি

---

* শ্রীশ্রীমায়ের একমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযতুনাথ ভট্টাচার্য্য—ডাক নাম মাখন। ইনি পূর্ব্বে অন্যত্র চাকুরী করিতেন। বর্ত্তমানে আশ্রমের সেবার কাজেই নিযুক্ত আছেন।

মার দিকেই যেন আসিতেছে। অর্থাৎ যেন তাহার সময় হইয়া আসিয়াছে।

কুসুম লিখিয়াছে যে মা তাঁহার ছোটবেলার কথাও বলিতেছিলেন। মার বয়স তখন মাত্র ৮।১০ বৎসর। মার মামা বাড়ী হইতে কে যেন মাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছে। মার ছোট ভাইটি (যে মারা গিয়াছে) সে বলিল—"দিদিভাই, আমি মারা গেলে তুমি যেও। এখন যেও না।" শিশু যোগভ্রষ্ট না হইলে কি ভাবে সে বলিতে পারে যে মারা যাইবে? পরে কে যেন মার হাতে আসিয়া একটা জিনিষ দিয়াছিল। মা কিন্তু তাহা দূরে ফেলিয়া দিলেন। ঐটি ভাইয়ের হাতে দিলে হয়ত ভাইটি বাঁচিয়া যাইত। কিন্তু মারত ফেলিয়া দেওয়ারই খেয়াল। অসুখ তাহার বাড়াবাড়ি চলিতেছিল। ঘর হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছে। হঠাৎ মার খেয়াল হইল যদি এখন কথা বলে তবে কেমন হয়? ছেলেটি অমনি বলিয়া উঠিল—"মা, আমাকে ঘরে নিয়া চল না। আমার সঙ্গে শোও।" ইহার পর একটু কিছু খাইলও। মার আবার খেয়াল হইল যে মারা যাইবেই। সত্যই অল্প কিছুক্ষণ পরেই মারা গেল। ইহা সবই যে মার লীলা-খেলার একরূপ!

মার মৃত ভাইর কথা।

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫

বুনির চিঠিতে মার বিস্তারিত সংবাদ পাওয়া গেল। মার আজকাল সময়ের খুবই অভাব। ভোর ৫-১৫ মিনিটে উঠিয়া মুখটা

ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া এক গ্লাস জল খাইয়াই হরিবাবার সৎসঙ্গে চলিয়া যান। ৯টার পর ফিরিয়া আসিয়া দুধ দিয়া রুটি, নুন ছাড়া তরকারী ও দই খান। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়া একটু বিশ্রাম করেন। ঠিক ২-৩০ মিনিটে উঠিয়া একটু জল খাইয়া আবার হরিবাবার আশ্রমে যান। সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটের পর আসেন। সামান্য একটু মুসাম্বির রস খাইয়া সকলের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিয়া মহাপ্রভুর মন্দিরে যাইয়া আবার ৭-৪৫ মিনিটে হরিবাবার আশ্রমে যান। রাত্রি ৯-৩০ মিনিটের পর ফিরিয়া আসেন। পায়ের ব্যথাটা আজকাল অনেক কম। তবু ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া সৎসঙ্গে যান কারণ সেখানে অনেকক্ষণ বসিতে হয়।

আগামী ১০ই মার মৈনপুরী যাওয়ার কথা। সেখান হইতে এটোয়া, কানপুর, এলাহাবাদ হইয়া কাশী যাইবেন।

আমার শরীরের জন্য বৃন্দাবনেও সকলেই চিন্তিত। মা বলিয়াছেন—"দিদিকে লেখ—সুস্থ হয়ে তাড়াতাড়ি উঠলেইত সব কিছু।"

৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫

বৃন্দাবনের পত্রে জানিলাম মার ভাবের একটু পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছে। বিশেষ একটু চুপ-চাপ ভাব। ইতিমধ্যে একদিন সন্ধ্যাবেলা হরিবাবার আশ্রমে যাইবেন বলিয়া নীচে নামিতেছেন। কিন্তু একটু নামিয়াই আর যেন চলিতে পারিতেছেন না। চল-চল ভাব। মা আবার উপরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন। পর দিন সকালে মুখ

ধুইবার সময়ও ঢুলু-ঢুলু ভাব। খাওয়া দাওয়া প্রায় বন্ধই। কথা বলিতে বলিতে চুপ হইয়া যান। মার কথা শুনিয়া বিশেষ চিন্তিত হইলাম।

আশ্রমে শুনিলাম আবার বাসন ইত্যাদি চুরি হইয়া গিয়াছে। রান্না-ঘরের তালা খুলিয়া দেওয়াল টপ্‌কাইয়া চোর জিনিষ-পত্র লইয়া পলাইয়াছে।

বুনি লিখিয়াছে যে গোপালের মাকে লইয়া মা মাঝে মাঝে অনেক লীলা করেন। বেচারা গরীব বিধবা—সংসারে আপন বলিতে কেহই নাই। মা অযাচিত ভাবে কৃপা করিয়া তাহাকে কত মিষ্ট ভাষায় আশ্রমে আসিয়া থাকিতে বলেন। কিন্তু সে কিছুতেই ভয়ে আশ্রমেও আসে না—পাছে তাহাকে কেহ রাখিয়া দেয়। মার জন্য একদিন কোথা হইতে অনেক ফুল লইয়া আসিয়াছে মালা গাঁথিবার জন্য। মা তাহাকে দেখিয়া বলিলেন—"চল্, তুই আমার সঙ্গে। তোকে যে আমার দরকার। তোকে কিছু করতে হবে না। তুই শুধু আমার খাওয়ারটা বানাবি। তোকে কেউ কিছু বলবে না। তোর যে অসুখ করলেও কেউ দেখার নেই। তোর কষ্ট হলে যে আমারও লাগবে। তুই আর কাঁদবি না। তোর ছেলে-মেয়ে দুই-ই আমি। তুই আমার মা। আমার মা কখনও বিড়ালের জন্য কাঁদবে না। কাঁদলে ভগবানের জন্য কাঁদবে।" কি অপরিসীম কৃপা! কিন্তু সকলে তাহা গ্রহণ করিতে পারে কই? মা বার বারই বলেন—"মেয়েটা খুবই ভদ্র—ভাল। একেবারে পবিত্র। এরকমটা পাওয়া যায় না।"

গোপালের মার উপর অহৈতুকী কৃপা।

১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫

কুসুমের পত্র আসিয়াছে মা গত ১০ই মৈনপুরী গিয়া পৌঁছিয়াছেন। বৃন্দাবন হইতে বেলা তিনটার সময় ভার্গবজীর নূতন গাড়ীতে মা, স্বামীজী, অবধূতজী, দিদিমা, বুনি ও ভার্গবজী স্বয়ং রওনা হন। আর সকলে ট্রেণে যায়। মৈনপুরীতে পৌঁছিবার পর মাকে মোটর হইতে নামাইয়া প্রায় তুই ফার্লং পথ একটি সুসজ্জিত গরুর গাড়ীতে করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। অবশ্য গরুর পরিবর্ত্তে স্থানীয় সকল ভদ্রলোকেরা মিলিয়া গাড়ী টানিয়া নিয়া গিয়াছেন। চারদিকে শঙ্খ, ঘণ্টা, বাজনা চলিতেছিল—অনবরত পুষ্পবৃষ্টিও হইতেছিল। মা'র থাকার ব্যবস্থা হইয়াছিল স্থানীয় একটি আশ্রমে। সকলের জন্যও বেশ সুন্দর ব্যবস্থা। ফল, মিষ্টি অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। সেখানে সংস্কৃত বিদ্যালয়, কলেজ ও গোশালা ইত্যাদিও নির্ম্মাণ হইতেছে। আশ্রমের প্রায় ৪০।৪৫ জন ব্রহ্মচারী মিলিয়া সকালে কীর্ত্তন, সূর্য্য নমস্কার এবং পরে হবন ইত্যাদি করিয়া থাকে। আশ্রমের প্রতিটি জিনিষই নাকি বেশ সুন্দর—দেখিবার ও শিখিবার। ছেলেদের নিয়ম প্রণালী প্রায় আমাদের আশ্রমের বিদ্যাপীঠের ন্যায়।

মৈনপুরীতে মায়ের অভ্যর্থনা।

আমার বিষয়ে মা নাকি বলিতেছিলেন—"দিদিকে দেখলাম। এসে সামনে দাঁড়িয়েছে—একেবারে খুব কাছে। স্পর্শটা একেবারে স্পষ্ট। পূর্ব্বে আর কখনও এরূপ জীবন্ত স্পর্শ যেন হয় নি। দেখে মনে হল বড় কষ্ট। এই শরীরের হাতটা নিয়া যেমনটা করা হয় না সমস্ত

আমাকে স্বপ্নে দর্শন।

শরীরে হাতটা ফিরাইয়া দেওয়া হল—আপনা থেকে আপনিই। তারপর আর দিদিকে দেখা গেল না।”

২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫

বুনির পত্রে জানিলাম যে মৈনপুরীতে সকলকে প্রচুর আনন্দ দিয়া মা গত ১২ই এটোয়া গিয়াছিলেন। মৈনপুরী হইতে মা ভার্গবজীর মোটরেই আসিয়াছেন। বাজপেয়ীদের ওখানে মালায় মালায় অতি সুন্দর ভাবে সাজান হইয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা স্বস্তিবাচন করিয়া মাকে আবাহন করেন। বাজপেয়ীজী পূজা ও আরতি করিলেন। মার জন্য বাজপেয়ীজীদের বাড়ীর সম্মুখে নূতন ঘর, বাথরুম, পায়খানা, রান্নাঘর ইত্যাদি সব বানান হইয়াছে। খাট বিছানাপত্র সবই নূতন। এটোয়াবাসী ভক্তদের প্রাণের পরিচয় পাইয়া সকলেই মুগ্ধ।

এটোয়া, কানপুর ও এলাহাবাদ হইয়া কাশীর পথে।

এটোয়াতে তিন দিন থাকিয়া মা গত ১৫ই বিকালে কানপুর গিয়াছেন। স্বরূপ নগরে হরেনবাবুদের নূতন বাড়ীতে মার থাকিবার কথা। সৎসঙ্গের ব্যবস্থা হইয়াছিল স্থানীয় একটি স্কুলে। পর দিন ভোরে মা সিভিল লাইন্সে মানাদের বাসায় যান। সেখানেও মার পূজা আরতি ইত্যাদি হয়। বিকালে মা জুহিতে জিতেনদার বাসায় তাঁহার নাতীটিকে দেখিতে গিয়াছিলেন। বাচ্চাটি কিছুদিন যাবতই ভুগিতেছে।

কানপুরে একজন ভক্তের জিহ্বার উপরে নাকি মা স্বপ্নে নাম

লিখিয়া দিয়াছেন। সে কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া মার কাছে আবার জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিল।

মা গত ১৭ই সকালে কয়েক ঘণ্টার জন্য উনাও গিয়াছিলেন সেখানকার পুরাতন ভক্ত শ্রীদুর্গাদত্ত যোশী মাকে নিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উনাও হইতে ফিরিবার পথে মা জগদীশবাবুর বাড়ী হইয়া আসেন। সেই দিনই সন্ধ্যার গাড়ীতে মা এলাহাবাদ রওনা হইয়া গিয়াছেন।

২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫

কাশী হইতে কুসুম ও বুনির পত্রে জানিলাম যে মা এলাহাবাদে তিন রাত্রি থাকিয়া গত ২০শে সন্ধ্যায় কাশী আশ্রমে গিয়া পৌছিয়াছেন। কাশী আশ্রম ও কন্যাপীঠের বাড়ী নাকি পানু খুব সুন্দরভাবে রং ইত্যাদি সব করাইয়াছে। আগামী ২৪শে হইতে সেখানে মার উপস্থিতিতে ভাগবৎ জয়ন্তী আরম্ভ হইবে। বৃন্দাবন হইতে একজন বড় পণ্ডিত শুকাচার্য্যজী আসিতেছেন।

কাশী আশ্রমে ভাগবত জয়ন্তী

আমার শারীরিক দুর্ব্বলতা এবং বমির ভাব যেন বাড়িয়াই চলিতেছে। উন্নতির কোনও লক্ষণই দেখা যায় না। এদিকে ভাইয়া (শ্রী বি, কে, শাহ) ও অন্যান্য সকলে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু কিছুতেই যেন কিছু হইতেছে না। মা পরমানন্দ স্বামী ও বুনিকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিতেছিলেন। আমার জন্য শুনিলাম সকলেই চিন্তিত। মা কাশীতে পৌছিয়াই আমার নিকট ফোন করাইয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে একটি বিশেষ দুঃসংবাদ আসিয়াছে। বাটুদার* জ্যেষ্ঠ পুত্র শঙ্করকে তাঁহার বাসায় তাঁহারই একটি ছাত্র রাত্রে হত্যা করিয়া পলাইয়াছে। ব্যাপার কিছুই জানা যায় নাই। এই সংবাদে আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। মাও নাকি স্বপ্নে কিছু দেখিয়াছিলেন—একজন নেংটী পড়া, অস্ত্র হাতে। মার দিকেই সে আসিতেছিল। মা-ইত সর্ব্বরূপে। মা-ই কাটিতেছেন আবার মাকেই কাটা হইতেছে।

বাটুদার ছেলের মৃত্যু।

২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫

কাশী হইতে প্রায় রোজই চিঠি আসিতেছে। কোনও ২।১ দিন পর পরই আসে। গতকাল সকালে ভাইয়ার নিকট ফোনে আমার কথা পানু জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। আবার বিকালেও কমলের সহিত বুনির কথা হইয়াছে।

আমার হাতের ব্যথাটা মোটেও কম না হওয়ায় মা আমাকে গোপনে লেখাইলেন যে হাতের মধ্যে যেন লবন বাঁধিয়া রাখি। ইহাতে অনেক উপকার পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য উপসর্গ এখনও কিছুই কমে নাই। কাশী হইতে ভাইয়ার নিকট ফোন আসিয়াছে আমাকে এখান হইতে একতলায় কোনও বাড়ীতে নেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় কিনা। ভাইয়া ও লীলাবেনই সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া আমাকে আজ দুইদিন হয় তাঁহাদের ভিলে পার্লের বাড়ীতে নিয়া আসিয়াছেন।

* পণ্ডিত অগ্নিবত্বা শাস্ত্রী (বাটুদা)—ইনি একজন স্বনামধন্য পণ্ডিত। অল্প বয়সে জাতিস্মর ছিলেন।

বাড়ীটি খুবই সুন্দর—জুহু Flying Club এর একেবারে সম্মুখে। সমুদ্রও বেশী দূরে না।

কুসুমের পত্রে সংবাদ পাইলাম যে সাধন বৃন্দাবন হইতে আসিয়া মাকে বলিয়াছে যে হরিবাবাজীর কাছে কিছুদিন ধরিয়া যে একটি প্রেতাত্মা আসিয়া উৎপাত করিত সে নাকি উড়িয়াবাবার হত্যাকারী ঠাকুরদাসেরই প্রেতাত্মা। কোনও গণৎকার নাকি তাহাই বলিয়াছে। একদিন নাকি হরিবাবাকে শয্যা হইতে ফেলিয়াও দিয়াছিল। তাহাতে হরিবাবার পায়ে কিছুটা আঘাতও লাগিয়াছে। মা বৃন্দাবনে থাকাকালীনই এইসব ঘটনা আরম্ভ হয়। মা ইহা শুনিয়া হরিবাবার সঙ্গীয় ব্রহ্মচারীদের মধ্যে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বসিয়া জপ করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু সামান্য কয়েকদিন করিয়া আর তাহা রক্ষা করা হয় না। উড়িয়াবাবার সেই প্রেতাত্মা নাকি আসিয়া ভয় দেখাইয়া গিয়াছে যে হরিবাবার আশ্রমকে শ্মশান ভূমিতে পরিণত করিয়া দিবে। বৃন্দাবনে লোক মুখে এইসব কথাই এখন নানা ভাবে আলোচনা হইতেছে। অবধূতজী মার সঙ্গেই কাশীতে গিয়াছেন। তিনি নাকি মাকে বিশেষ ভাবে প্রার্থনা জানাইয়াছেন যে এই সব উৎপাতের যাহাতে শীঘ্র অবসান ঘটে।

হরিবাবার আশ্রমে প্রেতাত্মার উৎপাত

বাটুদাও আশ্রমে গিয়া মার নিকট পুত্রের হত্যাকাণ্ডের বিষয় বিস্তারিত সব বলিয়াছেন। যে অস্ত্র দিয়া তাঁহারই ছাত্র বলরাম শঙ্করকে হত্যা করে সেই অস্ত্রটি বাটুদা নিজেই ধার দিয়া রাখিয়াছিলেন কুমড়া কিংবা নাড়িকেল বলি দিবার জন্য। শঙ্কর নাকি তাহা রাত্রে নিজের বালিশের তলায় রাখিয়া শুইত। কিন্তু ইদানিং গরমের সময়

ছাদে বা অন্যত্র শুইবার সময় সেই অস্ত্রটি বইর পিছনে রাখিয়া দিত। বলরাম তাহা জানিত। অনেকে বলে যে মাত্র ১৪৫৲ টাকার জন্য বলরাম শঙ্করকে খুন করিয়াছিল। কিন্তু বাটুদা আরো কিছু সন্দেহ করেন। মা শোকার্ত্ত বাটুদাকে বিশেষ ভাবে সান্ত্বনা দিয়াছেন।

২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫

আজ দুপুরে পরমানন্দ স্বামীজী হঠাৎ কাশী হইতে আসিয়া উপস্থিত। মা তাঁহাকে আমাকে দেখিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। শুনিলাম ইতিমধ্যে মারও এখানে আসিবার কথা হইয়াছিল। আমার শরীরটা বেশী খারাপ হওয়ায় জিতেনদা নাকি খুবই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনিই মাকে বম্বে যাইবার জন্য বিশেষ করিয়া বলেন। কিন্তু আশ্রমে পর দিন সকাল হইতেই সপ্তাহ আরম্ভ হইবে—বাহির হইতে পণ্ডিত আসিয়াছেন—এই অবস্থায় মার হঠাৎ চলিয়া আসা সকলেরই কেমন মনে হইতেছিল। দেরাদুন হইতে মিংসেস্ তন্‌খা সপরিবারে কাশীতে গিয়াছেন। তিনিই সপ্তাহ করাইতে-ছেন। অবধূতজীও মার সঙ্গে আছেন। তবু জিতেনদার আগ্রহে মার বম্বে রওনা হওয়া স্থির হয়। মার অবশ্য নিজের কোন খেয়ালই ছিল না আসিবার জন্য। মা একবার জিতেনদাকে বলিয়াছিলেন— "সাত দিন পরে গেলে হয় না?" কিন্তু দেরী করা জিতেনদার ভাল মনে হয় নাই।

২৪শে ভোরে বম্বে মেইলে মার রওনা হইবার কথা হইয়াছিল। গাড়ী রিজার্ভেশনও হইয়া গিয়াছিল। মার খেয়ালে রওনা হইবার

একটু পূর্ব্বে ভাইয়ার নিকট মা পান্নুকে দিয়া ফোন করান আমার শরীরের অবস্থা তেমন কিছু খারাপ নয় শুনিয়া মা তৎক্ষণাৎ যাওয়া বন্ধ করিলেন। জিতেনদা পূর্ব্বেই কানপুর চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাকেও সংবাদ দিয়া দেওয়া হয় যে মার যাওয়া হইল না। আজ এইসব সংবাদ স্বামীজীর মুখে শুনিয়াত আমি বিশেষ আশ্চর্য্য হইলাম।

২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫

গতকাল রাত্রেই বুনি আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলিয়াছে। আমার শরীরের কথা মা বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। বুনি বলিয়াছে যে ফোন করার সময় মাও সম্মুখেই দাঁড়াইয়াছিলেন। মা বার বার আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিতেছেন যে মার এখানে আসিবার প্রয়োজন আছে কিনা। এখন ওখানে সপ্তাহ চলিতেছে। তাহার পর ২।৪ দিন বিন্ধ্যাচলে বিশ্রাম করিয়া আগামী ৭ই কাশীতে স্বামী অখণ্ডানন্দজীর ভাণ্ডারাতে উপস্থিত থাকিয়া পরে মার প্রোগ্রাম যাহা হইয়া যায়।

শুনিলাম কন্যাপীঠের মেয়েরা সকলে পুরী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। গঙ্গাদিও অসুস্থা হইয়া আসিয়াছেন। পুরীতে সমুদ্রে স্নান করিতে গিয়া তাঁহার পায়ে খুব চোট লাগিয়াছে। হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ডাক্তার ভার্গব নাকি বলিয়াছেন যে শীঘ্র অপারেশন করিয়া হাড় ঠিক করা দরকার। তাই পানুকে দিয়া মা গঙ্গাদিকে কলিকাতা পাঠাইয়া দিয়াছেন।

৪ঠা অক্টোবর, ১৯৫৫

এই কয়দিন কাশী হইতে আর কোনও সংবাদ আসে নাই। আজ কুসুমের পত্রে জানিলাম ভাইয়া ইতিমধ্যে মার কাছে এক রাত্রির জন্য গিয়াছিলেন। পানু কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। আজ সকালে আমার বিষয়ে স্বামীজীর সহিত ফোনে বিস্তারিত কথা বলিয়াছে। শুনিলাম মা গতকাল বিকালে বিন্ধ্যাচল চলিয়া গিয়াছেন। সেখানে কয়েকটি দিন বিশ্রাম করার কথা।

আমার শারীরিক অবস্থা পূর্ব্ব হইতে অনেকটা ভাল। জর ইত্যাদি কম হইয়াছে। রোজ Glucose injection চলিতেছে। দুর্ব্বলতা এবং বমির ভাবও কম। ভাইয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে আমি শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠি। নানা রকম পরীক্ষাও চলিতেছে।

৫ই অক্টোবর, ১৯৫৫

ভাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার মুখে শুনিলাম যে তিনি মার নিকট প্রার্থনা জানাইয়া আসিয়াছেন যে মা যাহাতে ৭ তারিখের পর বম্বেতে আসেন। মা অবশ্য কিছু বলেন নাই। এদিকে শুনিলাম পরমানন্দ স্বামীজীও চিঠি দিয়াছেন যে মা যদি ৭ইর পর বম্বে চলিয়া আসেন তবে এখানে কয়েকদিন থাকিয়া আমাকে লইয়া মা ১৭ই কলিকাতা রওনা হইতে পারেন। কলিকাতা বহু দূরের পথ। এতটা দূর আমাকে একলা নেওয়া স্বামীজী ভাল মনে করেন

না। অবশ্য মার যে কি খেয়াল হইবে তাহা কেহই বলিতে পারে না।

৬ই অক্টোবর, ১৯৫৫

বুনির চিঠি আসিয়াছে। মার শরীর বিন্ধ্যাচল গিয়া ভালই আছে। সেখানে অবধূতজী, স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী, কবিরাজ মহাশয় প্রভৃতিও আছেন। তাই সৎসঙ্গ সেখানে ভালই হইতেছে। আগামী কাল বিকালে মার কাশী ফিরিবার কথা। পরশুদিন কাশী আশ্রমে স্বামী অখণ্ডানন্দজীর স্মৃতি উৎসব এবং ভাণ্ডারা।

মায়ের নিকট হইতে স্বপ্নে মন্ত্র লাভ ও দশভূজা রূপ দর্শন।

কুসুম তাহার পত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিষয় আমাকে জানাইয়াছে। একজন বাঙ্গালী ভদ্রমহিলা ইতিমধ্যে মার সঙ্গে প্রাইভেট কথা বলিতে আসিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বেও মার নিকট আসিয়াছেন সত্য, তবে বিশেষ কোনও আকর্ষণ ছিল না। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি গয়াতে গিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানে গিয়াও ভিতরের কোনও বস্তু পাইলেন না বলিয়া মনটা একটু খারাপ ছিল। রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন যে মা একটি বড় জায়গায় তাঁহাকে ডাকিয়া একটি মন্ত্র জপ করিতে বলিলেন। তিনি মার নিকট এইসব কথা বলিতে বলিতে কাঁদিয়া আকুল। আবার অল্প কয়েকদিন হয় স্বপ্নে দেখিয়াছেন যে মা যেন বলিতেছেন—"আমার রূপ দেখবি ?" এই বলিয়া মা তাঁহাকে দশভূজার রূপ দেখাইলেন।

আর একজন ভদ্রমহিলা অনেকদিন যাবতই মার নিকট আসা যাওয়া করেন। কিন্তু মার সহিত কথা বলিতে আর সাহস হয় না। এতদিন পর আসিয়া মার সঙ্গে কথা বলিয়াছেন। তিনি একদিন পূজায় বসিয়া মার দর্শন পাইয়াছেন—অতি সুন্দর মূর্ত্তি, শিউলী ফুলের মালা গলায়, রূপার বাঁশী হাতে, মাথায় চূড়া বাঁধা। ইতিমধ্যে মাকে আসিয়া নিজে পূজা করিয়া ভোগ দিয়াছেন।

৭ই অক্টোবর, ১৯৫৫

কাশী হইতে মার সম্বন্ধে আর কোনও সংবাদ আসে নাই। তবে অনেকেই অনুমান করিতেছেন যে মা হয়ত আগামী কাল বম্বে রওনা হইতে পারেন। ভাইয়াও মার নিকট পূর্ব্বেই প্রার্থনা জানাইয়া আসিয়াছেন এবং কলিকাতা যাওয়ার পূর্ব্বে লীলাবেনকে বলিয়া গিয়াছিলেন মার থাকিবার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া রাখার জন্য।

ভাইয়ার স্ত্রী লীলাবেন সত্যই অদ্ভুত নিপুণ ও যোগ্য মহিলা। সমস্ত প্রকার কাজ এরূপ সুন্দর ও সুচারুভাবে করিতে পারেন যে তাহাতে আশ্চর্য্য হইতে হয়। স্বভাবটিও অতি মধুর। সামাজিক নানা ব্যাপারের সহিত তিনি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। সত্যই এরূপ একটি পরিবার খুবই দুর্লভ। ছেলে-মেয়েও প্রত্যেকেই যেন পিতা-মাতার আদর্শে গঠিত। মার সহিত খুব বেশী দিনের পরিচয় না। তবু এই পরিবারটির মার উপর ভক্তিশ্রদ্ধার তুলনা হয় না। আমার সহিত কোনও জাগতিক সম্পর্ক নাই। কিন্তু তাঁহারা এতটা করিতেছেন যে নিজের ভাই-বোনও বোধ হয় এরূপ করে না।

কত জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধ যেন বাঁধা আছে। মার অসীম কৃপাতেই এইরূপ ভাই-বোন পাইয়াছি। আজ যে আমার জন্য রাজোচিত চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা হইতেছে ইহা সবই ভাইয়ার নিমিত্ত। ইহারা যাহা করিতেছে তাহা কোনও দিন লিখিয়া বা বলিয়া প্রকাশ করা সম্ভব না। তাহা আমরা একমাত্র মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারি।

৯ই অক্টোবর, ১৯৫৫

বম্বেতে মা

মার যদিও আসিবার কোনও সংবাদ নাই তবু সকাল হইতেই সকলে মার আগমন প্রতীক্ষায়। মার থাকিবার সব ব্যবস্থা পাকা করিয়া স্বামীজীকে লইয়া লীলাবেন ষ্টেশনে চলিয়া গেলেন।

মা সত্য সত্যই বেলা ১টা নাগাদ বুনিকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া পৌছিলেন। ভাইয়াও ঐ গাড়ীতেই কলিকাতা হইতে আসিয়া মার সঙ্গে মোগলসরাইতে মিলিত হইয়াছিলেন।

মার জন্য ভাইয়ার বাড়ীর পিছনের বাগানের মধ্যে asbestos দিয়া অতি সুন্দর একটি ঘর বানান হইয়াছে—সঙ্গে বাথরুম পায়খানা ইত্যাদি। মার ঘরের সম্মুখে একটি সজ্জিত প্যাণ্ডাল ও বাগান হইয়াছে। সমস্ত ব্যবস্থাই একেবারে নিখুঁত। তাঁহাদের বাড়ীতে মার এই প্রথম অবস্থান। ভাইয়া ও লীলাবেনের আনন্দের সীমা নাই।

১৩ই অক্টোবর, ১৯৫৫

মা বম্বেতে ভাইয়ার বাসাতেই আছেন। বিশ্রাম বেশ হইতেছে। মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমার নিকট বসেন এবং আমার খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা বলিয়া দেন। কিভাবে আমার দুর্ব্বলতা, বমির ভাব এবং অরুচি দূর হইবে সেই জন্য মার বিশেষ খেয়াল আছে। আমাকে মা একটু একটু করিয়া খাইতে বলেন—জোর করিয়াও।

বর্ত্তমানে ডাক্তাররা আমাকে বেল্ট পরিয়া বসাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। দিল্লীতে ডাঃ সন্তোষ সেন আমার জন্য একটি বেল্ট বানাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা তখন ব্যবহার করা হয় নাই। এখন স্থানীয় ডাক্তাররা মিলিয়া নূতন ধরণের একটি বেল্ট বানাইয়াছেন। সেই বেল্ট পড়িয়া বিছানার উপর বসা এবং ধীরে হাঁটা অভ্যাস করানই এখন ডাক্তার ও সার্জনের মত। প্রতিপদের দিন প্রথম আমাকে বিছানা হইতে উঠাইয়া ২।৪ পা ধরিয়া ধরিয়া হাঁটান হইল। প্রায় এগার মাস শুইয়া থাকিয়া সমস্ত শরীর যেন ভারী হইয়া গিয়াছে।

লীলাবেনের ভাই ডাঃ সুরেশচন্দ্র শেঠ বম্বের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক। ডাঃ এরুসকর ও ডাঃ বালিগা প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিয়া তিনিই আমার চিকিৎসা করিতেছেন। ডাক্তার বলরামকেও ভাইয়া দিল্লী হইতে আনাইয়াছেন। আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পরীক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। ভাইয়ার একান্ত ইচ্ছা যে আমি এখান হইতে কলিকাতা যাওয়ার পূর্ব্বে কোনও দিক দিয়া যেন পরীক্ষার কোনও ত্রুটী না থাকিয়া যায়।

ডাক্তার কৃষ্ণমূর্ত্তি একজন প্রসিদ্ধ কবিরাজ। ভাইয়ার সঙ্গে বিশেষ

পরিচিত। তিনিও প্রায় সদা সর্ব্বদাই আসিয়া নিজ জনের ন্যায় আমার দেখাশুনা করিয়াছেন।

ইতিমধ্যে একদিন ডাঃ শেঠের পরিবারের সকলে আসিয়া মার দর্শন করিয়া যান। লীলাবেনের পিতা শ্রীযুক্ত নানাবতী বম্বের একজন বিশেষ খ্যাতনামা পুরুষ। তাঁহার আগ্রহে মাকে একদিন তাঁহাদের জুহুর বাসায় লইয়া যাওয়া হয়। সন্ন্যাস আশ্রমেও মা একদিন গিয়াছিলেন। গতবার সংযম সপ্তাহের সময় যখন আমরা এখানে ছিলাম তখন মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী মহেশ্বরানন্দজী এখানে ছিলেন না। এবার তাঁহার সঙ্গে মার দেখা হইল। তিনি মাকে বিশেষ শ্রদ্ধার ভাবে গ্রহণ করিলেন। ডাঃ শেঠের অনুরোধে মাকে একদিন স্থানীয় নানাবতী হাসপাতালেও লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। ডাঃ শেঠ এই হাসপাতালে Medical Superintendent—তিনি সব নিজে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাকে দেখাইলেন। হাসপাতালটি বেশ সুন্দর—খুব ভাল ব্যবস্থা। বম্বের প্রসিদ্ধ হাসপাতালগুলির মধ্যে একটি।

আজ সন্ধ্যায় কয়েকটি মেয়েকে লইয়া স্বামীজী কলিকাতা রওনা হইয়া গেলেন। আগামী কাল মার সঙ্গে আমারও এখান হইতে কলিকাতার দিকে রওনা হওয়ার কথা। ভাইয়া, লীলাবেন এবং ছোট ছেলে সঞ্জয়ও আমাদের সঙ্গেই যাইতেছে। তাহারা বাংলা দেশের ৺দুর্গা পূজায় কখনও থাকে নাই। এবার মার সঙ্গে গিয়া তাই পূজার সময় উপস্থিত থাকার ইচ্ছা।

১৯শে অক্টোবর, ১৯৫৫

সকাল দশটার সময় মার সঙ্গে আমরা হাওড়া ষ্টেশনে পৌছিলাম।

গাড়ী প্রায় তিন ঘণ্টার উপর লেট ছিল। আমাদের সকলে মিলিয়া লেক রোডে পূজার স্থানে নিয়া গেল। আমার পিশতুত ভাই আশুর বাড়ী লেক রোডের উপরেই। তাহার বাড়ীর সম্মুখস্থ খালি জমির উপরে বিশাল প্যাণ্ডেল নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। নিকটেই একটি শিশুদের স্কুলবাড়ী। সেইখানে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হইয়াছে। মার বিশ্রামের জন্যও একটি ঘর সেখানে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। শুনিলাম মা রাত্রে থাকিবেন নির্ম্মল চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে। নির্ম্মল নূতন বাড়ী বানাইয়াছে। গৃহপ্রবেশের সময় হইতেই মার নিকট বিশেষ প্রার্থনা জানাইতেছিল। কিন্তু এতদিন আর সুযোগ হয় নাই। এই বাড়ীতেই ভাইয়া, লীলাবেন, যোগীভাই প্রভৃতির থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। অন্যান্য সকলের জন্য সাউথ সুবার্ব্বন স্কুল এবং অন্য একটি বাড়ী ভাড়া লওয়া হইয়াছে। স্থানের কোনও অসুবিধা নাই।

কলিকাতায় আগমন
—দুর্গা পূজা।

২৬শে অক্টোবর, ১৯৫৫

মার উপস্থিতিতে ৺শারদীয়া দুর্গা পূজা বেশ মঙ্গল মত সম্পন্ন হইল। পূজার প্রথমে প্রচণ্ড বর্ষার জন্য কিছুটা বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হইয়াছিল। উপযুক্ত কর্ম্মীরও কিছু অভাব ছিল। শেষ পর্য্যন্ত মাই নিজে সব সামলাইয়া নিয়াছেন।

মা সারাদিন প্রায় এদিকেই থাকেন। রাত্রে বিশ্রামের জন্য নির্ম্মলের বাড়ীতে চলিয়া যান। সময় একেবারেই নাই। প্রায়ই বাহিরেও যাইতে হইতেছে। গঙ্গাদি পি, জি, হাসপাতালে, কন্যাপীঠের

মেয়ে গঙ্গা যাদবপুর হাসপাতালে, দিল্লীর ৺মনোজ দাদার ছেলে গোপালু মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে আছে। তাহাদের প্রত্যেককেই মা একবার করিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন। যাদবপুরে কিরণদাদা অসুস্থ —তাঁহার বাসাতেও মা দুইবার গিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন। নবমীর দিন বিকালে ভাইয়া মাকে স্থানীয় নিউ ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্সের অফিসে লইয়া গিয়াছিলেন। সেখানে মার অভ্যর্থনার ব্যবস্থা শুনিলাম খুবই সুন্দর হইয়াছিল। ইতিমধ্যে দুই দিন বিনয় দাদার বাড়ী এবং ভবানীদের বাড়ীতে মার ভোগের ব্যবস্থা হইয়াছিল। একদিন হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মুখার্জ্জীর বাড়ীতেও মাকে কিছু সময়ের জন্য নিয়া গিয়াছিলেন।

আলমোড়া হইতে বিদ্যাপীঠের ছাত্র-শিক্ষকেরা সকলে পূজা উপলক্ষে আসিয়াছিল। তাহারা দশমীর দিনই পুরী রওনা হইয়া গেল। শীতকালটা তাহাদের পুরীতেই থাকার কথা। লীলাবেনও তাহার ছেলেকে লইয়া নবমীর দিন রাত্রে ফিরিয়া গিয়াছে। নানা স্থান হইতে বহু ভক্ত পূজা উপলক্ষে আসিয়াছিল। তাহারাও এক এক করিয়া সকলে রওনা হইয়া যাইতেছে।

২৭শে অক্টোবর, ১৯৫৫

আজ আমরা মার সঙ্গে দমদম চলিয়া আসিয়াছি। এখানে আপতাপ দাদার বাসায় সকলের থাকার ব্যবস্থা হইয়াছে।

দমদমে তিন দিন।

তিনি মাকে এখানে কয়েকটি দিনের জন্য আসিতে বিশেষ অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। মা কলিকাতা হইতে সকাল বেলাই বাহির

হইয়া উত্তরপাড়া চলিয়া গেলেন। সেখানে এক বাসায় মার আজ ভোগের ব্যবস্থা ছিল। সেখান হইতে মা দমদম চলিয়া আসিলেন। আমাকে বিকাল বেলা কলিকাতা হইতে সোজা অ্যাম্বুলেন্সে করিয়া দমদম লইয়া আসা হইল। কলিকাতার পাট আজ ভাঙ্গিয়া গেল। কন্যাপীঠের মেয়েদের মধ্যে অধিকাংশই আজ কাশী রওনা হইয়া গেল। স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজীকে লইয়া কুসুম ব্রহ্মচারী রাজগীর চলিয়া গেল।

২৮শে অক্টোবর, ১৯৫৫

মা এখানে বেশ একান্তেই আছেন। কলিকাতার চূড়ান্ত হৈ-চৈর পর এখানে কিছুটা বিশ্রাম হইতেছে।

আজ বিকালে মা একবার কলিকাতা গেলেন। রাত্রে মৌনের পর ফিরিয়া আসিলেন। কোহিনূরদার বাসায় মার ভোগের ব্যবস্থা ছিল।

২৯শে অক্টোবর, ১৯৫৫

আজ সকালের প্লেনে ভাইয়া বম্বে রওনা হইয়া গেলেন। সন্ধ্যা-বেলা মার নির্দ্দেশে আমিও বিন্ধ্যাচল রওনা হইলাম। আমার সঙ্গে বেলু, জ্যোতি, পারুল, ঠাকুরমা, কমল ও পানু। স্টেশনে আসিয়া একটু বিভ্রাটের সৃষ্টি হইল। ঠাকুরমা ভীরের মধ্যে প্ল্যাটফর্ম্মে যে কোথায় হারাইয়া গেলেন তাঁহাকে আর কোনও ভাবেই খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ঠাকুরমার জন্য মনটা বিশেষ খারাপ হইয়া গেল। বৃদ্ধা কোথায় গেলেন কে জানে?

মা দমদমেই রহিয়া গেলেন। ২।৩ দিনের মধ্যেই অন্যত্র যাওয়ার কথা।

৩০শে অক্টোবর, ১৯৫৫

আজ সকালে মোগলসরাইতে মামু ও সরোজ আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল। কলিকাতায় স্বামীজীর নামে টেলিগ্রাম করাইয়া দিলাম ঠাকুরমার বিষয়ে।

মির্জাপুর স্টেশনে প্রায় ১০টার পর আসিয়া পৌঁছিলাম। পটল কাশী হইতে অ্যাম্বুলেন্স লইয়া স্টেশনে উপস্থিত ছিল। আমাকে সোজা বিন্ধ্যাচল আশ্রমে লইয়া গেল। উপস্থিত এখানে আমার কয়েকদিন থাকার কথা। পরে সংযম সপ্তাহ উপলক্ষে দিল্লী যাওয়ার কথা আছে।

১লা নভেম্বর, ১৯৫৫

আমি বিন্ধ্যাচলেই আছি। বিন্ধ্যাচলের একটি পুরাতন ঘটনার কথা মনে পড়িয়া গেল। সম্ভবত ১৯৪৭।৪৮ সনের কথা। মা বিন্ধ্যাচলে আসিয়াছেন। দিল্লী হইতে ডাঃ ব্যাস কিছু আম মার জন্য পাঠাইয়াছিল। দুইটি আম মার জন্য পৃথক করিয়া রাখিয়া কাটিয়া দিয়াছি। এমন সময়ে মা দুইটি আস্ত আম লইয়া একটি

বিন্ধ্যাচলের পুরাতন ঘটনা।

কমলাকান্তকে ও একটি বেলুকে* দিলেন তখনই খাইয়া দেখিবার জন্য। বেলু একটু খাইতেই মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন আম?" আমটা বোধ হয় একটু টকই ছিল। কিন্তু মা নিজের হাতে দিয়াছেন তাই বেলু একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল। পরে বলিল—"মন্দ না।" মা বলিলেন—"টক বুঝি? দেত তোর আম হতে এক টুকরা।" এই বলিয়া মা মুখ হাঁ করিলেন। বেলু অতি সঙ্কোচে মার মুখে নিজের সেই আম হইতে এক টুকরা দিতে বাধ্য হইল। কিন্তু নিজে প্রথম খাইয়া সেই আম হইতেই একটু মাকে খাওয়ান হইয়াছে বলিয়া বেলুর মনে বড়ই দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। বেলু আস্তে আস্তে মাকে বলিল—"তোমার এতটা স্বাভাবিক ভাবের লীলাতেই আমরা ভুলে যাই যে তুমি কে? তোমাকে চিনতে পারি না।" মাও আপন ভাবে বলিয়া উঠিলেন—"এর মধ্যেই চিনে নিতে হয়।" মা এত আস্তে আস্তে বলিয়াছিলেন যে বেলু ছাড়া আর আমরা কেহই শুনিতে পাই নাই। বেলু আমাকে মার কথাটা বলা মাত্র আমি আনন্দের সহিত মাকে বলিলাম—"আমি এই কথা কিন্তু সকলকে বলিতেছি।" মা একটু হাসিয়া এই প্রসঙ্গ বন্ধ করার ভাবেই যেন বলিলেন—"বেশত। বল্ গিয়া। আম চিনে নেবার কথাওত হতে পারে। কিসের জন্য কি কথা হয়েছে কে জানে?"

---

*শ্রীযুক্তা গুরুপ্রিয়া দেবীর কনিষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী শান্তি দেবী। ইনি বহু বৎসর যাবৎ বিন্ধ্যাচল আশ্রমে একান্তে থাকিয়া সাধন-ভজন করিতেছেন।

৫ই নভেম্বর, ১৯৫৫

আজ সকালে কাশী হইতে মনাদা, তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা আগমনীকে লইয়া আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। তিনি অসুস্থ শরীর লইয়াও আসিয়াছেন তাহাতে খুবই আনন্দ হইল। আমাকে তিনি বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখেন। বিকালেই আবার মোটরে চলিয়া গেলেন।

৭ই নভেম্বর, ১৯৫৫

এখানে আসিবার পর আজ বুনি ও স্বামীজীর পত্রে মার বিস্তারিত সংবাদ পাওয়া গেল। মা ৩০শে সকালে দমদম হইতে

দেওঘর ও রাজগীর হইয়া রাঁচি গমন।

কলিকাতায় চলিয়া আসেন। সেই দিন দুপুরে কনকদাদার* বাসায় ভোগের ব্যবস্থা ছিল। সেই দিনই আবার ৺লক্ষ্মীপূজা। তাই মা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমাদের বালীগঞ্জ আশ্রমে চলিয়া যান এবং রাত্রিটা সেখানেই থাকেন। ৩১শে সকালে তুফান এক্সপ্রেসে মা দেওঘর রওনা হইয়া যান। সেখানে বমপাস্ টাউনে শ্রীনরেন ব্রহ্মচারীজী তাঁহার আশ্রমে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মাকে বহু পূর্ব্ব হইতেই নিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। মা এবং সঙ্গীয় সকলেরই নাকি সেখানে বিশেষ ভাবে আদর যত্ন হইয়াছে। মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সেখানে বিরাট উৎসব চলিতেছে।

---

* শ্রীকনকেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, Asstt Commissioner of Income Tax (Retd)—ইনি শ্রীশ্রীমায়ের একজন পুরাতন ভক্ত।

দেওঘরে প্রায় ২৪ ঘণ্টা মাত্র থাকিয়া মা ১লা বিকালেই রাজগীর রওনা হইয়া যান। দিনাজপুরের মহারাজা* মাকে নিজের গাড়ীতে জশিদি পৌঁছাইয়া দিয়া যান। এবার কলিকাতাতেই ৺পূজার সময় তিনি মার প্রথম দর্শনলাভ করেন এবং একান্তে সাধন ভজন সম্বন্ধে কথাও বলেন। মহারাজা খুবই ধার্ম্মিক এবং সৎস্বভাবের। পাকিস্তান যাওয়ার পর তিনি অধিকাংশ সময় কলিকাতায় ও দেওঘরের বাড়ীতেই থাকেন।

রাজগীরে শুনিলাম স্থানীয় ভক্তবৃন্দ মার অভ্যর্থনার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আশ্রমের বাগান নাকি খুবই সুন্দর হইয়াছে। মা সেখানে বিশ্রামেই আছেন। প্রায় প্রত্যহই নাকি আশ্রমে মার বিশেষ ভোগের ব্যবস্থা হইতেছে। রাজগীরে এখন বেশ ঠাণ্ডা তাই মা এখন পর্য্যন্ত কুণ্ডে স্নান করিতে যান নাই।

শুনিলাম আগমী কাল মার মোটরে রাঁচি যাওয়ার কথা। এখানে বোধ হয় ১৫ই নাগাদ আসিয়া পৌঁছিবেন। দিদিমা ও স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী কাশী ফিরিয়া আসিয়াছেন।

আজ ২।৩ দিন যাবৎ আমার শরীরটা ভাল যাইতেছে না। জর প্রত্যহই সন্ধ্যার দিকে হইতেছে। সেই সঙ্গে অম্বল, অরুচি এবং

---

* ৺মহারাজা জগদীশ নাথ রায়, এফ্, আর, এস, এ—ইনি বহু বৎসর ভারতীয় কাউন্সিল্ অব ষ্টেট্সের মেম্বার ছিলেন। বাংলা দেশের প্রাচীন জমিদারদের মধ্যে ইনি একজন অন্যতম ছিলেন।

বমির ভাবও আছে। সমস্ত শরীরে একটা বিশেষ অস্থিরতা ও গ্লানির ভাব।

১১ই নভেম্বর, ১৯৫৫

আজ খুব ভোরে কাশী হইতে হঠাৎ কমল আসিয়া হাজির। বলিল মা নাকি রাঁচি পৌছিয়া ফোন করাইয়াছেন যে আমি যেন আগামী কালের মধ্যেই দিল্লী রওনা হইয়া যাই এবং সেখানে গিয়া ডাঃ বলরামের চিকিৎসা করি। হঠাৎ এই সংবাদ পাইয়াত আমি অবাক হইলাম। সম্ভবত আমার শরীর খারাপের সংবাদ পাইয়াই মা এইরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

একটু পরে স্বামীজীর টেলিগ্রামও আসিল যে মা আমাকে রবিবার দিন দিল্লী পৌছিয়া ডাঃ সেনের বাড়ীতে উঠিতে বলিয়াছেন।

বুনির চিঠিও আসিয়াছে। মা ৮ই বিকালে রাজগীর হইতে পাটনা আসিয়া নগেনদাদার* বাড়ীতে কিছু সময় থাকিয়া রাত্রির গাড়ীতে রাঁচি রওনা হইয়া গিয়াছেন। মার শরীরটা ভাল যাইতেছে না।

কলিকাতার পুরাতন ভক্ত উপেনবাবু সস্ত্রীক এখানে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। কিছু দিন ধরিয়াই অসুস্থ ছিলেন। আজ দুপুরে হঠাৎ মারা গিয়াছেন। এখানে তাঁহাদের পরিচিত কেহই বিশেষ নাই।

---

* শ্রীনগেন্দ্রনাথ বকসী, I. C. S.—ইনি বিহারে একজন উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। বর্ত্তমানে পাটনাতে ব্যারিষ্টার।

সেই জন্য আশ্রম হইতে কমলাকান্ত ও পানুকে সৎকারের ব্যবস্থার জন্য পাঠাইয়া দিলাম। দাহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া তাহারা রাত্রি প্রায় দেড়টার পর ফিরিয়া আসিল।

১২ই নভেম্বর, ১৯৫৫

মার নির্দ্দেশ মত আমি বেলা ১টার সময় মির্জাপুর আসিয়া দিল্লী এক্সপ্রেসে রওনা হইলাম। পানুই সব ব্যবস্থা করিয়া আমাকে লইয়া চলিল। মার খেয়ালে সব ব্যবস্থাই সুন্দর মত হইয়া গেল। এলাহাবাদ হইতে রেণুও আমার সঙ্গে চলিল। তাহাকে বিন্ধ্যাচল হইতেই ফোন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

১৩ই নভেম্বর, ১৯৫৫

ভোরবেলা দিল্লী আসিয়া পৌঁছিলাম। ষ্টেশনে পঙ্কজদা, ডাঃ বলরাম এবং আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। আমাকে অ্যাম্বুলেন্সে করিয়া সোজা ডাঃ সেনের বাড়ীতে লইয়া আসিল।

১৬ই নভেম্বর, ১৯৫৫

আজ দুপুরে পরমানন্দ স্বামীজী কাশী হইতে আসিয়া পৌঁছিলেন। সঙ্গে মা পুষ্পকেও পাঠাইয়া দিয়াছেন। শুনিলাম মা গত কালই কাশী আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। গতকাল অন্নকূট ছিল।

স্বামীজীর নিকট হইতে মার সংবাদ বিস্তারিত জানিতে পারিলাম। ৺কালী পূজার দিন রাঁচি আশ্রমে এবার অষ্টধাতুর নূতন কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। মূর্ত্তি নাকি অতি সুন্দর ও জীবন্ত হইয়াছে। বানাইয়াছেন কলিকাতার নিতাই পাল। বৃন্দাবনের শ্রীশ্রীগৌরনিতাইর মূর্ত্তিও তিনিই বানাইয়াছিলেন।

রাঁচি আশ্রমে কালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা।

৺কালী পূজার সময়ের একটি অপূর্ব্ব ঘটনার কথাও স্বামীজী বলিলেন। দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইতেছে। মন্দিরের ভিতরে কুসুম ব্রহ্মচারী মন্ত্র পাঠ করিতেছিল। মা একমাত্র ভিতরে আছেন। কুসুম দেবীর চিবুক স্পর্শ করিয়া পরে হৃদয় স্পর্শ করিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পূর্ণ করিতেছে—মাও কুসুমকে স্পর্শ করিয়া আছেন। মা কুসুমকে বলিলেন—"চোখ বুজে ভাবনা কর দেবী প্রাণবন্ত সাক্ষাৎ সম্মুখে দাঁড়িয়ে।" একটু পরেই আবার বলিলেন—"ঐ দেখ, দেবীর গলার হার কেমন দুলছে।" কুসুমও চোখ খুলিয়া সত্যই দেখিল যে দেবীর বুকের উপর লকেট বেশ দুলিতেছে! পরে বাটুদাও ঘরে আসিয়া তাহা দেখিলেন। এই ব্যাপারে সকলেই বিস্ময়ে অভিভূত না হইয়া পারিল না। দেবীর কি অপূর্ব্ব লীলা!

আগামী ২২শে হইতে এখানে কালী বাড়ীতে সংযম সপ্তাহ মহাব্রত আরম্ভ হইবার কথা। দিল্লীর ভক্তদের আগ্রহে এবার দিল্লীতেই সপ্তাহের ব্যবস্থা হইয়াছে। মা খুব সম্ভবতঃ ২০শে সকালে এখানে আসিয়া পৌছিবেন। যোগীভাই সংযম সপ্তাহ উপলক্ষে আজ বিকালে সোলন হইতে আসিয়া পৌছিলেন। আমার নিকটে

জলখাবার ইত্যাদি খাইয়া বিড়লা মন্দির ধর্ম্মশালায় চলিয়া গেলেন। অধিকাংশ ভক্তদের থাকার ব্যবস্থা সেখানেই করা হইয়াছে শুনিলাম। সংযম সপ্তাহের সমস্ত ভার প্রায় নারায়ণ দাসজীর* উপর। কিন্তু তিনি নাকি হরিবাবার নির্দ্দেশে হোসিয়ারপুর রওনা হইয়া গিয়াছেন। তাই এখানে কাজের খুবই অসুবিধা হইতেছে। স্বামীজী এখানে পৌছিয়াই তাঁহার নিকট টেলিগ্রাম করিয়া দিলেন সত্বর চলিয়া আসার জন্য।

২০শে নভেম্বর, ১৯৫৫

কাশী ও বিন্ধ্যাচল হইয়া মার দিল্লী আগমন।

আজ খুব ভোরে মা বিন্ধ্যাচল হইয়া এখানে আসিয়া পৌছিলেন। ষ্টেশনে বহু লোক মার অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। মা ষ্টেশন হইতে আমার কাছে আসিয়া একটু বসিয়া কালীবাড়ীতে চলিয়া গেলেন।

বিকাল বেলা মা আমার নিকট আসিয়া অনেকক্ষণ বসিলেন। সন্ধ্যার পর বম্বে হইতে ভাইয়ার স্ত্রী লীলাবেন ও মেয়ে সুনয়না আসিয়া পৌছিল।

---

* রায়বাহাদুর নারায়ণ দাস—ইনি একজন Retired Executive Engineer—অতি ধর্ম্মপ্রাণ ও সৎস্বভাব বিশিষ্ট। উপস্থিত আমাদের দিল্লী আশ্রমের প্রেসিডেণ্ট।

২১শে নভেম্বর, ১৯৫৫

মার নির্দ্দেশে আজ সকালেই আমাকে কালীবাড়ীতে অ্যাম্বুলেন্সে করিয়া লইয়া আসা হইল। অবধূতজী গতকাল রাত্রেই দিল্লীতে আসিয়াছেন। আমি রওনা হইয়া আসার পর তিনি ডাক্তার সেনের বাসায় চলিয়া গেলেন।

শ্রীহরিবাবাজীও আজ দুপুরে হোসিয়ারপুর হইতে আসিয়া পৌছিলেন। বর্ম্মা সাহেব তাঁহাকে নিজে মোটরে লইয়া আসিয়াছেন। শুনিলাম হরিবাবার গুরুস্থানে আশ্রম বানান হইতেছে। সেইজন্য তাঁহাকে আগামী কালই চলিয়া যাইতে হইবে। আমার ঘরে বসিয়া এই সম্পর্কে মার সম্মুখে অনেক কথাবার্তা হইল। সকলেই বিশেষ ভাবে আশা করিয়া আছে যে হরিবাবা সপ্তাহে অবশ্যই উপস্থিত থাকিবেন। অবধূতজী বারবার অনুরোধ করিতেছিলেন মা যাহাতে কিছু বলেন। কিন্তু মা বলেন—"মহাত্মারা স্বতন্ত্র।" সুতরাং মা শুধু বলিলেন—"পিতাজীর যাহাতে আনন্দ।"

উপস্থিত কিছুই স্থির হইল না। হরিবাবাজী আদিত্য নারায়ণজীর বাসায় চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যাবেলা বিড়লা মন্দিরের গীতাভবনে হরিবাবাজীর কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হইয়াছে। মা প্রায় দশটা নাগাদ সৎসঙ্গ হইতে ফিরিলেন।

২২শে নভেম্বর, ১৯৫৫

আজ ভোরেই হরিবাবাজী চলিয়া যাইতেছেন। মাও ভোর

চারটার সময় উঠিয়া আদিত্য নারায়ণজীর বাসায় গিয়া হরিবাবাজীকে রওনা করাইয়া দিয়া আসিলেন। মার শরীর ভাল না—অল্প অল্প জ্বরও আছে। তবু মার দিক দিয়া কোনও ভাবেই ত্রুটী হওয়ার উপায় নাই। বর্ম্মা সাহেবই হরিবাবাজীকে লইয়া হোসিয়ারপুর রওনা হইয়া গেলেন।

দিল্লী কালীবাড়ীতে সংযম সপ্তাহ।

আজ সকাল হইতে সংযম সপ্তাহের প্রারম্ভ। প্রোগ্রাম মোটামুটি গত বৎসরের ন্যায়ই রাখা হইয়াছে। কিন্তু ব্রতীদের সংখ্যা বম্বে হইতে অনেক কম মনে হইতেছে। অবশ্য রাজা-মহারাজারা প্রায় সকলেই এবার অসিয়া যোগ দিয়াছেন। বিশেষ ভোগ বিলাসের মধ্যেও মানুষ হইয়া সংযম সপ্তাহের সমস্ত বিধিনিষেধ তাঁহারা যে ভাবে নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া যান তাহা দেখিলে সত্যই অবাক হইতে হয়। সাধারণ গৃহস্থাশ্রমীদের মধ্যে তাঁহারা সত্যই আদর্শ স্থাপন করিতেছেন। সংযম সপ্তাহের প্রভাবে অনেকের জীবনেই আমূল পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। যাঁহারা পূর্ব্বে এক ঘণ্টাও চা-সিগারেট না খাইয়া থাকিতে পারিতেন না তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাহা চিরতরে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। সংযমের উপযোগিতা বহু লোকেই মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছেন। যোগীভাইর মনে প্রথম হইতেই এইরূপ সদিচ্ছা ছিল যে সংযম সপ্তাহে যোগদান করিয়া যদি কয়েকজন ভক্তের জীবনও পরিবর্ত্তিত হয় তবেই ইহার উদ্দেশ্য সার্থক হইবে। যাঁহাদের পক্ষে বাড়ীতে বসিয়া আধ ঘণ্টাও ধ্যানজপে নিয়োগ করা দুঃসাধ্য তাঁহারা কাজকর্ম্ম হইতে ছুটি লইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাতৃ সমক্ষে ধ্যান-জপে মন দিবার চেষ্টা করিতেছেন। মায়ের উপস্থিতিতে সকলের

মনে এক অপূর্ব্ব আনন্দের স্রোত বহিয়া যায়। সংযম সপ্তাহের আনন্দ তাই যাঁহারা আস্বাদন না করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে অনুভব করা কঠিন।

নিউদিল্লী কালীবাড়ীর বাগানের মধ্যে বিশাল প্যাণ্ডাল বানাইয়া সংযম সপ্তাহের আয়োজন করা হইয়াছে। মা এবং মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা কালীবাড়ীর ধর্ম্মশালায় হইয়াছে। সাধুরা আছেন অধিকাংশই বিড়লা ধর্ম্মশালায়।

২৯শে নভেম্বর, ১৯৫৫

গতকাল সংযম সপ্তাহ বেশ ভালমত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীহরিবাবা হঠাৎ চলিয়া যাওয়াতে সপ্তাহের প্রোগ্রামে কিছু অদল-বদল অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। অবধূতজীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থানীয় কয়েকজন বড় বড় মহাত্মাদের আহ্বান করিয়া নিয়া আসা হইয়াছিল। তাহা ছাড়া বম্বে হইতে স্বামী কৃষ্ণানন্দজী, বিজ্ঞানানন্দজী, গঙ্গোত্রীর স্বামী স্বানন্দজী, বৃন্দাবন হইতে স্বামী চক্রপাণীজী, স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী, কলিকাতা হইতে শ্রীযোগেশ ব্রহ্মচারীজী প্রভৃতি অনেকেই আসিয়া একে একে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। স্থানীয় মহাত্মাদের মধ্যে শ্রীশ্রী১০৮ গঙ্গেশ্বরানন্দজী, স্বামী সর্ব্বানন্দজী, স্বামী অসঙ্গানন্দজী, স্বামী প্রকাশানন্দজী, গোস্বামী গনেশ দত্তজী প্রভৃতি অন্যতম ছিলেন। তাঁহারা সকলেই সপ্তাহের প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আজ এখানে অখণ্ড কীর্ত্তন চলিতেছে। নারায়ণ দাসজীর

আগ্রহে বিড়লা মন্দিরের গীতা ভবনেই কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হইয়াছে। গতকাল রাত্রে অধিবাস হইয়া গিয়াছে। কালীবাড়ীর হলঘরে মেয়েরা সকলে মিলিয়া সারা রাত্রি মহানন্দে কীর্ত্তন চালাইয়াছে। খুব ভোরে মা গিয়া ঊষা কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছিলেন। মেয়েদের কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে ছেলেরা আরম্ভ করিয়া গীতা ভবনে গিয়া কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। মা বেলা দশটা নাগাদ কিছুক্ষণের জন্য গীতা-ভবনে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে মা কৃপালদের* বাড়ী হইয়া কালীবাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন।

বিকালে মা কীর্ত্তনে গিয়া আবার সকলের মধ্যে বসিলেন। আজ চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষেও বিশেষ কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। মা নিজেও অনেকক্ষণ গান করিলেন।

৩০শে নভেম্বর, ১৯৫৫

আজ সকালে মা কালীবাড়ীর পাট উঠাইয়া দিয়া আশ্রমে চলিয়া গেলেন। আমিও ঐ সময়েই পুনরায় ডাঃ সেনের বাড়ীতে চলিয়া আসিলাম। অতিথি অভ্যাগতেরাও একে একে সব রওনা হইয়া যাইতেছে। দিল্লীতে মার কতদিন থাকা হইবে তাহা এখনও ঠিক নাই। তবু আশ্রমে মার কিছুটা বিশ্রাম হইবে।

---

* স্যার দাতার সিংএর কন্যা শ্রীমতী কৃপাল কৌর। মেয়েটি খুবই সম্ভ্রান্ত বংশের। মাকে দর্শন করিবার পর চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া একটি মাত্র মেয়েকে লইয়া আশ্রমবাস করিতেছে।

৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৫৫

মা এই কয় দিন আশ্রমেই ছিলেন। দিনে একবার করিয়া আমার নিকট কিছু সময় বসিয়া আবার চলিয়া যাইতেন। আজ ভোরে টিহরীর রাজমাতার মোটরে মা বৃন্দাবন রওনা হইয়া গেলেন। আমি দিল্লীতেই রহিলাম।

রাত্রেই বৃন্দাবন হইতে বুনি, উদাস ও বিল্লো ফিরিয়া আসিল। শুনিলাম মা আগামী কালই সন্ধ্যার পূর্ব্বে দিল্লী ফিরিয়া আসিবেন।

৬ই ডিসেম্বর, ১৯৫৫

আজ দুপুরে বেলা তিনটা নাগাদ মা হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত। শুনিলাম টিহরীর মহারাণী মার দর্শনের জন্য গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিবার সময় মা তাঁহার সঙ্গেই চলিয়া আসেন।

বিকালে গোয়ালিওরের মহারাণী ও টিহরীর রাজমাতা প্রভৃতি অনেকেই মার দর্শনের জন্য আসিলেন। বম্বে হইতে ডাঃ শেঠ এবং তাঁহার স্ত্রী ও ভগ্নী আসিয়াছেন। তাঁহারাও মার দর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন। মা সন্ধ্যার পর কালকাজী আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন।

৭ই ডিসেম্বর, ১৯৫৫

আগামী কাল মার কাশী রওনা হইবার কথা। তাই আজই একদল সোজা বিন্ধ্যাচল চলিয়া যাইতেছে।

বিকাল পাঁচটার সময় ভারত সরকারের মন্ত্রী কেশব দত্ত মালব্য ও তাঁহার স্ত্রী মাকে তাঁহাদের বাসায় কিছু সময়ের জন্য লইয়া যান। তাঁহার স্ত্রী এবারই মার দর্শন পাওয়ার পর হইতে মার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের বাড়ীতে মার দর্শনের জন্য শ্রীযুক্ত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ এবং ডাঃ কৈলাশনাথ কাটজুরও আসিবার কথা ছিল। কিন্তু শুনিলাম শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারা আসিয়া পৌছিতে পারেন নাই। অবশ্য অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মালব্যজীর বাসায় মার বিশেষভাবে অভ্যর্থনার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

সেখান হইতে মাকে ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের বাসায় লইয়া যাওয়া হয়। ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ মাকে ইতিপূর্ব্বে অনেকবার দর্শন করিয়াছেন। মার প্রতি তাঁহার যথেষ্ঠ ভক্তি ও শ্রদ্ধার প্রকাশ দেখা যায়। দীর্ঘদিন পরে তিনি মাকে নিকটে পাইয়া আর যেন ছাড়িতেই চান না। পাশে একটি চেয়ারে মাকে বসাইয়া তিনি মার সম্বন্ধে অনেক কিছু বলিতেছিলেন। মার সঙ্গে টিহরীর রাজমাতা এবং সোলনের রাজা সাহেবও (যোগীভাই) ছিলেন।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের বাসায় মা।

মা সন্ধ্যার পর আমার এখানে আসিয়া পৌছিলেন। গোয়ালিওরের মহারাণী সাহেবা মা আসিবার পূর্ব্ব হইতেই বসিয়াছিলেন। তিনি মার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। নিত্য মার কাছে তাঁহার আসা চাই-ই। আজ ত দুইবার আসিয়াছেন। ডাক্তার শেঠ এবং বলরামজীও আসিয়াছিলেন।

রাত্রি আটটার পর মা কালকাজী আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন। আর

সকলে চলিয়া গিয়াছে তাই আজ রাত্রিতে মার নিকটে শুধু উদাস, পরমানন্দ স্বামী ও পানু রহিল।

৮ই ডিসেম্বর, ১৯৫৫

সকালে প্রায় দশটা নাগাদ মা আমার নিকট আসিলেন। শুনিলাম গত রাত্রে শ্রীযুক্ত কেশবদত্ত মালব্যজীর স্ত্রী মার কাছে আশ্রমে গিয়া কথা বলিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে একদিন পাকিস্তানের High Commissioner রাজা গজনফর আলি খাঁনও মার দর্শনের জন্য আশ্রমে গিয়াছিলেন। তিনি মার নিকট ইতিপূর্ব্বেও বহুবার আসিয়াছেন। রাজাসাহেব বিশেষ অমায়িক প্রকৃতির এবং মার প্রতিও যথেষ্ঠ ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। তিনি মুসলমান এবং বিশেষতঃ পাকিস্তানের রাজদূত হইয়াও যে মার নিকট প্রায়ই আসেন তাহাতে অনেকেই অবাক হইয়া যান।

মা বিকাল ঠিক পাঁচটায় ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হইয়া গেলেন।

কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন। মার সঙ্গে পরমানন্দ স্বামীজী, বুনি, উদাস, হীরু ব্রহ্মচারী প্রভৃতি কয়েকজন যাইতেছে। মার কাশীতে ২।১ দিন মাত্র থাকিয়াই বিন্ধ্যাচল যাওয়ার কথা।

১২ই ডিসেম্বর, ১৯৫৫

আজ কাশী হইতে পরমানন্দজীর দুইখানি পত্র একত্রে পাইলাম।

মা কাশীতে বেশ ভালমত পৌছিয়াছিলেন তবে গাড়ী প্রায় দুই ঘণ্টার উপর লেট ছিল। গতকাল বিকালে মা বোধ হয় বিন্ধ্যাচল গিয়াছেন। কাশীতে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া মার শরীরটা একটু খারাপ হইয়াছে। জ্বর জ্বর ভাবও আছে।

১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৫৫

কাশী হইতে কমল ব্রহ্মচারী আজ আশ্রমের কাজে এখানে আসিয়াছে। আশ্রমের ঘাট মেরামত সম্বন্ধে সরকারের সহিত ৩।৪ বৎসর যাবৎই কথাবার্ত্তা চলিতেছে। ঘাট বানাইবার জন্য আমি অতি কষ্টে ১৩০,০০০৲ সংগ্রহ করিয়া সরকারকে দিয়াছিলাম। সরকারের পক্ষ হইতেও অনুরূপ টাকা খরচ হইবার কথা ছিল। কিন্তু কিছুই লাভ হয় নাই। যাহা কিছু কাজ হইয়াছিল তাহা প্রায় সবই বন্যায় ধুইয়া গিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের বাড়ীরও সবিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। ডাঃ পান্নালালজী ও তাঁহার জামাতা গোবিন্দ-নারায়ণজীর বিশেষ সহায়তায় সরকারের নিকট হইতে আমার দেওয়া টাকা ফেরৎ পাওয়া সম্ভব হইয়াছে। ভবিষ্যতে আশ্রমের কাজে উহা বিশেষভাবে সাহায্যে আসিবে।

১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫৫

কাশী হইতে বুনির পত্রে জানিলাম যে মা সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে গত ১৪ই বিকালে আবার কাশী ফিরিয়া আসিয়াছেন।

মার শরীরটা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল। পরমানন্দ স্বামীজী ইতিমধ্যে একদিনের জন্য কলিকাতা গিয়াছিলেন। কলিকাতা আশ্রমের জন্য একটি নূতন জমি ও বাড়ী লওয়ার কথা চলিতেছে। স্বামীজী তাহাই দেখিতে গিয়াছিলেন।

সন্ধ্যাবেলা গোয়ালিওরের মহারাণী সাহেবা আরও কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। মহারাণীর স্বভাবটি খুবই মধুর—বেশ হাসিখুসী। আধ্যাত্মিক দিকেও বেশ রুচি দেখা যায়।

সূর্য্য গ্রহণ উৎসব এবার মার উপস্থিতিতে নাকি বেশ বিরাটভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। চার ঘণ্টা অখণ্ড জপ, হবন ও কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। মাও খুব কীর্ত্তন করিয়াছেন। রূপালের ভাই মহেন্দ্রপাল মার সঙ্গেই আছে। সে নাকি মার অনেক গান রেকর্ড করিয়াছে। গ্রহণের পর মা নিজে গিয়া সকলের সঙ্গে গঙ্গায় স্নান করিয়াছেন। তাহার পরে গঙ্গার উপরের ছাদে সকলকে নিয়া মা খাইতে বসেন। সকলেই মহানন্দে মার প্রসাদ পাইয়াছে।

কাশীতে সূর্য্যগ্রহণ উৎসব।

শুনিলাম গ্রহণ সম্বন্ধে কাশীর পণ্ডিতেরা নাকি বিধান দিয়াছেন যে ভোগের জিনিষপত্র মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিলে আর গ্রহণের সময়ে তাহা নষ্ট হয় না। নিত্য ভোগ গ্রহণ নাকি কোনও ভাবেই বন্ধ করা হয় না এবং দূষিতও হয় না। এবার আশ্রমেও অন্নপূর্ণা মন্দিরে তাই এই ভাবেই ভোগ ও প্রসাদ গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে।

একটি দুঃসংবাদে মনটি বড়ই খারাপ হইয়া গেল। শুনিলাম গত ১১ই রাত্রে কলিকাতায়—নলিনী দাদার ১৮ বৎসরের একটি ছেলে বাসের নীচে চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে। মা বৃদ্ধ ও শোকার্ত্ত পিতা-মাতাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়া দীর্ঘ এক চিঠি লেখাইয়াছেন।

ডাঃ নলিনী ব্রহ্মের* পুত্রের মৃত্যু।

১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৫৫

আজ বেলা প্রায় ১২টা নাগাদ মা হঠাৎ কাশী হইতে আসিয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে স্বামী পরমানন্দজী ও গোপালের মা। শুনিলাম হরিবাবাজী হোসিয়ারপুরে খুবই অসুস্থ। মধ্যে অবস্থা একটু খারাপই হইয়াছিল। মার দুপুরেই হোসিয়ারপুর রওনা হওয়ার কথা হইয়াছিল। পরে স্থির হইল যে রাত্রির গাড়ীতে যাইবেন। এক হিসাবে ভালই হইল। সন্ধ্যাবেলা চণ্ডীগড় হইতে বর্ম্মা সাহেবের ফোন আসিল যে আজ বিকালে হরিবাবাকে অমৃতসর হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। অমৃতসরে মার থাকিবার কোনও উপযুক্ত স্থান আমাদের জানা নাই। তাই কথা হইল যে মা জলন্ধরে নামিয়া সেখান হইতে মোটরে অমৃতসর যাইবেন।

হরিবাবাজীর অসুস্থতা ও মায়ের দিল্লী আগমন।

---

*শ্রীশ্রীমায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত ৺ডাঃ নলিনী কুমার ব্রহ্ম, এম, এ, পি, এইচ, ডি। ইনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের দর্শন শাস্ত্রের একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন।

রাত্রি সাড়ে নয়টায় ফ্রন্টিয়ার মেলে মা রওনা হইয়া গেলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে রিজার্ভেশন পাওয়া Northern Railwayর General Manager শ্রীযুক্ত কৌল সাহেবের চেষ্টাতেই সম্ভব হইয়াছে। স্টেশনেও তাঁহার সেক্রেটারী এবং আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। টিহরীর মহারাজা-মহারাণী ও যোগীভাইও মাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিবার জন্য গিয়াছিলেন।

১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৫৫

মা অমৃতসরে কখন পৌঁছিলেন, কোথায় গেলেন, হরিবাবা কেমন আছেন এইসব কথাই আমরা বসিয়া ভাবিতেছি এমন সময় দুপুরে অমৃতসর হইতে স্বামীজী ফোনে বলিলেন যে আজই বিকালে হরিবাবাকে সঙ্গে লইয়া মা প্লেনে আসিতেছেন। হরিবাবার জন্য যেন সব ব্যবস্থা ঠিক থাকে। ফোনে সংবাদ পাওয়া মাত্র বিশেষভাবে তাড়াহুড়া করিয়া মার ঘর ও আমার ঘরটি খালি করিয়া দেওয়া হইল। আমি ডাক্তার বাবুর মূল বাড়ীতে চলিয়া গেলাম। পানু কোনও ভাবে এইসব ব্যবস্থা করিয়া Airportএ চলিয়া গেল।

অমৃতসর গিয়া হরিবাবাকে প্লেনে আনা।

প্রায় সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ হরিবাবাকে লইয়া মা ও পরমানন্দ স্বামীজী আসিয়া পৌঁছিলেন। শুনিলাম আজ ভোরে জলন্ধর পৌঁছিয়া মা সোজা সাবিত্রী দেবী আশ্রমে চলিয়া যান। সেখানে মার জন্য পৃথক ব্যবস্থা করাই আছে। হঠাৎ মাকে পাইয়া সকলেই বিশেষ

আনন্দিত হইল। সেখানে সামান্য একটু হাত-মুখ ধুইয়াই মা মোটরে অমৃতসর রওনা হইলেন। গোপালের মাকে জলন্ধরেই রাখিয়া যাওয়া হয় মার জন্য রান্না করিয়া রাখিবে বলিয়া। অমৃতসর হাস-পাতালে পৌছিয়া মা দেখেন হরিবাবা সেখানে খুবই কষ্ট পাইতেছেন —চিকিৎসারও কোনও ভাল ব্যবস্থা নাই। তখনই হরিবাবার সঙ্গে কথা বলিয়া দিল্লী আসা ঠিক হয়। ঘটনাচক্রে প্লেনেও তিনটি সিট পাওয়া গেল। মা আর জলন্ধরে ফিরিলেন না; জিনিষ-পত্র এবং খাওয়ার জিনিষ সবই সেখানে পড়িয়া রহিল। কৃপালকে তাই মা বলিয়া আসিয়াছেন যে সে যেন গোপালের মা এবং জিনিষ-পত্র সব লইয়া ট্রেণে আসে।

মা আমাকে আসিয়াই বলিলেন—"দিদি, এবার উড়তে শেখা গেল। পাখি কখন কোন দিকে উড়ে যাবে।" মা-ত খুব হাসিতে-ছেন। কিন্তু মার এই জাতীয় কথা শুনিলেই আমার ভয়ে বুক শুকাইয়া যায়।

যাক, হরিবাবাকে আনিয়া মার ঘরে মারই খাটের উপর শোয়াইয়া দেওয়া হইল। মারত আর থাকার জায়গা নাই। মা বাহিরে ঠাণ্ডার মধ্যে একটা চেয়ারে বসিয়া রহিলেন। হরিবাবার চিকিৎসার জন্য ডাঃ বলরামজী এবং একজন বড় হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারকে ডাকা হইল। তিনি ঔষধ দিয়া গেলেন। ডাঃ বলরাম এদিকে ক্যাথিটার দিয়া প্রস্রাব করাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

রাত্রে কোথায় মা থাকিবেন তাহা লইয়া বিশেষ চিন্তিত হইলাম। একবার কথা হইল মা আশ্রমে চলিয়া যাইবেন। আবার কথা হইল পঙ্কজবাবুর বাসায় যে ঘর আছে সেখানেই গিয়া রাত্রিটা থাকা।

কিন্তু দুইটিই অনেক দূর। তাই শেষ পর্য্যন্ত বিড়লা মন্দিরেই থাকা ঠিক হইল। যোগীভাই আজকাল ওখানেই আছেন। তিনি তাঁহার ঘরটি খালি করিয়া অপর একটি ঘরে চলিয়া গেলেন, মা স্বামীজীকে লইয়া রাত্রিটা সেখানেই কোনও ভাবে কাটাইলেন। প্লেনেতে জিনিষপত্র কিছুই আসে নাই। তাই অনেক কষ্ট করিয়া মার জন্য কম্বল, চাদর ও বালিশ সংগ্রহ করা হইল। মা রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটায় বিড়লা মন্দিরে শুইতে চলিয়া গেলেন।

১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৫৫

সকাল প্রায় দশটা নাগাদ মা বিড়লা ধর্ম্মশালা হইতে আসিলেন। মার খেয়াল আজ কোনও ভাবে ডাঃ সন্তোষ সেনকে দিয়া হরিবাবাকে একবার দেখান হয়। ডাঃ সন্তোষ সেনকে সংবাদ দেওয়া হইল তিনি যেন অবশ্য বিকাল বেলা মার সঙ্গে একবার আসিয়া দেখা করেন। সন্তোষবাবু সর্ব্বদা এত ব্যস্ত থাকেন যে তাঁহার সহিত দুই মিনিটের জন্য সাক্ষাৎ করাও দুঃসাধ্য ব্যাপার। মার নাম ছাড়া তাঁহাকে এইভাবে ডাকিয়া আনা প্রায় অসম্ভব।

বিকালে ডাঃ সেন আসিয়া পৌছিবামাত্র মা তাঁহাকে লইয়া হরিবাবার ঘরে গেলেন। তিনি হরিবাবার সহিত ২।৪ মিনিট কথা বলিয়াই তাঁহাকে Nursing Home-এ যাইতে রাজী করাইয়া ফেলিলেন। হরিবাবা যে কিরূপে এত সহজে সম্মত হইলেন তাহা সত্যই অদ্ভূত ব্যাপার। হাস-পাতালে যাওয়া, এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করা বা অস্ত্রোপচার করার তিনি আদৌ পক্ষে না। মাও তাই জোর করিয়া কিছু বলেন নাই। অবশ্য. ডাঃ সেনের কথা খেয়ালে রাখিয়াই মা হরিবাবাকে কোনও ভাবে রাজী করাইয়া

দিল্লী সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। ডাঃ সন্তোষ সেনের ন্যায় অভিজ্ঞ সার্জ্জন খুবই কম আছে—বিশেষতঃ Prostrate gland operationএ তাঁহাকে অদ্বিতীয় বলা হয়। সুতরাং মার ইচ্ছায় এইবার হরিবাবার একটা উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল।

ডাঃ সেন তাঁহার নার্সিং হোমে গিয়াই ফোন করিয়া জানাইলেন যে হরিবাবাকে যেন আটটার পরে লইয়া যাওয়া হয়। ইতিমধ্যে তিনি সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিবেন। রাত্রি আটটা নাগাদ মা নিজে হরিবাবাকে সঙ্গে লইয়া নার্সিং হোমে চলিলেন।

ডাঃ সেনের নার্সিং হোমে মায়ের পদার্পণ।

হার্ডিঞ্জ ব্রিজের সম্মুখে ডাঃ সেন যে নূতন নার্সিং হোমটি করিয়াছেন তাহা নাকি এশিয়ার মধ্যে অন্যতম। মাকে সেখানে একবার যাইবার জন্য তিনি পূর্ব্বেও বিশেষ অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আর যোগাযোগ হইয়া উঠে নাই। আজ হরিবাবাকে উপলক্ষ্য করিয়া ডাঃ সেনের ইচ্ছা পূর্ণ হইল।

মা নার্সিং হোম হইতে ফিরিয়া আসিলে শুনিলাম সেখানকার ব্যবস্থা অতি উত্তম—এইরূপটা আর দেখা যায় না। ডাঃ সেন নিজে মাকে সমস্ত নার্সিং হোমটি ঘুরিয়া দেখাইয়াছেন। সমস্ত ব্যবস্থাই নাকি নিখুঁত। মাও দেখিয়া খুবই খুসী হইয়াছেন। হরিবাবাকে কেবিনে রাখা হইয়াছে। প্রতি দিনের ব্যয় ৪০৲ টাকার উপর।

আজ রাত্রিটা মা এখানেই রহিলেন।

২০শে ডিসেম্বর, ১৯৫৫

সকাল পৌনে এগারটায় মা নার্সিং হোমে গেলেন। সাধারণ

visitorsদের যাইবার সময় সকাল এগারটা হইতে একটা এবং বিকালে সাড়ে চারটা হইতে সাড়ে সাতটা। ডাঃ সেন অবশ্য বলিয়া দিয়াছেন যে মার জন্য কোনও সময়ের বন্ধন নাই। মা যখন ইচ্ছা যাইতে পারেন।

বিকালে মা আবার নার্সিং হোমে গেলেন। সেখানে হরিবাবার ঘরেই বেশ সৎসঙ্গ চলিতেছে। শুনিলাম হরিবাবাকে নার্সিং হোমে তিন দিন observationএ রাখা হইবে। তাহার পরে প্রয়োজন মত অস্ত্রোপচার করা হইবে।

২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৫৫

হরিবাবার জন্য সকলেই খুব চিন্তিত। মা দুই বেলা নিয়মিত ভাবে নার্সিং হোমে যাইতেছেন। Observation সম্পূর্ণ হইয়াছে। ডাঃ সেন হরিবাবাকে অস্ত্রোপচারে রাজী করাইয়াছেন। আগামী কাল সকালে ডাঃ সেন নিজে অস্ত্রোপচার করিবেন। মা যে কি ভাবে সব দিক সামলাইয়া নিতেছেন তাহা সত্যই আশ্চর্য্য। কাহারো যাহাতে কোনও দিক দিয়া অসন্তুষ্টির কারণ না থাকে মার লক্ষ্য সেদিকেই। মা একবার হরিবাবার সঙ্গে কথা বলিতেছেন—একবার ডাক্তার সেনের সঙ্গে কথা বলিতেছেন—আবার হরিবাবার ভক্তদের সঙ্গে কথা বলিতেছেন। হরিবাবার জন্য মার যেরূপ খেয়াল তাহা সত্যই অপূর্ব্ব।

২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৫৫

আজ সকাল সাড়ে দশটায় হরিবাবার অপারেশন হওয়ার কথা।

মা তাই নয়টা নাগাদ একবার গিয়া হরিবাবাকে দেখিয়া আসিলেন।

হরিবাবাজীর অপারেশন।

মা হনুমান রোডে ফিরিয়া আসিয়া কীর্ত্তন সুরু করাইলেন। অপারেশন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কীর্ত্তন অখণ্ড ভাবে চলিবে। পানু ও কান্তিভাইকে মা নার্সিং হোমে পাঠাইয়া দিলেন সেখানে গিয়া অপেক্ষা করার জন্য। অপারেশন সম্পূর্ণ হইয়া গেলেই তাহারা ফোনে সংবাদ দিবে। এখানেও ফোনের নিকট রেণুকে বসাইয়া রাখা হইল যে সংবাদ আসিবামাত্র মাকে জানাইবার জন্য। ঠিক ১১-৩৫ মিনিটে ফোন আসিল যে হরিবাবাকে অপারেশন ঘর হইতে লইয়া আসা হইয়াছে। ডাক্তার বলিয়াছেন যে অপারেশন বেশ ভালই হইয়াছে। তবে এখন রক্ত দেওয়া হইতেছে।

বিকালে আর মা গেলেন না। পানু গিয়া সংবাদ লইয়া আসিল বেলা আড়াইটার সময় হরিবাবার জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছিল তবে আবার তাঁহাকে অজ্ঞান করা হইয়াছে। এমনি তিনি ভালই আছেন।

আজ সন্ধ্যার গাড়ীতে আমাদের কাশী যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সংবাদ আসিল যে ভাইয়া আজ সন্ধ্যাবেলা কলিকাতা হইতে আসিতেছেন। তাই উপস্থিত আমার যাওয়া বন্ধ হইল।

২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৫৫

আজ দুপুরে মা গিয়া হরিবাবাকে দেখিয়া আসিলেন। বেশ ভালই আছেন—বিশেষ কোনও কষ্ট নাই। অপারেশনের সময় তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। অপারেশন করিয়া যে **Prostrate gland**টি ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা লইয়া যাওয়ার জন্য হরিবাবার ভক্ত-

বৃন্দ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে শুনিয়া মা বলিয়া পাঠাইলেন যে সেইটি যেন একজন ব্রহ্মচারীর হাত দিয়া যমুনাতে ফেলিয়া দেওয়া হয়।

এখানে আজ উদয়াস্ত নাম কীর্ত্তন চলিতেছে—হরিবাবার উদ্দেশ্যে।

২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৫৫

দিল্লীর আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে মা।

এখানে মথুরা রোডের উপর বিশাল International Exhibition হইতেছে। টিহরীর মহারাজা-মহারাণী মাকে বিশেষভাবে প্রার্থনা জানাইয়াছেন একবার ঘুরিয়া আসিবার জন্য। ভদ্রির রাজা সাহেবের* সহিত পরামর্শ করিয়া আজ সকাল সাড়ে দশটায় মহারাজা মাকে লইয়া গেলেন। প্রদর্শনীর ভিতরে মোটর যাওয়ার নিয়ম নাই। তবে মার জন্য দুইখানি গাড়ীর Special pass নেওয়া হইয়াছে। টিহরীর মহারাজা নিজে গাড়ী চালাইয়া মাকে প্রদর্শনীর ভিতর সব ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখাইলেন। মার কোথাও নামিবার খেয়াল ছিল না। তবে মহারাজা বারবার অনুরোধ করিয়া মাকে Chinese Pavilion এর ভিতরে লইয়া গেলেন। সব দিক দিয়া এইটিই নাকি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। শুনিলাম ভিতরের কয়েকটি জিনিষ সত্যই অতুলনীয়। প্রায় দুইমাস ধরিয়া এই প্রদর্শনী চলিতেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিল্প কলা ব্যবসা-বাণিজ্যের যাবতীয় নিদর্শন

---

*ভদ্রির রাজা সাহেব শ্রীবজরঙ্গ বাহাদুর সিং—ইনি দীর্ঘ দিন হিমাচল প্রদেশের গভর্ণর ছিলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই মার বিশেষ ভক্ত।

এখানে ভিন্ন ভিন্ন Pavilionএ দেখান হইয়াছে। ভারতে এত বিশাল ভাবে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী নাকি আর কখনও হয় নাই। মাও দেখিয়া বেশ খুসীই হইলেন।

২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৫৫

হরিবাবা ধীরে ধীরে সুস্থ হইতেছেন। আশঙ্কার কোনও কারণ নাই। নার্সিং হোমে প্রায় ২১ দিন থাকার কথা।

অপারেশনের পূর্ব্বে মা একদিন সূক্ষ্মে দেখিতেছিলেন যে হরিবাবা নার্সিং হোমে শুইয়া আছেন। মাও নিকটেই আছেন। হরিবাবার গুরুদেব স্বামী সচ্চিদানন্দজী হরিবাবার নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন। মা অবশ্য তাঁহাকে পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। তিনি হরিবাবার দিকে তাকাইয়া মাকে বলিতেছেন—"ইহার সংরক্ষণ আগামী কাল দরকার।" আর কি দেখিয়াছেন তাহা মা এখন প্রকাশ করিলেন না। মা হরিবাবার সঙ্গীয় কয়েকজনকে এই কথাটা জানাইয়া পরের দিন ভোর পাঁচটা হইতে একটা অখণ্ড জপের ধারা রাখিতে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন। সেই সঙ্গে একজন ব্রহ্মচারী কাষ্ঠ মৌন থাকিয়া জপ চালাইয়া যাইবে। মা যে কি ভাবে কাহার জন্য কি ব্যবস্থা করেন তাহা সাধারণের পক্ষে বুঝিয়া উঠা মুস্কিল।

হরিবাবার সম্বন্ধে সূক্ষ্ম দর্শন ও মায়ের বিশেষ খেয়াল।

মা গত কাল রাত্রে আশ্রমেই ছিলেন। আজ বেলা ১২টার পর আশ্রম হইতে নার্সিং হোম হইয়া হনুমান রোডে আসিলেন। সন্ধ্যার পর আবার আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন।

———

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

লেখিকা--ব্রহ্মচারিণী গুরুপ্রিয়া দেবী

শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য জীবনের
।। না কা হি নী, আ ধ্যা-
ত্মিক নানা প্রসঙ্গ, অলৌকিক
সূক্ষ্ম দর্শনাদির বহু বিবরণ,
ভারতের এক প্রান্ত হইতে
অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অনবদ্য
ভ্রমণ লীলার কাহিনী এবং
শ্রীমুখ নিঃসৃত নানা অমূল্য
উপদেশাবলীর সমষ্টি লইয়া এই
সকল ভাগের রচনা। শ্রীশ্রী-
মায়ের ভক্তবৃন্দের নিকট এই
গ্রন্থসমূহ অমূল্য সম্পদ।

মূল্য : দ্বাদশ ভাগ একত্রে ২৯-